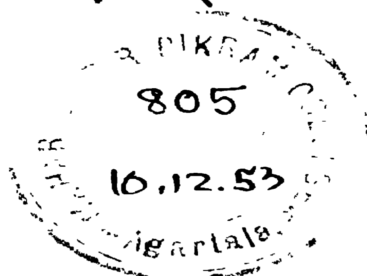
প্রাণের পরশ

অনুরূপা দেবী

প্রাণের পরশ

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী



গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দুই টাকা

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিন্টার শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বঙ্গসাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠা সুলেখিকা

শ্রীমতী নিরুপমা দেবীকে

তার

চিরস্নেহপাশে সম্বদ্ধ বাল্যসখীর

প্রীতি-উপহার

প্রাণের পরশ

১

মোটের উপর বিবাহটা সুখের হয় নাই।

বাঙ্গালীর ঘরে নব-বধূর নব-গুণের মধ্যে এক প্রধান গুণ এই যে, তাহার গালে চড় মারিলেও সে “রা”কাড়ে না! অপর একটি এই, তাহাকে যেখানে বসাইয়া রাখ, সে ঠিক সেইখানটীতেই বসিয়া থাকিবে, যেন “মাটীর ঠাকুরটি!” কিন্তু এই নূতন বধূটির “গালে চড়” না মারা সত্ত্বেও তাঁহার “রা” বাড়ীশুদ্ধ লোকই শুনিতে পায় এবং মলের শব্দে চারিদিক্ মুখরিত করিয়া সে যত্র তত্রই ঘুরিয়া বেড়ায়, এক স্থানে তাহাকে একটি মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির হইয়া বসিতে দেখা যায় না। এতই সে চঞ্চলা।

আবার বৎসরান্তে যখন দ্বিরাগমন হইল, তখনও অবশ্য বউ-মানুষের কোন অবস্থায়ই কাহারও সহিত চোপা করা বিধি নহে, কিন্তু বিবাহকালের ক’নে বউটির মত এখন আর তাহাকে-গড়া মূর্ত্তির মত চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিলে ভাল দেখায় না। মুখটি বুজিয়া এখন তাহার সংসারের “মুড়-কুতে”র ছোটখাট কাযগুলি করিয়া যাওয়া উচিত। বউ অবশ্য এখন হাঁড়ি ধরিবে না, কিন্তু নিশ্চয়ই সে পান সাজিবে, কুটনা কুটিবে, পূজার সাজ সাজাইবে, ঘর-দ্বার ঝাঁট দিবে, বিছানা তুলিবে এবং পাতিবে। বাটনা বাটা এবারটাও তাহার কায নহে; কিন্তু প্রয়োজনমত দু’ গাঁট

হলুদ বাটিতে অথবা দুইটা টাট্‌কা সর্ষে-বাটার আবশ্যক হইলে শাশুড়ীকে “হেঁসেল” হইতে রান্নার হাঁড়ি নামাইয়া আসিতে হয়, বউ বিদ্যমানে সেইটেই কি চোখে ভাল দেখায় ?

কিন্তু এই বড়লোকের ঘরের আদরে পালিতা মেয়েটি নব-বধূজনোচিত এ সকল অবশ্য-শিক্ষণীয় শিক্ষায় সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিতা হইয়া এই গরীব গৃহস্থের ঘরে ঘর করিতে আসিয়াছিল। বউ ‘কুটি’টি ভাঙ্গিয়া দু’খানি করে না, কোন কাযেই তাহার মন নাই, কাযের বিধিও কিছুমাত্র সে জ্ঞাত নহে। এ দিকে কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টাই ঘরের এবং তাহাদের সঙ্গী পাড়ার ছেলে-মেয়ের দলের সঙ্গে বৌমা’র হাসি-গল্প, খেলা এবং হুড়াহুড়ির অত্যাচারের স্রোত অত্যধিক।

বিবাহের যোগ্য মেয়েদের এবং নব-বধূদের পায়ে যে মল পরাইয়া রাখা রীতি, সে-ও ত যেমন ইংরাজ মেয়েদের গাউনের তলায় তারের বেড় ঘেরিয়া তাহাদের চলন ধীর করিবার ব্যবস্থা আছে, সেই রকম একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত! পায়ের মল যেমন চলনের অসৌজন্যকে সর্ব্বগোচরীভূত করিতে সমর্থ, এমন ত আর খালি পায়েব সাধ্য নাই। কিন্তু হইলে কি হয়, এ বউমাটির সে সব লজ্জা-সরমের কোন বালাই-ই যে ছিল না! দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বারই অমন বধূর পায়ের মলের বাজনার ঝমর-ঝমর বাড়ীর লোকের কাণে তালা ধরাইয়া দিয়া চীৎকার-শব্দে পাড়া শুদ্ধ সবাইকেই জানান দিতে থাকে যে, বউ-মা এখন ছুটাছুটি খেলিতেছেন। কখনও কখনও বউ-মা সঙ্গি-দলের সঙ্গে হাসিত, সে হাসির শব্দ পাড়া ছাড়াইয়াও যায়। দেশশুদ্ধ লোকের নববধূর হাসির শব্দ একরকম অ[illegible] হইয়া গিয়াছিল।

বধূর বাপ বড়লোক। মেয়ের সঙ্গে দানা-তসর-পরা, গোলগাল-চেহারা-দর্পিত, হাস্যযুক্তাধরা ঝি আসিয়াছিল। বড়লোকের বাড়ীর ঝি, তাহাকে

দু'টি বেলায় জলখাবারে সন্দেশটি মোণ্ডাটি দিতে হয়, ভাতের পাতে বড় মাছখানা, এমন কি, চারুকে শুদ্ধ বঞ্চিত করিয়াও না দিলে চলে না ; একটু দুধও দেওয়া চাই, একে কুটুম-বাড়ীর ঝি, তাহাতে সে কুটুম আবার বড়মানুষ ! ঝি ফরসা ফরসা ফিতা-পেড়ে মিহি মিহি মেলের কাপড় পরে, ধোপার দুঃখে নিজের কাপড় দুই তিন দিন অন্তর নিজেই সাবান দিয়া কাচে। স্নানের সময় ঠাণ্ডা তেল না মাখিলে ঝিয়ের মাথা ধরে, সে তাহার সঙ্গেই আনিয়াছে।

রোজ এক গ্লাস মিছরির সরবত লেবুর রস দিয়া ভাত খাইবার পর না খাইলে ঝিয়ের শরীর না কি মোটেই ভাল থাকে না। সর্ব্বদাই পান-দোক্তা ঝিয়ের গালের পাশে ভরিয়া রাখা অভ্যাস, নহিলে মুখ যেন কি রকম ফস্-ফস্ করে। মেঝের বিছানায় শুইয়া ঝিয়ের ঘুম হয় না। আবার একা ঘরে এবং অন্ধকার ঘরে শুইতেও তাহার বড় ভয় ভয় করে। কারণ, ঘরের পাশেই বাঁশঝাড়, বাতাসে ভূতের মত শন্-শন্ শব্দ করে। কাযেই সে গৃহিণীর সহিত এক ঘরে স্বতন্ত্র তক্তপোষে শয়ন করে। সারা-রাত্রি প্রদীপে তেল পুড়িতে থাকে। এ দিকে আবার চারুর মা নিজের মশারির উপর একটা কাঁথা আড়াল দিয়া নিজের চোখ হইতে আলো আড়াল করিয়া রাখেন। কারণ, তেল-খরচেরও ভয়ে বটে এবং চিরদিনের অনভ্যাসের জন্যও বটে, তাঁহার আবার ঘরে আলো থাকিলে ঘুম হয় না।

ঝি এ সংসারের কায-কর্ম্ম কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। কেমন করিয়া সে করিবে? কাযের কোনরূপ বালাই ত এ বাড়ীতে নাই! কুটনো তরকারি কোটা, তা' তাহাদের সেখানে কত রকমের তরি-তরকারি ঝুড়ি ভরিয়া ভরিয়া মালী মিন্‌ষেরা বাগান হইতে রোজ দিয়া যায়। সকালের রান্নার কুটনো সেখানে কি "সাজো" কুটিবার যো আছে? দুপুরবেলা ভাত মুখে দিয়া বিন্দির মা আর সুরোর পিসী দুই জনে কাঠের

বারকোস ভরিয়া ভরিয়া কেবল দুই বেলার কুটনাই কুটিতেছে! ও মা, এই রকম কুমড়োর ফালি? এও আবার না কি দুই বেলার তরকারিতে পড়িবে! শুনিলে যে হাসি পায়। এ বাপু কুটিতে গেলে আঙ্গুল কাটিয়া মরিতে হইবে, তার চেয়ে যাদের এ সব অভ্যাস আছে, তাদেরই কোটা ভাল!

গৃহিণী রাঁধিতে বসেন, ধুচুনিভরা চাউল বাহির করা থাকে, ধুইয়া আনিতে পারিলেই হয় ভাল! তা অবশ্য আনা যায়, কিন্তু বাপু, পরিষ্কার না হইলে সে ত সে জন্য দায়ী হইতে পারিবে না! এ রকম চাউল,—তাহাদের সেখানে কেহ, বোধ করি, কখন চক্ষুতেও দেখে নাই। দুই বেলা সেখানে যে দু'শ' মানুষের পাত পড়ে; তা' সেই পাতে কি এই রকম আরসোলার ছানার মত রাঙ্গা রাঙ্গা মোটা মোটা ভাত কখন পড়িয়াছে? উহুঃ, সেখানকার জন-মজুরও এমন চাউলের ভাত খায় না। সেখানকার সে চাউল, সে কেমন! কেমন ভুরভুরে গন্ধ, মল্লিকাফুলের মত শাদা ধব ধবে, আহা! সে কি! এ কি গলা দিয়া নামিতে চাহে? মনে হয়, কে যেন বুকের মধ্যে বাঁশ পূরিতেছে। পোড়া কপাল!

চারুর মা এক দিন জনান্তিকে চারুকে বলিলেন, "দেখ বাবা, ঝি-মাগীকে নিয়ে আমি ত ভাজা ভাজা হয়ে উঠেছি, এমন 'ট্যাকথর' 'গতোরখেকো' মেয়েমানুষ ত বাবার কালে দেখি নি।"

চারু ছেলেটি বড় ভীরু-স্বভাব। আসল কথা ধরিতে গেলে বড়মানুষের বাড়ী বলিয়া শ্বশুরবাড়ীর সম্বন্ধে তাহার মনে সুপ্রচুর লজ্জা ও ভয় ছিল। গরীব বলিয়া তাঁহারা হয় ত মনে মনে কতই অবজ্ঞা করিতেছেন, এই ভাবনায় সে শ্বশুরবাড়ী গিয়া সাহস করিয়া কাহারও নিকট একটু মুখ তুলিয়া কথাই কহিতে পারে না। পেট ভরিয়া সে সেখানে ভাত খায় না, পাছে কেহ মনে করে, কাঙ্গালের মত হাঁস্-হাঁস্ করিয়া খাইতেছে। জামাই

বাড়ী আসিলে শাশুড়ী নানারূপ আহার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন ; ফল, মিষ্ট, ব্যঞ্জন—সে সব গরীব চারু কখন চোখেও দেখে নাই। কিন্তু হইলে কি হয় ? ভরসা করিয়া কোন ভাললাগা জিনিষই সে কখন ভাল করিয়া খায় না, হয় ত ধনি-গৃহের মহিলারা মনে মনে হাসিয়া ভাবিবেন, "এ সব ত কখন চোখে দেখে নাই, তাই অমন করিয়া খাইতেছে। ভাগ্যে আমাদের বাড়ী বিবাহ করিয়াছিল !"

এইরূপে চারু শ্বশুরবাড়ীর সমস্ত জিনিষ এবং সকল মানুষকেই অত্যন্ত ভয় করিয়া চলিত। শ্বশুরের মণিহারী দোকানের মত সাজান ঘরের মধ্যে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলে ত তাহার রীতিমত হৃৎকম্পই উপস্থিত হইত। তাঁহার মুখে চুরুট, গায়ে "সাহেবী" পোষাক, জিভে ইংরাজীর ছাঁচে ঢালা মিশ্র বাঙ্গালা বুলি। তিনি জামাইকে ধুতি পরার জন্য মৃদু ভর্ৎসনা ভিন্ন কখন রূঢ় বাক্য তাহার সম্বন্ধে ব্যবহার করেন নাই, তথাপি কে জানে কেন, তাঁহাকে দেখিলেই চারুর প্রাণ উড়িয়া যায়। শাশুড়ীকে সে ঠিক ভয় করে না বটে, কিন্তু বোধ হয়, অত্যধিক সম্মান করে। তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যার স্বামী একটিমাত্র জামাতাকে যথেষ্টই স্নেহ-যত্ন করিয়া থাকেন ; কিন্তু হইলে কি হয়, গরীব-বড়মানুষে যে একটা "পরমাণু-মেরু"র ভেদ রহিয়াছে ! গরীবের নিকট গরীবের আদর এক জিনিষ, বড়মানুষের আদর আর এক জিনিষ,—একজাতীয় হইলেও দুইটায় রাজা-ভিখারীর প্রভেদ !

কিন্তু এ সব বড় জিনিষ ছাড়িয়া দাও, শ্বশুর-শাশুড়ীকে ভক্তি করিল কি ভয় করিল, সে কথা কিছু খুব সঙ্গীন নহে, সে সে-বাড়ীর দাসী-চাকর-দিগকেও তাঁহাদের অপেক্ষা যে অল্প পরিমাণে ভয়-ভক্তি করিত, তাহা বোধ হয় না। বিশেষতঃ অহঙ্কারে ভরা আদুরে ঝিয়ের দলের নিকট সে বিশেষ একটু আতঙ্কিত হইয়াই থাকিত। ইহারা "তত্ত্বতাবাস" উপলক্ষ

করিয়া চারুর নিজ গৃহের অবস্থার সহিত সবিশেষই পরিচয়-প্রাপ্ত। কত সময় সেই ধনি-গৃহে শাশুড়ী অথবা অপরা কোন শাশুড়ীসম্পর্কীয়া বা শ্যালিকাস্থানীয়াগণের সমক্ষেই তাহারা খপ করিয়া এখানকার কোন একটা কথার উল্লেখ করিয়া তাহাকে যেন লজ্জায় হেঁট-মুখ করিয়া দেয়। সে সেই সময় নতমুখে থাকিয়াও অনুভব করে—চারি দিকে সুবেশধারিণী হীরক-স্বর্ণ-ভূষিতা তাহার শ্বশুর-বাড়ীর আত্মীয়াগণ তাহার দৈন্য-পীড়িতা দুঃখিনী মায়ের দিকে যেন সহাস্য তাচ্ছীল্য-ভঙ্গীতে অপাঙ্গে চাহিয়া উপহাসের লঘু হাসি হাসিতেছে। তাহার যেন তখন ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া লজ্জা ঢাকিতে ইচ্ছা করে।

মা'র কথায় ম্লান হইয়া চারু বলিল, "বেশী দিন ত নয়, মা; কি করবে, স'য়ে যাও, যা করে করুক। পর বৈ ত নয়।"

সে এই কথায় মা'কে জানাইল, "তোমার বউ ত কিছু করে নাই, ঝিয়ের কথা ছাড়িয়া দাও, ও তোমার কে?"

মা, চারুর মা—সংসারে অনেক দুঃখ-ধান্ধা করিয়া কাঁচা বয়সের বৈধব্য হইতে নিজেকে সামলাইয়া কষ্টে-স্বষ্টে ছেলেটিকে কোনমতে মানুষ করিয়া তুলিতেছেন; ছেলে, বউ, কুটুম্ব লইয়া এখন একটুখানি সুখী হইবার সাধ। কোন কোন বিজ্ঞলোকের কথা কাণে না তুলিয়া অনেকগুলি নগদ টাকা এবং ভবিষ্যতের অনেকখানি আশা-ভরসা শুদ্ধ এই ধনি-কন্যাটিকে তাড়াতাড়ি পুত্রবধূ করিয়া ফেলিয়া বারো মাসের তের পার্ব্বণে বড় বড় তত্ত্ব খাওয়ার এবং ছেলের আঙ্গুলে হীরার আংটী, গায়ে কাশ্মীরী শাল, পায়ে রকম-বেরকমের দামী জুতা দেখিয়া চক্ষু সফল করিতেছেন। কিন্তু বক্রী বিষয়গুলিতে বিশেষ বাধা পড়ারই লক্ষণ যেন দেখা যাইতেছিল। ঝিটি যে আসিয়াছেন, যেন মাঠাকুরাণীটি! রান্নাঘরের দালানে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া বসিয়া তিনি "চিপটানের' পর 'চিপটান" কাটিয়াই চলিয়াছেন।

২

চারু কলিকাতার মেসে থাকে, মেডিকেল কলেজে সে পড়ে। মেসের আর কি খাওয়া-দাওয়া! এই গরমের ছুটীতে সে কয়দিন বাড়ীতে আসিয়াছে, মা'র রাঁধা ভাত-ব্যঞ্জন চিরদিনই তাহার খাওয়া অভ্যাস, দু'টি বেশী ভাতই সে যেন খায়। তেমন কিছু দুধ খাওয়া নাই, ঘি খাওয়া নাই, এ ক'টি না খাইয়াই বা খাইবে কি? এই ত খাওয়া-দাওয়ারই জোয়ান বয়স। তাহার উপর এখনও জাতীয়-ধর্ম্মানুসারে অজীর্ণ রোগে তাহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে নাই। তা' পোড়া ঝিয়ের পোড়া চক্ষু কি সে দিকেও আছে!

এক দিন চারু রান্নাঘরের ভিতরে খাইতে বসিয়াছে; ইহারা আসিয়া অবধি সে আর এ ঘরের বাহিরে খায় না, এক রকম লুকাইয়া বসিয়াই সে ভাত খায়। হঠাৎ সেখানেও আজ তাহার শ্বশুরবাড়ীর ঝি বিলাসী আসিয়া রান্নাঘরের দরজা ধরিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া মাতা-পুত্র দুই জনই একটুখানি সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলেন। মা তাড়াতাড়ি উনান হইতে কড়াটা দুম্ করিয়া মাটীতে নামাইয়া দিয়া ছেলের পাতের কাছে চলিয়া আসিলেন, পাছে সে আধখাওয়া করিয়াই এই দুর্ম্মুখী ঝিয়ের মুখের ভয়ে উঠিয়া পড়ে।

বিলাসী সেই মোটা মোটা অপরিষ্কার ভাতের রাশিটির দিকে চাহিয়া যেন আচমকা অবাক্ হইয়া গিয়াই গালে হাত দিল—

"ও মা। জামাই বাবু! তুমি ঐ ভাতের কাঁড়িটি খাবে? উ কি গো! ঐ বানের মতন গোটা গোটা মোটা ভাত অত ক'রে খেয়ো নি, বাবু, ব্যারামে প'ড়ে যাবে যে! ও তোমাদের ভদ্দর লোকের পেটে সইবে কেন গো?"

চারু লজ্জায় মাথা নত করিয়া কি বলিবে, কি করিবে, যেন কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

চারুর মা এ দিকে কিন্তু বেজায় রকম রাগিয়াছিলেন; তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সরোষে কহিলেন, "তা বাছা, আমাদের ঘরে ত আর তোমাদের মত লুচির গোছা, ক্ষীরের বাটি নেই; ভাত দুটো না খেলে খাবে কি বল ত? অমন ক'রে ছেলের আমার খাওয়া তুমি খুঁড়ো না, তা' আমি ব'লে দিচ্ছি।"

বিলাসীর মনের সে গভীর বিস্ময় তখনও যেন দূরীভূত হয় নাই, এমনই ভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া গাল কাৎ করিয়া সেই গালে অসহায়ভাবে হাত দিয়া সে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এই অনুযোগ গায়ে না মাখিয়াই তেমনই অবাক্ স্বরে সে কথা বলিল, "তা, মা, ক্ষীরের বাটি, লুচির গোছা না হয় সবার ভাগ্যে জোটে না, তা মান্‌লাম,—কিন্তু তাই ব'লে মা, তুমি কতকগুলো 'হাবজা'-'গোবজা' দিয়ে যে সোনার চাঁদ বেটাছেলের কোলে ভাতটি ঢেলে দিয়েছ, তা ওসব 'শুদ্ধুর ভাদ্দুর' ছোট নোক মোট নোক আমাদেরই পেটে সয় না, মা! ওঁদের পেটে গেলে কি আর রক্ষে রাখবে! কে জানে বাবু! তোমাদের খাওয়া-দাওয়ায় ভরসা বাছা খুব বল্‌তে হবে! আমরা কি অমন দেখতে পারি? আমাদের ত আর ও সব দেখা অভ্যেস নেই, তাই অমন ধারা কাণ্ড সব চোখে যেন দেখলেই ভয় করে। এই সে দিনে তুমি কাঁঠাল ভেঙ্গে চারটি কোয়া যে থপ থপ ক'রে দিদিমণির পাতে ফেলে দিয়ে গেলে, সে দেখে আমি ভয়েতে বুক দুড় দুড় ক'রে মরি! সে আমার মুখের পানে তাকায়, আমি তার মুখের পানে তাকাই; শেষে ইসারা ক'রে পাতের তলায় সেগুনো লুকিয়ে ফেল্‌তে ব'লে দিই, তবে বুকের ধড়ফড়ানি যায়। আমাদের সেখানে বাগানে কাঁদি কাঁদি তাল, বড় বড় সব কাঁঠাল—কিবা তার সুতার; যেন মিছরির পানা; একটি

এত বড় ক'রে মর্ত্তমান কলা, কত কিই যে সব ফলে, তার কি হিসেব আছে? তা সে সব কি বাবুর ভয়ে কেউ বাড়ীতে আন্‌তে পারে, না খায়? সব অমনি গরুকে ধ'রে দেওয়া হয়। ও সব খেলেই না কি কলেরা হয়, আমরাই একটা মুখে দিই নে, মা, বলি গরীব বটি, তবু মানুষের শরীর ত, খেয়ে কি শেষে প্রাণ হারাবো?"

চারুর মা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আমাদের গরীবের ঘরে, বাছা অত বিচার করতে গেলে, চলবে কেন বল? তোমাদের বাবু হলেন বড়লোক, তাঁর সঙ্গে কার কথা! নে বাবা চারু, এই অম্বলের 'কাঁই'টুকু দিয়ে দুটি ভাত টেনে ঐ সঙ্গে মেখে নে। ও কি করলি! যাঃ—উঠে পড়লি যে!"

এই ব্যাখ্যান শুনিতে শুনিতে চারুর খাইবার স্পৃহা অনেক দূরেই চলিয়া গিয়াছিল। সে নিজের চাষার মত ক্ষুধার উপর অসহায়ভাবে রাগিয়া লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতেছিল। ছিঃ ছিঃ, ভদ্রলোক হইয়া এমন অশোভন খাওয়া তাহার যে, একটা দাসীর চোখেও তাহা বিসদৃশ ঠেকে! সে আরক্ত মুখে কোনমতে উঠিয়া পড়িয়া পলাইবার জোগাড় করিয়া বলিল, "না মা! আর আমি মোটেই খেতে পারবো না, ভাত তুমি আজ বড্ড বেশী দিয়ে ফেলেছিলে।"

চৌকাঠের বাহিরে আসিয়া চটি জুতাটা পা দিয়া টানিয়া লইয়া কোন রকমে ঝিয়ের সাম্‌নে হইতে সে ত্বরিত গতিতে সরিয়া পলাইল। পান লইবার কথাটা মনে পড়িলেও তাহা লইতে সে ফিরিয়া আসিল না। কারণ, কাযের মধ্যে বিলাসী এ বাড়ীর পান সাজার ভারটি নিজের হাতে লইয়াছিল, তাহা না লইলে নিজের পক্ষে দোক্তা খাইবার সুবিধা হয় না বলিয়া। যেহেতু, দোক্তাখোরের পান সাজা এমন দৃষ্টিকৃপণের কর্ম্ম নহে।

চারু চলিয়া গেলে চারুর মা মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া বিলাসীর দিকে ফিরিলেন। রাগে তাঁহার ঠোঁট কাঁপিতেছিল ; বলিলেন,—"হ্যাঁগা মেয়ে, বলি, অমন ক'রে খাওয়ার সময় আমার ছেলের খাওয়া তোমার খোঁড়া কেন, বাছা ? কি এমন এক কাঠা চালের ভাত তুমি ওকে খেতে দেখলে যে, অমন করেই লজ্জা দিলে ?"

ছেলে যে আধ-খাওয়া করিয়া উঠিয়া গেল, ইহাতে রাগে দুঃখে গৃহিণীর কান্না আসিয়াছিল।

বিলাসী ইহার মধ্যে লজ্জা পাইবার মত কিছুই খুঁজিয়া না পাইয়া অতি সহজভাবেই এ অনুযোগের জবাব দিল,—"তা মা, বেশী খাওয়ায় লক্ষ্মীর-ছিরি থাকে না, এই দেখছো ত, আমাদের বাড়ীর সবাইকার কত ক'টি ক'রে খাওয়া। তবু তোমার এখানে কি-ই বা খাবার আছে ? ওদের কত ম্যাওয়া, কত ঘি-দুধ খাওয়া অভ্যেস, তা এখানে পাচ্ছে কি তেমনি কিছু ! তবু ত ঐ ক'টা ভাত নিয়েই নাড়ে চাড়ে। যেন একটি পাখীর আহার। যাই, দিদিমণিকে ডেকে আনি গে, একে ত ঐ আসচালের মোটা ভাত, তাতে আবার জুড়িয়ে গেলে গলা দিয়ে সে উল্‌বে কেন ?"

"দেখ বাছা ! তোমার বড় টেকটেঁকে কথা। গরীবের ঘর দেখে বেহাই মেয়ে দিয়েছেন, এখন উঠতে বসতে অত ধনের নাড়া দিলে সে আমি সইবো কিসের জন্যে ? এত যদি, তবে মেয়েকে ঘর-জামায়ে ক'রে ঘরে রাখতে হয় ; না হয় মেয়ের সঙ্গে একখানা তালুক লিখে দিতে হয়। আমার যেমন জুটবে, তেমনি আমি দেবো, সেইমত চল্‌তে হবে। অত কঁ্যাটকঁ্যাট ক'রে খোঁটা আমি তোমার কাছে দিন-রাত্তির খাবো না, খাবো না, স্পষ্ট করেই তোমায় তা ব'লে দিচ্ছি, বাপু !"

বড়লোকের বাড়ীর দাসী, মনটাও বোধ করি তাই যথেষ্ট বড় ! বিলাসী

এ ভৎ´সনায় রাগ ত করিল না, বরং ঈষৎ হাসিয়াই বলিল, "ঘরেই রাখবে, ঘরবসত করতে এই যা একবারটি পাঠিয়েছে, আর তা ব'লে পাঠাচ্ছে না। জামাই বাবুর একবার পড়াটাই শেষ হ'লে হয়। তখন ঐখানেই ত ডাক্তারখানা-টানা সব ক'রে দেওয়া হবে। সে আর ক'টা দিন। তখন আর এ-মুখো হবে? নেহাৎ ওনারই সাধ দেখে এই মাস খানেকের তরে এই যা পাঠিয়ে দিলে। তা' মা কি বাবু—কারুই মন নয়।"

চারুর মা'র সর্ব্বশরীর এবার অপমানের আঘাতে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তিনি উগ্র ক্রোধে ধৈর্য্যহারা হইয়া একেবারে তীব্রকণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিলেন, "আঃ মলো! এ মাগীর যত বড় না মুখ, তত বড় কথা! আমার ছেলে গিয়ে ওঁর বাবুর অন্নদাস হবে! কেন, ও কি আমার মুখ্যু ছেলে, না ছেলে বেচে আমি খেয়েছি?"

বিলাসী মন্থর-পদে সরিয়া আসিল, আসিবার কালে অনুচ্চ কণ্ঠে শুধু বলিয়া আসিল, "তা এক প্রকার বেচা বৈ আর কি? ট্যাকার নোবেই ত, বাপু, বড়লোকের ঘরে ব্যাটা দিয়েছ? জান না কি, তাদের মতন লোকের মেয়ে তোমাদের মত লোকের ঘরে পা ধুতেও আসে না? শুধু ছেলেটির জন্যেই ত যা কিছু!"

কথাটা বড় সত্য! হায় রে টাকা! হায় রে মাতৃ-হৃদয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা! ছেলেকে ত সে দিনই ছেলের মা বেচিয়া ফেলিয়াছেন—যে দিন তিনি তাহার শ্বশুরের দেওয়া নগদ দুইটি হাজার টাকা দিয়া এই তাঁহার শ্বশুরের ভিটাটুকুর বন্ধক ছাড়াইয়া ইহার জীর্ণসংস্কার করাইয়াছেন!

তা' ছেলে বেচিতে খুব বেশী লাগে না ত। মেয়ের বাপ কতই বা জামাইয়ের উপর খরচ করিয়া তাহাদের নিজের করিয়া থাকেন? মা-বাপের আশৈশব সব খরচের (স্নেহের ও কষ্টের হিসাবে না হয় বাদই পড়ুক)

দাবী নিঃশেষে ফুরাইয়া তাঁহারা কোথাও দু'তিন হাজার, কোথাও না হয় ন'দশ হাজারই হউক, ইহার বেশী ত'আর দাম দেন না!

চারুর মা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন পূর্ব্বক নিজকার্য্যে মনোযোগী হইলেন।



চারুর স্ত্রী প্রমীলার বয়স যদিও চৌদ্দ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ঐ বয়সে বাঙ্গালীর মেয়ের জীবন যে ভাবে গঠিত হয়, ইহার মধ্যে তাহার কিছুই পরিণতি দেখা যায় না। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, সে মেয়ে হইয়া জন্মিলেও, এই বয়সে বিবাহিত হইয়া শ্বশুরঘরে ঘর করিতে আসিতে বাধ্য হইলেও স্বভাবটাকে সে ত্যাগ করিয়া আসিতে পারে নাই, আর সেই স্বভাবটিও মোটে মেয়েলী স্বভাব নহে। হুড়োহুড়ি পাছড়া-পাছড়ি করিয়া বেড়ান, হিঃ হিঃ—হাঃ—হাঃ হাসি, লাফাইয়া ঝমর-ঝমর করিয়া কর্ণপটহ-বিদীর্ণকারী হাস্যতরঙ্গের সৃষ্টি করা—এই সবেতেই তাহার রুচিটা খুব বেশী। পুতুল সাজাইয়া বসিয়া যে ঘর-করনার খেলা, সখী-সাথীদের সঙ্গে পুতুলের বিয়ে দেওয়া, তাহা লইয়া আমোদ-প্রমোদ তত্ত্ব-তাবাস সাজান, সে সব তাহার যেন প্রকৃতির মধ্যেই নাই। পাড়ার মেয়েরা দুই দিন চার দিন তাদের পুঁতিমালা ও রাংতার মল-পরা ছোপান ন্যাকড়া-জড়ানো কাচের ও মাটীর পুতুলগুলি লইয়া তাহার সঙ্গে খেলা করিতে আসিয়াছিল। প্রমীলা তাহাদের মোটেই আমল দেয় না, মেয়েদের অনুরোধে তাহার বিচিত্র পোষাক-আঁটা মেম-পুতুলে-ভরা বাক্সের ডালা তুলিয়া তাহাদের সে সব দুষ্প্রাপ্য বস্তু-সম্ভার দেখাইয়া কিঞ্চিৎ প্রশংসাপূর্ণ করিয়া তুলিল বটে, কিন্তু এদের মধ্যের একটির সহিত তাহাদের কাহারও ছেলেমেয়ের বিবাহের সম্বন্ধে সে রাজী হইল না। চাঁপা, চন্দন ও ফেলীর একান্ত সাগ্রহ আবেদনের

উত্তরে মুখখানা বেজায় ভার ও গম্ভীর করিয়া সে এই বলিয়া জবাব দিল, “না ভাই! ওদের আমি এই পাড়াগাঁয়ে বিয়ে দিতে পারবো না! দিলে আমি যেমন আমার মা-বাপকে দোষ দিচ্ছি, আমায় পাড়াগাঁয়ে দেওয়ার জন্যে, ওরাও ত আমায় তাই দেবে!”

ফেলী তাহাতেও ছাড়ে না, সে বলে, “তা না হয় বিয়ে আবার ফিরিয়ে নিও, একবার ত দাও। আমাদের, ভাই, বড্ড সাধ গিয়েছে।”

তাহাতে প্রমীলা অসন্তোষে হাস্য করিয়া জবাব দেয়, “সে হয় না, ভাই, দেখছ না, এরা সব মেমসাহেব, এদের তোমাদের ঘরে যেতে বল্লে, চটেই এখনই এরা আগুন হয়ে উঠবে। তার চেয়ে ছাদে চলো, জল-ডিঙ্গাডিঙ্গী খেলি গে।”

মেয়েগুলি নিতান্তই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পুতুলগুলি লইয়া ফিরিয়া গেল। দুই একজন তাহাকে বরের গল্পর জন্য ধরিয়াছিল; চাঁপা, টেঁপী ও সৈরভী তাহাদের মধ্যে অগ্রণী। টেঁপী প্রথম দিন আসিয়াই বলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, “চারুদা’র সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা হয়, সে সব বলা চাই।”

দ্বিতীয় দিন আসিয়া সে সেই দাবী তুলিতেই প্রমীলা অবাক্ হইয়া গিয়া উত্তর করিল, “ও মা, কাল মোটে এসেছি, এসেই কথা কইব কি? আমি ত আগে থেকেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি ভাণ ক’রে রইলুম, তার পর যখন এসে কথা কইতে এল, ঘুম ভাঙ্গলুম না, হাত ধ’রে টানতে যেতেই এক ধাক্কা। আর একটু হলেই খাট থেকে প’ড়ে যেত। আমার তখন এমনি হাসি পেয়েছিল, আর একটু হলেই হেসে ফেলেছিলুম আর কি! ভাগ্যে ভাগ্যে সামলে গেছি।”

চাঁপা সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, “তার পর?”

প্রমীলা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, “তার পর আবার কি? যতই ডাকে, সাড়া দিই নে, মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরের মত জড়িয়ে জড়িয়ে ‘আঃ! উঃ!

করি, শেষটায় নিজেই হায়রাণ হয়ে শুয়ে পড়লো। ব্যস! তার পর সত্যিকারের ঘুম! তবু অন্ধকার ব'লে ভাল ক'রে ঘুমুতে পারি নি।"

ইহার পরদিনের দাম্পত্য ইতিহাস উদ্ধার করিতে আসিয়া টেঁপী-সৈরভীর দল প্রায় এক রকমেরই কাহিনী শুনিয়া গেল। সে দিন অবশ্য শেষটায় ঘুম ভাঙ্গাইতে হইয়াছিল এবং স্বামীর প্রেমালাপের অশেষ চেষ্টার উত্তরে একটা জবাবও দিতে হইয়াছিল। সেটা এই—

"সারাদিন তোমার মা'র উপদেশ, রাত্তিরে তোমার বড়বড়ানী, এতে আমায় তোমরা পাগল ক'রে ছাড়বে দেখছি! না ঘুমুলে আমার অসুখ হবে, এখানে ত তোমাদের ডাক্তারও কত ভাল! শেষটায় আমি ম'রেই যাব।"

এই কথাটাও সে না চাপা দিয়া বেশ গর্ব্বিতভাবেই বলিয়া গেল। চারুর পক্ষ হইতে যে ইহার প্রত্যুত্তরে দিন দুই তিন কথা বন্ধ ছিল, তাহাও কাহারও অবিদিত রহিল না।

রাত্রিতে শয্যায় এই রকমেই প্রেমালাপটা চলিতে থাকে, কদাচ সামান্য একটুখানি ব্যতিক্রম হয়; কিন্তু দিনের বেলা যত লোকের মধ্যেও বরের সঙ্গে কথা কহিতে, তাহাকে ফাইফরমাইস করিতে প্রমীলার কিছুমাত্র লজ্জা বা আপত্তি নাই। দিনের বেলা স্ত্রীকে লুকাইয়া চুরি করিয়া দেখার লোভে চারু বেচারা চারিদিকে উঁকি মারিয়া বেড়ায়। দৈবাৎ আড়ালে দেখা হইলে হাতটা ধরিয়া কাছে টানিয়া আনে, একটুখানি আদর-সোহাগও জানাইতে চেষ্টা যে না করে, তাহা নহে। কিন্তু বেশী ভরসা সে করিতেই পারে না। হয় ত পিছন হইতে গিয়া চোখটা চাপিয়া ধরিয়াছে, প্রমীলা তখনই "মা গো! কে গো!" বলিয়া এমনই চেঁচাইয়া উঠে যে, ঝি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত। অপ্রস্তুত চারু তাড়াতাড়ি চোখ ছাড়িয়া দিয়া পলাইতে পথ পায় না। আবার তাহারই মধ্যে

শ্বশুরবাড়ীর আতুরে ঝির তিরস্কারটুকুও লাভ করিয়া যায়—"বলি জামাই বাবু! আহা, ছেলেমানুষকে কি এমনি ক'রেই ভয় পাওয়ায় গা? যদি চমকে উঠে ভিরমি যেত! তোমাদের পাড়াগেঁয়ে মেয়ে ত নয়, যে, বাঘের সঙ্গে কুমীরের সঙ্গে লড়তে ডরায় নি।"

চারুর সকৌতুক প্রেমলীলার সকল আগ্রহ দারুণ লজ্জার অবসাদে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়া তাহাকে মাটী করিয়া দিত, তথাপি তাহার যৌবনোৎফুল্ল তাজা প্রাণ ইহাতেই একেবারে দমিয়া পড়িত না। সে অশিক্ষিত বা নির্ব্বোধ নহে, নিজের মনকে সে এই বলিয়া বুঝাইত যে, "এইসা দিন নেহি রহেগা।" এবং ইহার জন্য পণ্ডিত জনের বাক্যানুসারে "শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ কন্থা, শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্" এই নীতি অনুসারেই চলিত। তাহার চরিত্রে উত্তেজনা বা লোভ কিছুই খুব বেশী প্রবল নহে। বিশেষ প্রমীলার বাপের বাড়ীর সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করিয়া সে নিজে তাহার কাছে অন্তরে বাহিরে অত্যন্তই কুণ্ঠিত হইয়া থাকিত। ইহার উপর তাহার ছোট-খাট দোষ-ত্রুটি ধরিয়া তাহার দুঃখ বাড়াইবার প্রবৃত্তিও তাহার ছিল না। তবে ঐ দুর্ম্মুখী দুঃশীলা মন্থরাপ্রকৃতি ঝিটিকে সে-ও আদৌ দেখিতে পারিত না এবং সে ইহাও ভাবিত যে, ঐ ঝিটি মাঝখানে না থাকিলে প্রমীলাও অনেকখানি অন্য রকম হইতে পারিত। মা'র উপরেও চারুর মনে এ সম্বন্ধে একটুখানি সূক্ষ্ম অভিমান ছিল। অনেক সময় সে দেখিত, তাহার মা সেই হীনজাতীয়া ঝিয়ের কথায় এত বেশী উত্তেজিত হইয়া তাহার সঙ্গে সমানভাবে কলহ করিতেন যে, সে তাহাতে যেন লজ্জায় মরিয়া যাইত। অশিক্ষিতা একটা সামান্য স্ত্রীলোকও যাহা, আর চারুর নিজের মা-ও কি তাহাই হইবেন? সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, এ সকল মহৎ গুণাবলী না থাকিলে আর বড়-ছোটয় প্রভেদটা কি রহিল? জগতের এ বৈষম্যই যদি ঘুচিয়া যায়, তবে ত এ দেশেও আভিজাত্যের মৃত্যুকাল আসিয়া পৌঁছিয়াছে

বলিতে হইবে! এই রকম করিয়াই চারু এই দাসীবিভ্রাটটাকে নিজেও সহ্য করিয়া লইত এবং তাহার ইচ্ছা হইত যে, তাহার মা-ও তাই করেন। মা'র কিন্তু মনের ভিতরটায় অত বড় উদারতার কোন খবর পাওয়া যাইত না। তিনি ঝিয়ের প্রত্যেক চিপটেনীটির জবাব ত যথাসাধ্য রূঢ় করিয়া দিতেনই, আবার সেই সব কথাই সাতটি করিয়া চারুর কাছে যখন তখন লাগাইতে যাইতেন। তাহার পর আরও এক বিষয় ইহার অপেক্ষাও চারুকে বেশী ব্যথিত ও বিব্রত করিয়া তুলিতেছিল, তাহা শ্বশ্রূ-বধূর পরস্পরের প্রতি ব্যবহার। বউ ত শাশুড়ীকে ভয়, ভক্তি, এমন কি, একটুখানি সমীহ করিয়া চলেই না, শাশুড়ীও যতটা পারেন, কথার খোঁটায় খোঁটায় ইহার শোধ তুলিয়া লয়েন। তাহাতেও যখন কোন কায হয় না, অথবা বধূর পক্ষের প্রবল শক্তির নিকট তাঁহাকে হার মানিতে বাধ্য হইতে হয়, তখন আবার ছেলের কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িয়া উহাদের উদ্দেশে বিস্তর কটুকাটব্য করিতে থাকেন। তিনি কখন বলেন, "তোর মুখ চেয়ে ঢের সইলুম, বাবা! আর আমি পারছিনে চারু! তুই ওদের কোন বিহিত কর্।" কখন বলেন, "আমার দিব্যি দেব, তুই যদি ঐ বড়মানুষের মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়ে আবার একটা বিয়ে না করবি। তাই কর্ চারু, তাই কর্, দেমাকে মাগী মিন্‌যে আর ঐ তাদের গতরখাকী আদুরী মেয়ে একসঙ্গে জব্দ হোক্।"

চারু মা'র এই সকল কথায় অত্যন্ত বেদনা পাইত। মাকে সে চিরদিন প্রাণপণেই ভালবাসিয়াছে। পিতৃহীন চারু পৃথিবীতে মা ভিন্ন জানেই বা আর কাহাকে? সেই মা তাহার জন্য এতখানি অস্বস্তি ভোগ করিতেছেন, অসুখী হইয়া পড়িতেছেন, অপমানিতাও হইতেছেন, ইহাতে তাহার যে অত ঠাণ্ডা রক্ত, তাহাও যেন গরম হইয়া উঠিতে চাহিত। সে যখন বিবাহ করিতে যায়, মা'কে বলিয়া গিয়াছিল, "মা, তোমার দাসী

আনিতে যাইতেছি," মনেও করিয়াছিল তাহাই, দাসী না-ই হউক, অন্ততঃ মায়ের একটি মেয়ে—একটি সঙ্গিনী আনিয়া দিয়া নিঃসঙ্গ জননীর সে অনেকখানি তৃপ্তিসাধন করিতে পারিবে। কিন্তু এ কি হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল! ইহার অপেক্ষা আজন্ম সে আইবুড় হইয়া থাকিত, সে-ও যে তাহার পক্ষে ঢের বেশী ভাল হইত।

আবার এমন কথাটাও ভাবিতে চারু মনে মনে বেদনা বোধ করিত। আশার যে প্রবল প্রোজ্জ্বল দীপশিখা অন্তরে জ্বালাইয়া সে প্রমীলাকে তাহার অন্তর বাহিরে বরণ করিয়া লইয়াছিল, তাহার মোহিনী শক্তিতে তাহার মন আজিও যে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া আছে! এ আশাদীপ কেমন করিয়া সে নিবাইয়া ফেলিবে? আত্মীয়স্বজন, ভাই, বোন্ তাহার কেহই আপন বলিতে নাই, আবার মুখচোরা চারুর বাহিরের বন্ধুও কেহ অন্তরঙ্গ-ভাবে ছিল না; তাই সে তাহার আশৈশব অভ্যস্ত ভয়, লজ্জা, স্নেহ, প্রেম, প্রীতির অঞ্জলি উজাড় করিয়া লইয়া তাহার মানসমন্দিরের এই একমাত্র প্রিয়তমার চরণপদ্মে ঢালিয়া দিয়াছিল। তাই তাহার সেই প্রেমের দেবতার প্রেমহীনতায় সে মনে মনে ব্যথা পাইত, কিন্তু আশা ছাড়িত না; অধিকন্তু তাহার প্রীতির দেবতাকে তাহার জগতের শ্রেষ্ঠ বন্ধু মা'র কাছে অপ্রীতি-ভাজন দেখিলে তাহার মন গুমরিয়া কাঁদিতে থাকিত। কত দিন সে এই কথা মনে করিয়া ক্ষোভের নিশ্বাস মোচন করিয়াছে, কি পাপে সে এমন অসুখী হইতে বসিয়াছে? কেন প্রমীলা তাহার মা'কে আর তাহার মা প্রমীলাকে একটু সহ্য করিয়া চলিতে পারিল না?

৪

আষাঢ়ের নবনীল কাদম্বিনী সৌরকরজাল সমাচ্ছন্ন করিয়া দিয়া, কঠোর শব্দে শব্দায়মান বজ্রপ্রহরণে সাজিয়া আসিয়াছিল। চারুদের অঙ্গনে চারুর মা'র পূজার জন্য কয়েকটি ফুলগাছ সযত্নে প্রতিপালিত হইত; ইহাতে যূঁই ও মল্লিকা অজস্র ফুটিয়াছিল; তাহারা হস্ত-নিষিক্ত জললাভকে যেন পর্য্যাপ্ত বোধ না করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত মুখে উর্দ্ধে চাহিয়া আছে। মেঘের গুরু গুরু গম্ভীর তূর্য্যরবে তাহাদের ক্ষুদ্র প্রাণ ভয়ে নহে, পরন্তু আসন্ন লাভের আশায় আনন্দে ঐ গুরু গুরু শব্দের প্রতিধ্বনি তুলিয়া নাচিয়া উঠিতেছে। এক পাশে একটি মাচায় করিয়া একটা মালতীলতা, চারুই কোথা হইতে আনিয়া পুতিয়াছিল, সেটা ত আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছিল—বাতাসের সঙ্গে তাহার যেন সে দিন কথার শেষ হইতেছিল না। আর খুসী হইয়াছিল চারুর মা'র রান্নাঘরের পাশের বাঁশঝাড়গুলা। তাহাদের পাতাগুলা সর্ সর্ ঝর্ ঝর্ করিয়া কত কিই না বলাবলি করিতেছে, কাটা বাঁশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাতাস ঢুকিয়া ফুঁ দিয়া দিয়া বাঁশীর তান ধরিয়া দিয়াছে। তাহাদের উঁচু মাথা নত হইয়া হইয়া আসন্নবর্ষী নব মেঘমালার উদ্দেশে প্রণতি জানাইতেছে। কণ্ঠে বুঝি উহারই বন্দনা-গান!

এই আকাশ-ভরা মেঘের আড়ম্বর ও ঝড়ের হাওয়ায় প্রমীলা ভারী খুসী হইয়াছিল। তাহার শ্বশুরবাড়ীর কঠোর নাগপাশে বাঁধা মন-প্রাণ এ দৃশ্যে ময়ূরের মত সঘন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছিল। পাড়ার তিনটি ছোট ছেলে সে সময়ে তাহার নিকট উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া লইয়া সে দ্রুত চঞ্চল চরণে তেতলার ছাতে উঠিয়া গেল; সেখানে কতকগুলি কাপড় শুকাইতে দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলি তুলিয়া লইবার কথা তাহার

মনেও হইল না, আমসত্তর পাতরখানাও তাহার দৃষ্টিতে পড়িল না। সে ঐ সঙ্গী দলের সঙ্গে মাথায় দেওয়া অঞ্চলখানাকে খুলিয়া দুই হাতে হাওয়ার বিপরীত দিকে পালের মত তুলিয়া ধরিয়া ঝম্‌-ঝম্‌ মল বাজাইয়া একেবারে উদ্দাম হইয়া ছাতের এ-ধার হইতে ও-ধার পর্য্যন্ত ছুটিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আর সে হাসিরই বা ঘটা কি!

চারুর মা নীচে হইতে অনেক ডাকাডাকি করিয়াও কাহারও সাড়া পাইলেন না। বিলাসী পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিল, চারুও বাড়ী নাই। এ বাড়ীর ঠিকা ঝি এখনও দেখা দেয় নাই। তেতলার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে চারুর মা'র বুকে বড় হাঁপ ধরে, তাই যথাসাধ্য চীৎকারশব্দে বধূকে ডাকিয়া তিনি শেষে স্থির করিলেন, বউ হয় ত কোথাও ঘরে দ্বোর বন্ধ করিয়া শুইয়া আছে, ঘুম অবশ্য সে দস্যি মেয়ের চক্ষুতে নাই, তথাপি হয় ত কেমন করিয়া দৈবাৎ আজ ঘুমাইয়া পড়িয়া থাকিবে।

যখন চড়বড় করিয়া মোটা মোটা বৃষ্টির ফোঁটা পড়িতে আরম্ভ হইল, তখন অগত্যা চারুর মা'কে শুষ্ক কাপড়, বিশেষতঃ আমসত্তর মমতা ব্যস্ত-সমস্ত করিয়া উপরে তুলিয়া আনিল। কিন্তু ছাতে উঠিয়াই তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল—বধূর আক্কেল দেখিয়া। গায়ের মাথার কাপড় খোলা—পাল-তোলা ঝড়ে-পড়া নৌকার মত। আর তিনখানা ঐ রকমই নৌকার মধ্যবর্ত্তী হইয়া সে ছাতখানাকে তোলপাড় করিয়া ফিরিতেছে। বৃষ্টি বলিয়াও কোন দিকে দৃক্‌পাত নাই; জিনিষগুলা যে নষ্ট হইতেছে, সে দিকেও ভ্রূক্ষেপ নাই। চারুর মা'কে ক্রোধ ও লজ্জা যেন অন্ধ করিয়া দিল, অত বড় মেয়ে এতটুকু লজ্জা-সরমও দেহের মধ্যে নাই—তিন তিনটে বেটাছেলের মধ্যে গা-মাথা খুলিয়া ঐ তাণ্ডব!

তিনি জ্ঞানশূন্যের মত দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় করিয়া উঠিয়া বধূকে উচ্চকণ্ঠে গালি দিয়া উঠিলেন; বলিলেন—"ভালখাকির বেটী! কি বল্‌বো,

তুই আমার চারুর বউ, তা' না হ'লে তোকে আমি আজ পাঁশ পেড়ে কেটে ফেলতুম!"

প্রমীলা উড়ন্ত পালতোলা আঁচলখানাকে তেমনই ভাবে ধরিয়া থাকিয়াই দৌড় বন্ধ করিয়া সদর্পে ফিরিয়া দাঁড়াইল; উদ্ধত কণ্ঠে সবেগে কহিয়া উঠিল, "কি, করেছি কি যে, খামোকা এসেই গাল দিলে?"

এই ধৃষ্টবাক্যে চারুর মা'র চিত্ত ছাড়িয়া পিত্ত অবধি যেন জ্বলিয়া উঠিল, তিনি রোষপুরুষ তীব্র কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"হতচ্ছাড়ী হারামজাদী! দোষ ক'রে ফের চোপা! বেহায়া ছোটলোকের বেটী! কোন্ দিন তুই কুলে আমার কালি দিবি! বেটাছেলের সঙ্গে এই ধীঙ্গীনাচ বউমানুষের!"

এই সাঙ্ঘাতিক ভীষণ অভিব্যক্তির একটা ভীষণতর ফলও এক মুহূর্ত্তে যেন একটা উন্মত্ত হিংস্র রোষে আরণ্য পশুর মতই উদ্দাম হইয়া উঠিল। সে ফোঁস করিয়া ছুটিয়া আসিয়া দুর্দ্দান্ত বাঘের মতই শাশুড়ীর ঘাড়ের উপর পড়িল। তিনি তাহাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া দিতে যাইতেই সে তখন তাঁহার সেই হাতখানা এমন প্রাণপণ জোরে কামড়াইয়া ধরিল যে, দেখিতে দেখিতে তাহার দাঁতের পাশ দিয়া হাত হইতে রক্ত ঝরিয়া পড়িয়া গেল।

এদিকে প্রমীলার এই অমানুষিক কাণ্ডে মহাভয়ে ভীত হইয়া তাহার সঙ্গী তিনটিই দুড় দুড় শব্দে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। তাহাদের মনে হইল, ইহার পর তাহারা সুদ্ধ এই ব্যাপারে এমন হইয়া জড়াইয়া পড়িবে যে, সে একটা বিশ্রী কাণ্ড হইয়া যাইবে। সিঁড়ি দিয়া ছুটিয়া নামিতে নামিতে তাহারা প্রত্যেকেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া লইল যে, আর কখন তাহারা প্রমীলার সহিত খেলার লোভে এ বাড়ীর মাটী মাড়াইবে না।

"কেষ্ট! মতে! কোথা যাচ্ছিস্ রে? তোদের বৌদি কোথা? মা কোথা?" চারুর এই সহাস্য প্রশ্নে কেবলমাত্র তাহারা ভীত দৃষ্টিতে বারেক উর্দ্ধদিকে ইসারা করিয়াই দ্বিগুণ বেগে ছুটিয়া পলাইল।

ঝড় তখন প্রবল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, তাই দূর হইতেই শুনা যায় নাই, নিকটে আসিতেই একসঙ্গে চারুর দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় উভয়ই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিল। চারুর স্ত্রী কুপিতা সিংহীর মত রাগে ফুলিতে ফুলিতে শাশুড়ীকে কামড়াইয়া ধরিয়া আছে, আর তিনি অপর হস্তে তাহাকে ধাক্কা দিতে দিতে অজস্র ধারায় তীব্র গালির স্রোতঃ প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন।

এই দৃশ্যের দ্রষ্টা হইয়া প্রথমটা চারু যেন বজ্রস্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। প্রমীলা যতই মন্দ হউক না, সে যে এত বড় অসমসাহসিকতা ও অনাচার ঘটাইতে পারে, এ বোধ করি, নিজের চোখে না দেখিলে চারু কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারিত না। পরক্ষণেই একটা নিদারুণ ক্রোধের আগুন তাহার শরীরের প্রতি রন্ধ্রে ঢুকিয়া পড়িয়া তাহাকে যেন পাগল করিয়া তুলিল। তাহার মা'র রক্ত প্রমীলার ঠোঁটের পাশে গড়াইয়া আসিয়াছে! চারু নিজের পায়ের চটি-জুতা খুলিয়া লইয়া প্রচণ্ড বলে প্রমীলার পৃষ্ঠে আঘাত করিল।

এই যে কাণ্ডগুলা অকস্মাৎ কয়েকটা মাত্র সেকেণ্ডের ভিতর ঘটিয়া গেল, ইহা কেহই কি কোনদিন কল্পনা করিতেও পারিত? চারুর মা পল্লীবাসিনী অশিক্ষিতা মুখরা স্ত্রীলোক হইলেও চারুর বউকে বাপ তুলিয়া বা তাহার চরিত্র লইয়া যে এত বড় কঠিন কথাগুলা সে দিন বে-ফাঁস ভাবেই বলিয়া ফেলিবেন, তাহাও তিনি সুস্থমনে কখনও হয় ত মনে করিতে পারিতেন না। প্রমীলা শাশুড়ীকে ভাল না বাসিলেও, শ্রদ্ধা না করিলেও, সে যে কদাচ কাহারও সহিত এত বড় অসৎ ব্যবহার করিতে পারে, সে-ও

কখনও এরূপ কল্পনাই করিতে পারিত না। আর চারু? তাহার ত কথাই নাই।

প্রথমটা রাগে অন্ধ হইয়া গিয়া চারু যখন স্ত্রীকে জুতা মারিয়াছিল, তখন তাহার মনে শুধু এই কথাই প্রবল হইয়া জাগিয়াছিল যে, সে তাহার মাতৃ-অঙ্গে আঘাতকারীর দণ্ডবিধান করিতেছে। দণ্ডটা যে কতখানি হইয়া গেল, এ কথাটা তাহার তখন যেন একেবারেই আর খেয়ালের ভিতর ছিল না। মা'র দুর্জ্জয় ক্রোধ, অভিমান ও দুঃখে মিশ্রিত অজস্র উত্তেজনাব বাণী, মাথার উপরের বৃষ্টিধারার সঙ্গে সমান স্রোতে তাহার ফুটন্ত রক্তের উত্তাপ বর্দ্ধিত করিতেছিল। তাহার পর তাহাকে সহসা স্তম্ভিত করিয়া দিল—সেই রঙ্গভূমে চতুর্থ ব্যক্তির আকস্মিক আবির্ভাব! বোধ করি, সেই ছেলেদেরই কাহারও মুখে অর্দ্ধেকটা ঘটনার কাহিনী কর্ণ-গোচর হইয়াছিল, তাই বিলাসী এই ঝড়-জল মাথায় করিয়াই হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। চারুর হাতের দ্বিতীয় জুতার ঘা প্রমীলার পিঠে পড়াব সঙ্গে সঙ্গেই সে আসিয়া আকাশের মেঘের শব্দ ডুবাইয়া দিয়া কঠোর কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—"জামাই বাবু!"

সঙ্গে সঙ্গেই বাঘিনীর মত ঝাঁপাইয়া গিয়া ধাক্কা দিয়া বিলাসী চারুকে ঠেলিয়া দিল এবং প্রমীলাকে বুকের মধ্যে সাপটিয়া ধরিল।

"জামাই বাবু! মনে করতুম, তুমি বুঝি তবু একটু ভদ্দর নোক; তা নয়, তুমি আমাদের বাগদী দরোয়ান ভজার চেয়েও বেহদ্দ! নেকাপড়া শিকে মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুল্‌তে ঘেন্না হলোনি? তাও আবার পায়ের জুতো! গলায় দড়ি অমন নেকা-পড়ায়!"

চারুর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল! এ তিরস্কারে নিজের কৃত কর্ম্মটা যেন তাহার চোখে তৎক্ষণাৎ জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সত্যই ত, সে এ কি করিয়া ফেলিয়াছে! তাহার মা'র নির্য্যাতনের শোধ লইতে

গিয়া নিজে সে বড় ভয়ানক পাপ করিয়া ফেলিয়াছে যে! অমন করিয়া জুতামারাটা তাহার মোটেই সঙ্গত হয় নাই। অথচ এ ছাড়াই বা সে অবস্থায় সে কোন্ সহজ উপায়ে প্রমীলার হিংস্র দংশন হইতে তাহার মা'কে ছাড়াইতে পারিত, সে কথাটাও বেশ ভাল করিয়া তাহার উৎক্ষিপ্ত চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল না। এ কাযটা যে খুব বেশী অন্যায় হইয়াছে, এমন ভাবনা মা'র তখনকার অবস্থা স্মরণ করিতে গেলে মনে করিতে পারা শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। আবার এই বালিকা, তাহার স্ত্রী, ইহাকেও নির্ম্মম-ভাবে জুতা মারা, এ যে পৌরুষের একেবারেই বিরোধী বস্তু, এ যে অত্যন্তই হীনাচার, এ বিষয়েও ত কোন ভদ্রলোকের পক্ষে সন্দেহ করিবার নাই।

বিলাসীর হাতের ঠেলায় পিছনদিকের প্রাচীরের গায়ে ধাক্কা খাইয়া চারু সেইখানেই স্তব্ধ অসাড় হইয়া তেমনই ভাবেই রহিয়া গেল। ঝড়ে, জলে, মেঘের ডাকে প্রকৃতির যেন রুদ্রাণীর প্রতিকৃতি-প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। কিন্তু সেদিকে তাহার কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই। ইহার অপেক্ষা ঘোরতর বিপ্লব তখন তাহার শরীর-মনকে যেন আচ্ছন্ন অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

বিলাসী প্রমীলাকে বুকে বাঁধিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে এবং তাহার শত্রুস্থানীয় মাতাপুত্রের উদ্দেশে প্রবল শাসনবাণী বর্ষণ করিতে করিতে নীচে নামিয়া গেল। এতখানি বৃষ্টির জলে ভেজা যে এ দেশে তাহাদের দুইজনের পক্ষেই সুবিধা নহে, তাহা ভাবিয়াই সে আপাততঃ রণরঙ্গে ভঙ্গ দিয়াছিল। বিশেষতঃ প্রমীলাকে শীঘ্রই শান্ত না করিলে নহে। সে যেন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং সমস্ত ঘটনাটা তাহার মুখ হইতে একবার ভাল করিয়া শুনাও দরকার।

চারুর মা'র সঙ্গে ইহারই মধ্যে একটা খণ্ড-যুদ্ধ হইয়া গেল। গৃহিণী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘটনার যে পরিচয় শুনাইতেছিলেন,

তাহা শুনিয়াই বিলাসী ক্রোধে কম্পিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি বাছা, কম মেয়ে নও! লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে ছেলেকে দিয়ে এই যে কাণ্ডটি করালে, এ কি খুব ভাল হ'ল? বাবু কি ভেবেছ, তাঁর মেয়েকে জুতো মারার রাগ জামাই বলেই ভুলে যাবে? তা' যদি যায়, তা হ'লে এই নাক-কাণ নিজের হাতে কেটে নিয়ে আমি আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেব! সে পাত্তরই নয় তারা।"

চারুর মাও বিলাসীর সহিত সমান স্বরে সতেজে জবাব করিলেন, "কি করবে তোদের বাবু, কর্‌তে বলিস্! তার মেয়ে যে কামড়ে আমাব গায়ের ছাল তুলে নিলে, সেটা কি চোখের মাথা খেয়ে কাণা মিন্‌ষে দেখতে পাবে না? মা'কে ধ'রে মারবাব জন্যেই কি ছেলে আমার তাঁর ঘরে বিয়ে করতে গেছলো?"

"নাঃ, তানাদের মেয়েকে জবাই ক'রে মাংস খাবার তরেই তানারা তোমাদের বাড়ী মেয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল না!" চটাং করিয়া এই জবাবটা দিয়া বিলাসী প্রমীলাকে ধরিয়া লইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। চারুর মা অতঃপর যে সব কথা তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, সে কেবল তাঁহার নিজের কাণে আসিয়াই আঘাত করিয়া যাইতে লাগিল। চারু সেখানে উপস্থিত থাকিলেও, বৃষ্টির শব্দও ততক্ষণে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সেও একটা কারণ বটে, কিন্তু তাহার অপেক্ষাও প্রবলতর কারণ—তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম তখন একেবারেই যেন নিঃশক্তি হইয়া গিয়াছিল। বৃষ্টির বেগ, ঝড়ের চীৎকার, মা'র কণ্ঠ কিছুই তাহার অনুভূত হইতেছিল না। তাহার মনটা যেন একেবারে আচ্ছন্ন অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল।

মা বলিলেন, "আয়, চারু! নেমে যাই। অবেলায় ভিজে গেলি, রোগে না পড়িস আবার। কি কুক্ষণেই যে বাছার বে' দিয়েছিলুম!

ছি ছি ছি, একটা দিন ভালস্তে কাটলো না। তাই ত বলছি বাবা! আবার একটি বিয়ে কর, এদেরও দেমাক ভাঙ্গবে, তোরও সুখ হবে।"

চারু শুধু শূন্যদৃষ্টিতে মা'র মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার পিছনে পিছনে নামিয়া গেল। একটি কথাও সে মুখ দিয়া উচ্চারণ করিল না।



সব যেন এলোমেলো হইয়া গেল। চারুর মা'র বাহিরটা যতই কঠিন দেখাক, তাঁহার মনের ভিতরটা তত দূর শক্ত নয়। তিনি সেই দংশনক্ষত হস্তে জলপটী বাঁধিয়া আবার সংসারধর্ম্মে মনোযোগী হইলেন। প্রতিদিনের মতই রান্নাবান্না সারিয়া চারুকে আহারের জন্য ডাকিতে আসিতেই সে তাহার শূন্য দৃষ্টি অন্ধকারের চক্র হইতে ফিরাইয়া লইয়া নিঃশব্দে মাতার অনুসরণ করিয়া আসিয়া আসনে বসিল। আহারে বসিয়া খুব ভাল করিয়া না-ই হউক, তবু যা' পারিল, খাইয়া উঠিয়া গেল। মাতা-পুত্রে কোন কথাই এখন হইল না, শুধু আচমনের জলের ঘটী ছেলের হাতে তুলিয়া দিয়া মা বলিলেন, "এই মাসেই আমি তোর আবার বিয়ে দেব চারু! এবার কিন্তু নিজে না দেখে আর বউ আন্‌ব না।"

চারু হাঁ, না কোন জবাব না দিয়াই যেমন আসিয়াছিল, তেমনই নীরবে ফিরিয়া চলিয়া গেল। তাহার এ মৌনটা সম্মতিলক্ষণ কি না, ঠিক করিয়া তাহাও বুঝিতে পারা গেল না।

কিন্তু তাই বলিয়া চারুর মা তাঁহার আতিথ্য-ধর্ম্মের প্রত্যবায় ঘটিতে দিলেন না। বধূর ঘরের দ্বারে আসিয়া ডাকিলেন, "বৌমা! খেতে এস। ওগো বাছা, শুন্‌ছো? রাত হয়ে গেছে. উঠে এস! ও ঝি! শুন্‌তে পাচ্ছো গা? বৌমাকে নিয়ে খেয়ে যাও না, বাছা!"

ভিতর হইতে বিলাসীর রোষ-দর্পিত কণ্ঠ সাড়া দিল, "ও আর এ বাড়ীর ভাত খাবে নি গো, একেবারে তখন কালকে বাড়ী যেয়ে মুখে জল দেবে বলছে!"

চারুর মা'র গা আবার এই উত্তরে জ্বলিয়া উঠিল। দোষ যখন উভয় পক্ষেরই আছে, আর তিনি যখন নিজের মান খোয়াইতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন উহাদেরই বা এতখানি তেজ কিসের? তিনি ক্রোধ-গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "সেই ভাল।" মনে মনেও বলিলেন, "তা হ'লে আমিও বাঁচি বাবু! আর বেটার বউ নিয়ে আমার ঘর ক'রে কায নেই মা, দুষ্টু গরুর চাইতে শূন্য গোয়াল ভাল, কি আর সাধ করেই বলে! থাক, কালই একবার সদার পিসীকে ডাকতে হবে। এবারে টাকাওলা ঘরে আর কায করব না, বৌটি যেন সুশীল হয়। আচ্ছা, নিস্তারের মেয়েটি নিলে কেমন হয়? পাড়াঘরেরই মেয়ে, মা'রও যা কিছু আছে, সব পাবে, মুখে রাটুকু নেই! নিত্যি রোগী বটে! তা ছেলে ত আমার ডাক্তার হয়েছে, রোগ হ'লে সারিয়ে নেবে। ডাক্তার-খরচা ত আর লাগবে না!"

ঝড় থামিয়া গিয়াছে, বৃষ্টির বেগও মন্দীভূত হইয়াছিল, টিপ-টিপ করিয়া পড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে বাতাস বাঁশের ঝাড় ও গাছের পাতা নাড়া দিয়া তাহাদের মধ্যের সঞ্চিত জলের ধারা ঝর্-ঝর্ করিয়া ঝরাইয়া ফেলিতেছিল। বহু দিনের পিপাসা-শুষ্ক কণ্ঠ আর্দ্র করিয়া লইয়া ভেকগুলা পরম পরিতৃপ্তির উচ্চ আনন্দোচ্ছ্বাস প্রচার করিতেছিল। নিবিড় অন্ধকারে আকাশ ও পৃথিবী ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

চারু আসিয়া আস্তে আস্তে চোরের মত নিজের শয়নঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়াইল। ক্ষণকাল সেই নিঃসাড় ও রুদ্ধদ্বার কক্ষের বাহিরে কাণ পাতিয়া থাকিয়া যখন ভিতরের কোন খবরই সে জানিতে পারিল না, তখন উদ্বেগ-ব্যাকুল-বক্ষে ধীরে ধীরে দ্বারে করাঘাত করিল। দরজা ভিতর হইতে

বন্ধ। এবার একটুখানি জোর দিয়া ঠেলিয়া সে অনুচ্চস্বরে ডাক দিল, "ঝি!"

"কে গা?" বলিয়া বিলাসী ভিতর হইতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল।

"আমি, দোরটা খুলে দাও ত"—বলিয়াই চারু যেন সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেল। অনেকখানি দ্বিধা ও সঙ্কোচকে অনেক চেষ্টায় কাটাইয়া তবেই সে এতখানি দূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। এখন বিলাসীর গলার স্বর তাহার সেই সঙ্কুচিত মনকে যেন সংশয়সঙ্কুল করিয়া তুলিয়া পুনশ্চ সমধিক দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া ফেলিল। সে যে একটা নিষ্পত্তির শেষ আশা মনের মধ্যে পোষণ করিতেছিল, সেটা তাহার সেই মুহূর্ত্তেই প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল। প্রমীলার এই মন্থরা দাসীটা তাহার আশালতার মূলে যে কুঠারাঘাত করিবার জন্যই এই মধ্য-রাত্রিতেও দ্বারে খিল আটিয়া জাগিয়া বসিয়া তাহাকে পাহারা দিতেছে, ইহা সে অনুমানেই বুঝিয়া লইল।

তথাপি যখন এতখানি অগ্রসর হইয়াছে, তখন ত নিতান্ত ফিরিয়া যাওয়া যায় না। চারু তখন সাহসে ভর করিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল "দোরটা একবার খুলে দাও ত, ঝি।"

ঝি কহিল, "এই রাতটুকুনের তরে আর আমাদের জ্বালিও নি, বাবু; যেমন একটি ধারে প'ড়ে আছি, প'ড়ে থাক্‌তে দাও, সকালবেলা পরাণ হালদারের বাড়ী যেয়ে বাবুকে তার করাবো, তারা এসে আমাদের নিয়ে গেলে তখন নিশ্চিন্দি হয়ে তোমার ঘর তুমিই দকোল করো।"

এই উত্তর পাইয়া চারুর মনে একটা দারুণ লজ্জা হইল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ও দেখা দিল। এই ঘৃণিত নিতান্ত লজ্জাজনক কাহিনী যদি পাড়ায় পাড়ায় প্রচার হয় এবং তাহাদেরই সাহায্য লইয়া যদি বিলাসী এই খবরটা চারুর শ্বশুরকে পাঠায়, তাহা হইলে সে যে কি লজ্জাস্কর ও ক্ষতিকর কাণ্ডই হইবে, তাহা মনে করিতে গিয়াও চারুর মনটা যেন নিদারুণ আশঙ্কায়

পীড়িত হইয়া উঠিল ; কণ্ঠে মিনতি ভরিয়া সে কোনমতে বলিয়া ফেলিল,—
"তুমি দোরটা একটিবার খুলে দাও, আমি বেশীক্ষণ থাকব না।"

ভিতরে একটুখানি ফিস ফিস্ করিয়া কথা কহার শব্দ শুনা গেল, ঝমব করিয়া হঠাৎ প্রমীলার পায়ের মল একবারটি বাজিয়া উঠিল, প্রচণ্ড আশায় চারুর বুকের ভিতরটায় তড়াক্ করিয়া রক্তটা লাফাইয়া উঠিল। স্বয়ং প্রমীলাই কি তবে তাহাকে দ্বার খুলিয়া দিতে উঠিতেছে!

কৈ না! দ্বার ত খুলিল না! চারুর শরীরের স্নায়ুশিরাগুলা যেন ঘনীভূত বেদনায় টাটাইয়া উঠিল। একটা তীব্র ক্ষুব্ধ অভিমান বুকের মধ্যে চাপিয়া লইয়া সে বহুক্ষণ নিস্ফল প্রতীক্ষার পরে ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া চলিয়া গেল। গভীর দুঃখে যেন তাহার বুকটা তখন চড়-চড় করিয়া ফাটিতেছিল। চারুর মনে আজ কি যে অকথ্য যন্ত্রণা, তাহার এতটুকু—একটি বিন্দু ধারণাও যদি তাহাদের থাকিত! শিথিল অবশ পদে চারু সমস্ত রাতটাই ঘরে-বাহিরে পাইচারী করিয়া বেড়াইল। রাত্রি ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল ;—বারোটা, একটা, দুইটা পর-পর বাজিয়া চলিল। বাতাস কখন একটু মন্দীভূত হইয়া মুষলধারায় বৃষ্টি চাপিয়া আইসে, আবার কখন শোঁ শোঁ, গোঁ গোঁ করিয়া ঝড়ের হাওয়া হুঙ্কার ঝাড়িয়া প্রবল অক্রমণে গাছ-পালাগুলারই উপর ঝাঁপাইয়া আসিয়া পড়ে! জলের ছাটে খোলা বারান্দা ভাসিয়া যাইতেছিল, চারুর গায়ের উপরেও তীরের ফলার মত কখনও জোরে কখনও ক্ষীণভাবে জলের ঝাপ্‌টা আসিয়া পড়িতেছিল। তাহার কাপড়-জামা সন্ধ্যাকালেই ভিজিয়াছিল, সারারাত্রিতেও তাহা শুকাইতে অবসর পাইল না। ঠাণ্ডা বাতাসে তাহার হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কন্-কন্ করিয়া উঠিতেছিল। আবার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ে, লজ্জায় ও দুশ্চিন্তায় তাহার শরীরের ভিতরে যেন সেই ঠাণ্ডা রক্ত ১ শত ১০ ডিগ্রীর তাতে তাতিয়া তাহার মাথার ভিতরটাতে তোলপাড় করিতেছিল। সে যে কায আজ

করিয়াছে, তাহার পর তাহার জন্য যত বড় শাস্তিরই বন্দোবস্ত করা হউক, তাহার আর আপত্তি করিবার কোন উপায় নাই! এই কথা মনে হইতেই নৈরাশ্যে তাহার বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইতেছিল। প্রমীলাকে সে যে তার মনপ্রাণ জীবন যৌবন সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিয়া একান্ত ভাবেই ভালবাসিয়াছে।

৬

প্রাতঃকালে অনেক বেলায় দরজা খুলিয়া বাহির হইতেই বিলাসীর সদ্য-নিদ্রাভঙ্গ-অলস ও রক্তরাগযুক্ত চোখের দৃষ্টি চারুর ভয়-সঙ্কুচিত নেত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া গেল। অমনই সবেগে মুখখানাকে ঘুরাইয়া লইয়া বিলাসী তাড়াতাড়ি দরজাটা চাপিয়া বন্ধ করিয়া দিল, তাহার পর চারুর দিকে না চাহিয়া মাটীর দিকে চোখ করিয়া মেঘ-গম্ভীর স্বরে চারুকেই শুনাইয়া বলিল, "যাই একবার পদ্মর মা'র্ কাছে, ওদের বাড়ীর বাবুদের দিয়ে আমাদের বাবুকে একটা তার করিয়ে দিয়ে আসি গে, আজকের মধ্যেই ত বাছাকে কোন রকমে এখান থেকে বা'র ক'রে নিয়ে যেতে হবে। নৈলে ত আর হাড় কখানাও তাদের ফিরিয়ে দিতে পাবব্ না।"

এই ব্যাখ্যানটুকু শুনিয়াই চারু যেন লজ্জায় একেবারে মর্ম্মের ভিতর মরিয়া গেল। ছি ছি! কি ঘৃণার কথা! এই লইয়া ঝি মাগীটা তবে পাড়ায় পাড়ায় একটা ভীষণ কুৎসার সৃষ্টি না করিয়াই ছাড়িবে না! একে ত চারু নিজের কাযে নিজেই লজ্জার আঘাতে মরিয়া গিয়াছে, তাহার উপর এই সকল অপমানের আঘাত তাহাকে কি মর্ম্মান্তিক হইয়াই যে বাজিবে, সে যেন তাহা ধারণাও করিতে পারিল না।

বিলাসী তখন হাই তুলিয়া, আলস্যে গা ভাঙ্গিয়া, তাহার ফরসা কাপড়ের

আঁচলখানি ভাল করিয়া গুছাইয়া সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতেই, চারু আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। গভীর লজ্জায় তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে থাকিলেও জোর করিয়া সে লজ্জা সঙ্কোচকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া সে ঝি'র কাছেই হাতযোড় করিল, "রাগের মাথায় মহা অন্যায় কায করেছি, ঝি! এবার তোমরা আমায় মাপ কর। প্রমীলাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে কিছু খাওয়াও, তার পর না হয় আমি নিজে গিয়েই তোমাদের কাল-পরশু ওখানে রেখে আসব।"

ক্রোধে ভীষণ একটা ভ্রূকুটি করিয়া চারুর শ্বশুরবাড়ীর ঝি বলিল, "ও সব ছেঁদো কথায় নেই গো, জামাই বাবু! আমরা মুখ্য নোক বাবু, এক কথাই জানি। মিলী বলেছে, সে এখানের অন্ন-গ্রহণ করবে না। তা তাকে ত উপুসী রেখে মারতে পারি নে, বাবু! আমার কায আমার করতেই হবে। তা' দেখ, সারারাত পিঠের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক'রে ক'রে এই ভোরের বেলাটায় একটু চোখ বুজেছে, ঘুম টুকু যেন তার ভাঙ্গিয়ে দিও না। আমি কাযটা সেরে আসি।"

এই বলিয়া ঝম্-ঝম্ শব্দে কয়েকটা টাকা বাজাইতে বাজাইতে চারুর দিকে একটা ক্রুর বক্র কটাক্ষ হানিয়া বিলাসী খর-চরণে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেল। সাড়া পাইয়া চারুর মা বাসি পাট সারিতে সারিতে ডাক দিলেন, "মেয়ে! বলি ও মেয়ে! শুন্‌ছো? শুনে যাও—"

বিলাসী মুখখানা ঘুরাইয়া বাঁকা সুরে জবাব দিল, "দাঁড়াও বাছা, এখন যা করতে যাচ্ছি, তাই ক'রে আসি আগে। কি পেছন থেকে বারে বারে সব ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ ক'রে বাধা দেওয়া গা! একটু যদি আক্কেলের নাম-গন্ধও আছে এদের দেহে!"

চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া চারু যখন আসিয়া তাহার নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াছিল, তখন তাহার মনের মধ্যে কত রকমেরই নূতন নূতন

সঙ্কল্প যেন সঘনে ঘূর্ণায়মান একখানা কলের চাকার মতই এই উঠা এই নামা করিয়া অতি দ্রুত আবর্ত্তিত হইতেছিল। একবার সে ভাবিল, না কায নাই, এখনও ফিরিয়া যাই। বলিবার তাহার ত কিছুই নাই, সে বলিবে কি? নিজের হাতে পায়ের জুতা খুলিয়া যে তাহার বালিকা স্ত্রীকে প্রহার করিতে পারিয়াছে, তাহাকে আর কে বিশ্বাস করিতে পারে? প্রমীলা তাহাকে এ জন্মে আর কখন ক্ষমা করিতে পারিবে না, উহার পক্ষে তাহা কোন মতেই আর সম্ভব নয় এবং এই ক্ষমার দাবী করিবার কোন অধিকারই তাহার নাই।

প্রমীলা তখন জাগিয়া ছিল। কেমন করিয়া বলা যায় না, হঠাৎ চারুর সান্নিধ্য জানিতে পারিয়াই বোধ করি চট্ করিয়া পাশ ফিরিল এবং ঠিক দ্বারের সম্মুখেই দ্বারের দিকে পিঠ করিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া চারুকে ঠায় তাহারই দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া যেন ক্রোধে অভিমানে ফুলিয়া উঠিল। মাথার কাপড়টাও তুলিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়া সে সভয় উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, "বিলাসী! বিলাসী! শীগগির আয়।"

প্রমীলার ভাব দেখিয়া চারুর অপরাধ-সঙ্কুচিত চিত্ত যেন হীনতার মধ্যে একেবারে তলাইয়া ডুবিয়া গেল। সে নিজেকে লইয়া যে কি করিবে, কোন্‌খানে লুকাইবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অনুতপ্ত, লজ্জিত ও খেদ-জড়িত স্বরে ব্যাকুলকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "ক্ষমা চাইবার মত কায আমি করিনি প্রমীলা! তাই সে কথা আমি তোমায় বলতেও আসিনি; আমি জানি, এ জন্মে তুমি আমায় আর কখন ক্ষমা করতে পারবে না। শুধু এইটুকু আমি বলতে এসেছি, তুমি উঠে মুখ ধুয়ে কিছু খাও, নিজের পয়সা দিয়ে আনিয়ে খাও, তা'র পর যদি অনুমতি কর, আমি তোমায় তোমাদের বাড়ী রেখে আসি। পরকে দিয়ে আমায় অপমান করতে দিও না।"

চারুর কণ্ঠে যে আকুল মিনতি বাজিল, তাহার রেষ প্রমীলার অপমান-

ক্ষুব্ধ রোষ-তপ্ত অন্তরেও যেন একটুখানি স্পর্শ না করিয়া পারিল না। আর আসলে প্রমীলার মনটাও যে খুবই শক্ত ছিল, তাহাও নহে। বিলাসীর কুপরামর্শ ও প্রশ্রয় না পাইলে সে হয় ত এমন উদ্ধতাচরণ করিত না; এতদিনে হয় ত ইহাদের অনেকটাই বশ হইয়া যাইত। এখন বিলাসীর অজ্ঞাতে স্বামীর এই দীন মূর্ত্তি ও আকুলতাভরা অনুতপ্ত কণ্ঠস্বর তাহার মনকে একটুখানি বিচলিত করিলেও সে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে টলিল না। কাল অৰ্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত বিলাসী তাহাকে বুঝাইয়াছে যে, সে যদি এখন শক্ত থাকিতে পারে, তবেই এই কারাগৃহ হইতে তাহাদের দুইজনের উদ্ধার সম্ভব হইবে। আর তাহার পর—এই সমস্ত শুনিলে নিশ্চয়ই তাহার বাবু আর কখনও তাহাকে এ-মুখো হইতে দিবেন না। প্রমীলার আবার ভাবনা কি? নাই বা সে এমন হতভাগা শ্বশুরবাড়ী ঘর করিল! বাপের রাজত্বে পায়ের উপর পা দিয়া সে অনায়াসে রাজকন্যার মত জীবন কাটাইয়া দিবে। বড়লোকের মেয়েরা না কি কখন গরীবের ঘর করিয়া থাকে! আগে মনে হইত, জামাইবাবু বুঝি লোক ভাল! ও মা, তা নয়, ভিতরে ভিতরে সব এককাট্টা! ঐ যে কথায় বলে "মোষের শিং বাঁকা, যোঝ্‌বার বেলায় একা" এও তাই! মা'র দিক্ হয়ে কি না অবলা মেয়েমান্‌ষের গায়ে হাত তোলা! তাও আবার পায়ের জুতো! ওর লক্ষ্মী ছেড়ে গেছে. ওর আয়ুতে ঘুণ ধরেছে, ওকে সর্ব্বনাশে গ্রাস করেছে; খবরদার, প্রমীলা যেন উহার কথায় না ভিজে! বিলাসীরা ছোটলোক বটে, কিন্তু তাহার স্বামী কখন তাহার গায়ে হাত তোলা ছেড়ে উঁচু 'রা'টিও করে নাই। করিলে সে দেখিয়া লইত কত বড় স্বামী সে!

কাযেই প্রমীলা চারুর মিনতিতে কর্ণ রুদ্ধ করিয়া যেমন তেমনই ক্রুদ্ধ, উদ্ধত ও বিদ্রোহিভাবে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। তাহার রোষপ্রদীপ্ত

কঠোর দৃষ্টি বারেকমাত্র চারুর অশ্রু-আবিল কাতর নেত্রকে ঝলসিত করিয়া গেল।

প্রমীলার পায়ের তলায় বসিয়া হাতযোড় করিয়া চারু বলিল, "এইটুকু ভিক্ষা চাইছি, মিলি! শুধু এইটুকু! অনাহারে এমন ক'রে চ'লে যেও না। আর দয়া ক'রে আমায় পৌঁছে দেবার আদেশটুকু দাও। যা' আমি করেছি, আমার আর জোর ক'রে বলবার কিছু নেই; এখন যদি তুমি শুধু একটু দয়া কর, তবেই—"

প্রমীলা ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গীর মত গর্জ্জিয়া উঠিল, "মেয়েমানুষকে যে জুতো মারতে পারে, সে চামার! আমি চামারের বাড়ী খাই না, তুমি যাও।— আমি তোমার সঙ্গে যাব না; কক্ষন যাব না।"

"মা গো! জামাইবাবু! তোমার শরীলে এতটুকু হায়া, লজ্জাও নেই বাপু! আবার তুমি কোন্ মুখ নেড়ে ওকে কথার ঘা দিতে এলে শুনি? যাও গো, আর বেশীক্ষণ লয়। সন্ধ্যে নাগাদ—সেখান থেকে লোক-জন সব এসে পড়বেই। তারা আমাদের এমন লয় যে, মেয়ে না খেয়ে প'ড়ে আছে জানলে এতটুকু দেরি করবে। এখন তুমি চ'লে যাও দেখি বাপু! আমি একটু ওকে ঠাণ্ডা করি।"

চারু উঠিয়া বেত্রাহত কুক্কুরের মত নীরবে প্রস্থান করিল। অসহ্য অপমানে তাহার মাথার ভিতরে যেন আগুনের জ্বালা ধরিয়াছিল; তথাপি কৃত কার্য্যের অপরিবর্ত্তনীয় ফলকেও সে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে কুণ্ঠিত হইল না।

৭

বাস্তবিক বিলাসীর কথাই ফলিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দুই জন বন্দুকধারী দ্বারবান্ লইয়া প্রমীলার বড় ভাই ধীরেন্দ্রনাথ প্রমীলাকে লইয়া যাইতে আসিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে চারুকে সম্বোধন করিলেন, "ব্যাপার কি চারু! তোমাদের পাড়ার লোক বাবার কাছে তার দিয়েছে যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে অত্যন্ত মার-ধর করেছ! আমার ত এ কথাটা একটুও বিশ্বাস হয় নি! কোন রকম ভুলটুল একটা কিছু হয়েছে যেন মনে হচ্ছে, না? আর কারুকে তার করতে গিয়ে কি এই কাণ্ডটা ক'রে বসেছে না কি ওরা?"

ধীরেন্দ্রনাথ চারুর কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ, স্বভাবটি বেশ সুভদ্র, চারুর প্রতি তিনি যথেষ্ট স্নেহসম্পন্ন এবং তাহার চরিত্রের প্রতি পূর্ণরূপেই শ্রদ্ধাশীল।

তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া চারুর হেঁট মাথা যেন অধিকতর নত হইয়া আসিল। সে তাঁহার সনির্ব্বন্ধ জিজ্ঞাসার ভালমন্দ কোন উত্তরই না দিতে পারিয়া চুপ করিয়া নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। "এসো, বসো" বলিয়া একটা ভদ্রতার কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

ইহা দেখিয়া ধীরেন্দ্রনাথের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল,—"তা হ'লে এ সবই সত্যি? বিশ্বাস করতে ইচ্ছা যায় না, তবু তুমি নিজেই যখন স্বীকার ক'রে নিচ্ছ, তখন আর আমার তো বল্‌বার কিছুই বাকি নেই! কিন্তু এখনও আমার মনে হচ্ছে, এ যেন কার সাজানো মিথ্যা অপবাদ। চারু! তুমি এমন হীন কাজ করতে পার, এ যে আমি নিজের চোখে দেখলেও বিশ্বাস করতে পারতাম না।"

জ্যেষ্ঠ শ্যালকের এই নির্ভরতাপূর্ণ পরিপূর্ণ বিশ্বাসের অভিব্যক্তিতে চারুর মনের ভিতরে যে কি হইতেছিল, তাহা বলিবার নহে। তাহার অন্তরের ভাব ভাষার অতীত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই সে নিজের স্বপক্ষ-সমর্থনের এতটুকু চেষ্টা পর্য্যন্ত করে নাই। এখনও সে এই স্নেহ-তিরস্কারের এই অর্দ্ধ-সংশয়িত কৈফিয়ৎ তলবের কোন জবাবই দিল না বা দিতে পারিল না।

তখন ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিয়া চারুর এই আত্মসমর্থন-বিমুখতায় মনে মনে ঈষৎ রুষ্ট হইতে থাকিয়া হঠাৎ পরুষকণ্ঠে ধীরেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, "তা হ'লে আর কোন উপায় দেখি না। প্রমীলাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি,—তাকে নিয়েই যাই। মার খেয়ে ত আর সে তোমার এখানে প'ড়ে থাক্‌তে পারে না।"

প্রমীলা সগর্ব্বে এবং সানন্দে শ্বশুরঘর করা সাঙ্গ করিয়া ভাইয়ের সহিত বাপের বাড়ী যাত্রা করিল। তাহার মনে হইল, চারু তাহাকে জুতা মারিয়া ভালই করিয়াছিল ; না হইলে ত আরও একটা মাস তাহাকে এখানে থাকিতে হইত।

বিলাসী বাজার হইতে খাবার আনিয়া প্রমীলাকে খাওয়াইয়াছিল, নিজেও বাদ যায় নাই। চারুর মা বিস্তর সাধ্যসাধনা করিয়াও উহাদের ভাত খাওয়াইতে পারেন নাই। ব্যাপারের গুরুত্ব দেখিয়া তাঁহার নিজের রাগ অনেকক্ষণ আগেই পড়িয়া গিয়াছিল ; এবং নিজেকেও এই দুর্ঘটনার অনেকখানি মূল জানিয়া ছেলের শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মন আত্মগ্লানিতে পরিতপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই মনের মধ্যে ঠিক সায় না দিলেও বধূকে ও বধূর দাসীকে তিনি সারাদিন বিস্তর তোষামোদ করিয়াছেন ; কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। বউমা ত কথাও কহেন নাই, মুখ ফিরাইয়া থাকিয়াছেন। আর ঝি যাহা বলিয়াছে, সে সব খুবই

শ্রুতিসুখকর নহে। যাত্রাকালেও আর একচোট হাতে ধরাধরি হইল; কিন্তু দুইজনেরই ধনুর্ভঙ্গ পণ ভাঙ্গিল না।

চারুর মা ধীরেনকে ডাকাইয়া নিজেই কথা কহিলেন; কাঁদিতে কাঁদিতে সব কথাই তিনি প্রকাশ করিয়া কহিলেন। নিজের হাতের দংশন-ক্ষত দেখাইয়া বলিলেন, "চারুর কোন দোষ নেই বাবা! সে তা'র মা'কে ছাড়াবার জন্যেই হঠাৎ ওই কাযটা ক'রে ফেলেছিল। তা' এ নিয়ে কি এতখানি করে কেউ? তোমাদের ঐ বজ্জাত ঝি মাগীটে না থাক্‌লে বউমা এমন ধারা কর্‌তে পারতেনও না। ঐ মাগীই যত্‌ নষ্টের গোড়া!"

বিলাসী বোধ করি আড়ালেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে এই কথা শুনিতে পাইয়াই একেবারে রণরঙ্গিনীর মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া পড়িল। "বজ্জাত বেটী ত বটেই গো! মায়ে পোয়ে মেয়েটাকে জবাই করতে পার নি কি না এই বজ্জাত বেটীর জন্যে, তাই এতটা গায়ের ঝাল হয়েছে! বুঝলে গা দাদা-বাবু! তোমাদের কাছে পাওনা-থোওনা পাওয়া হয়ে গেছে। এখন জামাই বাবুর আর একটা বিয়ে দিয়ে আরও কিছু হাত করবার জন্যে এই রকম ক'রে মেয়েটাকে শাস্তি দিচ্ছে। হয় না হয় নিজেরাই বলুক ত! যখন তখন ছেলেকে শলাচ্ছে; বলছে কি না যে, আর একটা বিয়ে কর্‌, এবার নিজে দেখে বউ আনবো! বলুক না সত্যিবাদী কায়েতের মেয়ে।"

চারুর মা এই সমস্ত কথায় একেবারে আগুনের তেজে জ্বলিয়া উঠিয়া দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া উঠিলেন;—"বলেছিই ত; এমন ক'রে বউ নিয়ে জ্ব'লে মরলে কোন্‌ শাশুড়ীতে আবার এ কথা না বলে রে হারামজাদী! ছোটলোকের বেটীর যত বড় মুখ, তত বড় চোপা!"

"হুঁ, হারামজাদী ছোটনোক সব তোলা রইলো গো; কিচ্ছুটি এর থেকে বাদ পড়বে না, তা দেখে নিও তখন! হ্যাঁগা! বড়দাদাবাবু! বলি হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে খামোকা কতকগুলা গাল খাওয়াবে,

না আমাদের একটা গতি করবে? বাবুকে মা'কে গিয়ে বল্‌ব যে, খুব কুটুমবাড়ী পাঠিয়েছিলে বাছা। যা হ'ক, এখন ধম্মে ধম্মে হাড় ক'খানা টেনে নিয়ে গিয়ে একবার পড়তে পা্‌রলে বোঝা যায়!"

যাত্রাকালে ধীরেন্দ্রনাথ চারুর সহিত কথা কহিলেন না; চারুও তাঁহাদের সম্মুখীন হইবার সাহস করিল না; একটা জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়া শুধু অনিমেষ নেত্রে প্রমীলার উৎসাহোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারা চোখের অদৃশ্য হইয়া গেলে, একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস তাহার বুক ঠেলিয়া উঠিল; তাহার চোখ দিয়া দুইটি ফোঁটা অশ্রু নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িল।

৮

প্রমীলার পিতা সারদাচরণ বাবু স্বভাবতঃ অত্যন্ত কোপন-প্রকৃতির লোক। তাহার উপর নিজের মর্য্যাদাটাকে তিনি বোধ করি ভারতের একচ্ছত্র সম্রাটের মর্য্যাদার অপেক্ষাও বড় কম মনে করিতেন না। তাঁহার বংশ, তাঁহার ধন, তাঁহার মান সকলেই যেন এ সকলের সম্মান করিতে একান্ত বাধ্য। যাহার দ্বারা ইহার কোনখানে একটুখানিও আঘাত পড়ে, তাহার ভাগ্য একেবারেই অপ্রসন্ন বলিতে হইবে। ছেলেমেয়েদের তিনি আদর-যত্ন যথেষ্টই করিতেন; কিন্তু তাহাদেরও এমন স্বাধীনতা ছিল না যে, তাহারা তাঁহার অনভিপ্রেতভাবে হস্তপদ সঞ্চালনও করিতে পারে। সামান্য ত্রুটিতে ছেলেদের বেত্রাঘাত, উপবাস এ সকলই ভোগ করিতে হইয়াছে। তবে মেয়ে বলিয়া এবং একমাত্র মেয়ে বলিয়া প্রমীলার আদর সকলের চাইতেই বেশী ছিল। অধিকন্তু মা'র কাছে তাহার প্রশ্রয়ের সীমা ছিল না।

সেই মেয়ে আসিয়া যখন কাঁদিয়া পড়িয়া জুতা মারার কাহিনী শুনাইল, তখন সারদাচরণের মূর্ত্তি যে কি ভীষণ ভাবই ধারণ করিল, তাহা অভিজ্ঞ ভিন্ন কেহই বুঝিতে পারিবে না। প্রমীলার অপেক্ষা বিলাসীই সেই ক্রোধের আগুনে ইন্ধন জোগাইল বেশী। বিনাইয়া বিনাইয়া এক গুণেব যায়গায় সাত গুণ রং চড়াইয়া সে যে কাহিনীটি শুনাইল, তাহার মধ্যে বেশ একটি ইচ্ছাকৃত ষড়্‌যন্ত্রের সূচনা পাইতে বিলম্ব ঘটে না। চারুর অর্থ-পিশাচী পাড়াগেঁয়ে মা চারুর আর একটা বিবাহ দিয়া আরও কিঞ্চিৎ অর্থলাভের আশাতেই যে এই ষড়্‌যন্ত্রটি তৈয়ারী করিয়াছে, এবং প্রমীলা যাহাতে চারুর চক্ষুঃশূল হয়, তাহারই জন্য আগাগোড়াই বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়া অবশেষে সিদ্ধমনোরথ হইয়াছে, তাহা 'নিঃসন্দিগ্ধরূপেই প্রমাণ হইয়া গেল। মা'র কাণভাঙ্গানীতে ভুলিয়া চারুও প্রমীলার প্রতি অযথা অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে; শেষকালে ভীষণ ঝড়বৃষ্টির দিনে বিলাসীর অনুপস্থিতিকালে তাহাকে ছাতে তুলিয়া দুই জনে মিলিয়া মারধর করে; মারিয়া ফেলাই উদ্দেশ্য ছিল, তাহাতে সংশয় নাই। শেষকালে কাপড়ে একটু কেরোসিন ঢালিয়া দিয়া আগুন ধরাইলেই ল্যাঠা চুকিয়া যাইত। বউ নিজে পুড়িয়া মরিয়াছে!

সজল-জলদতুল্য মুখে সারদাচরণ প্রমীলাকে প্রশ্ন করিলেন, "বেশ ক'রে ভেবে দেখ প্রেম! তোমার স্বামীর কাছে আর কখনও যাবার ইচ্ছে হবে কি না? ঐ স্বামীর ঘর আর কখন করতে চাইবে কি না? তা' যদি কর, তা হ'লে এ সব সহ্য ক'রে থাক গে। আর যদি সেই নিষ্ঠুর অত্যাচারীর শাস্তি দিতে চাও, তা' হ'লে এ জন্মের মত তার আশা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে থাক।"

প্রমীলা বাপের প্রশ্নে এতটুকুও দমিল না, সাহঙ্কারে মুখ তুলিয়া সগর্ব্বে কহিয়া উঠিল—"তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। এ জন্মে আর

কখন আমি তাদের ছায়াও মাড়াবো না। যে কষ্ট আমায় দিয়েছে আমায় বলে কি না, ছোটলোকের মেয়ে! নবাবের বেটী!—”

“হুঁ” বলিয়া দংশিতাধরে সারদাচরণ উঠিয়া গেলেন। তাহার পর এক দিন আদালতের শমন পাইয়া চারু জানিল, তাহার স্ত্রী তাহার নামে নালিশ করিয়াছে। আর একটা বিবাহের ইচ্ছায় প্রমীলাকে তাড়াইবার চেষ্টায় (অথবা তাহাকে একেবারে মারিয়া ফেলারও দুরভিসন্ধি ছিল কি না, তাহাও নিশ্চিত বলা যায় না) চারুরা মাতাপুত্রে তাহার উপর প্রবল শারীরিক অত্যাচার করিয়াছে; অতএব যাহাতে প্রমীলাকে আর কখনও শ্বশুরালয়ে লইয়া যাইবার চেষ্টা না করা হয়, তাহারই জন্য আদালত হইতে লেখাপড়া হইয়া যাওয়া সঙ্গত।

চারু তাহার উপর অর্পিত অপরাধ স্বীকার করিয়া লইয়া স্ত্রীর ঈপ্সিত দলীল লিখিয়া দিল। তাহার পর স্ত্রীনির্য্যাতনের জন্য অর্থদণ্ড প্রদান করিয়া সে তাহাব বিবাহিত জীবনেব সকল দণ্ড-পুরস্কার হইতে মুক্ত হইয়া বাড়ী ফিরিল।

পাড়ার লোক চারুকে ছি ছি করিতে লাগিল। মা কাঁদিয়া ভাসাইলেন। চারু কাহারও কথার কোন প্রতিবাদ করিল না। তবে সামান্য দিন না যাইতে যাইতেই যখন তাহার মা এবং পাড়ার লোক মিলিয়া ঘটক-ঘটকীর সঙ্গে পরামর্শ আরম্ভ করিয়াছেন দেখা গেল, তখনই সে অত্যন্ত দৃঢ় কঠিন কণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিয়া বসিল। মা’র অনুনয়, আদেশ ও অশ্রুর বিনিময়ে সে শুধু এই কথাটি বলিল:—“একবারেই যথেষ্ট হয়েছে, মা! এ জন্মে ত নয়ই, যদি জন্মান্তর থাকে আর মানুষ হয়ে জন্মাতে পারি, তা হ’লে আশীর্ব্বাদ কর, যেন বিয়ে করবার প্রবৃত্তি আমার তখনও না হয়।”

চারুর মা বছরখানেক ধরিয়া বৃথাই অশ্রুপাত ও অনুতাপ করিয়া

সামান্য কয় দিনের অসুখে তাঁহার অতৃপ্ত সংসার-সুখাকাঙ্ক্ষাকে অপরিতৃপ্ত রাখিয়াই ছেলের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। তখন চারু সবেমাত্র এম-বি পাশ করিয়া কলেজ হইতে বাহির হইয়াছে।

৯

প্রমীলার মনের মধ্যে কি যে বিপুল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া উঠিতেছিল, সে নিজেও যেন তাহার আশ্চর্য্য আবির্ভাবে অবাক্ হইয়া যাইত; কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টাতেও সে ইহার অপরাজেয় শক্তির হস্ত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিত না। শ্বশুরবাড়ীর জন্য—স্বামীর জন্য তাহার মন থাকিয়া থাকিয়া চঞ্চল ও অধীর হইয়া উঠিত; একখানা চিঠি লিখিয়া সে চাঞ্চল্য নিবারণ করিবারও উপায় নাই। এই অপ্রতিবিধেয় অবস্থায় সে যেন ক্রমশঃই কেমন এক প্রকার অভিভূতপ্রায় হইয়া পড়িতে লাগিল। শাশুড়ীকে কোন দিনই সে ভাল চোখে দেখে নাই। পাড়াগেঁয়ে মাগী, না তাঁহার কথার কোন শ্রী আছে, সর্ব্বদা ছল-ছুতা ধরিয়া ফড়-ফড় করিয়া কতকগুলা বকুনি, কথায় কথায় তাহার নামে ছেলের কাছে লাগানো, এতটুকু ত্রুটি হইলেই বাপ-মা তুলিয়াও কথা বলা, এ সব প্রমীলার একান্ত অসহ্য বোধ হইত। তাহার উপর বিলাসীর জন্য তাহার মন শাশুড়ীর উপর আরও বেশী তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু চারুর ব্যবহার তাহার কোন দিনই খুব মন্দ লাগে নাই। তাহার সস্নেহ বাক্য, সাদর ব্যবহার, সংযত আচরণ প্রমীলার মনের মধ্যে তাহাকে একটা বিশেষ স্থান দান না করিয়া পারে নাই। সেটা হঠাৎ সে দিনের সেই আকস্মিক কাণ্ডটায় সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়িয়া গেলেও, ক্রমশঃ আবার দিনে দিনে যতই দিন গত হইতেছিল, সে দিনের সেই প্রচণ্ড ক্রোধের শিখা যতই মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল;

সেই নিস্তেজ ক্রোধাভিমানের অন্তরাল হইতে একটা দারুণ অস্বস্তিকর লজ্জার জ্বালা উত্থিত হইয়া ততই যেন তাহার বুকের মধ্যটাতে আশ্রয় লইতেছিল। যে ক্রোধের উত্তেজনা তাহার মনটাকে তীব্রভাবে চাপিয়া রাখিয়াছিল, তাহার কবল হইতে অব্যাহতি পাইবামাত্র তাহার মন যেন ভিতরে ভিতরে একটা স্বাচ্ছন্দ্য এবং তাহার সহিত মিশ্রিত একটা ব্যথাও বোধ করিল।

প্রমীলার প্রথম প্রথম নিজেকে একান্তই নিগৃহীতা বলিয়া মনে হইত ; এবং স্বামীর এই হীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে তাহার সমস্ত শক্তিকে উদ্যত করিয়া তুলিয়া, ইহার নির্ম্মম কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধা করে নাই। আরও সর্ব্বপ্রকার তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করিয়াও যে কোন-রূপেই হউক তাহাকে খর্ব্ব করিতে সে সমুৎসাহিতই ছিল। তাহার কত সময় মনে হইয়াছে, চারুর দণ্ড তাহার পাপের যোগ্যতানুসারে কিছুই হয় নাই ; ইহার অপেক্ষা ঢের বেশী প্রায়শ্চিত্ত তাহার হওয়া উচিত ছিল। জেল খাটিলে, দ্বীপান্তর হইলে, আরও কিছু বেশী হইলেও তাহার কৃত কর্ম্মের যোগ্য ফল হয়। মেয়েমানুষকে জুতা মারিবার পরেও সে যে অক্ষত হইয়া যেমন তেমনই রহিয়া গেল, ইহার ব্যর্থতার বিষ তাহার মনকে যেন বেড়া আগুন দিয়া পুড়াইয়া মারিতে লাগিল। সে তাহার কোন ক্ষতিই ত করিতে পারিল না! মাত্র একটু লোকলজ্জা, মাত্র ঐ অতটুকু! নাঃ, আরও অনেক বেশীই হওয়া উচিত ছিল যে!

এই রকম মনের ভাব লইয়া প্রমীলা আপনার পৌরুষের অভাবে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেও, অনেকখানি সার্থকতার গৌরবে উৎফুল্ল ও নিশ্চিন্ত চিত্তে বাড়ীর ও পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নাটাই-ঘুড়ি, ক্রিকেট, ব্যাডমিণ্টন ইত্যাদি খেলিয়া প্রাণ ভরিয়া হৈ-হৈ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পর এমনই করিয়া বছরখানেক কাটিয়া গেলে, হঠাৎ এক দিন তাহার মনের

মধ্যে একটা যেন বড় উতলা হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়া দিয়া তাহার সব যেন এলোমেলা বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল। তাহার মুখের হাসি, বুকের অহঙ্কার সহসাই যেন সে দিন হইতে ক্ষীণকলা চন্দ্রের মত নিত্য নিত্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ ঝিকে সে আর মোটেই সহিতে পারিত না। ছুতা নাতায় যখন তখন তাহাকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত করিয়া একটা উৎকট আনন্দ সে লাভ করে। রাগ করিয়া বিলাসী আর তার ত্রিসীমানার মধ্যে পা দেয় না। সে লোকের কাছে বলে, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর ; আমি মরি পিস্থ, পিস্থ করে। পিস্থ আমায় দেখলে তেড়ে মারতে আসে। কলিকাল কি না!

প্রমীলার খুড়তুতো বোনের বিবাহ হইয়াছিল। সেই মেয়েটি প্রমীলারই প্রায় সমবয়সী। দীর্ঘকাল শ্বশুরবাড়ী ঘর করিয়া কমলিনী বাপের বাড়ী আসিয়াছে। প্রমীলা খবর পাইয়াই দেখা করিতে গেল ; এবং দেখিয়া অবাক্ হইল যে, কমল আর সে কমল নাই! সে মাথায় কাপড় দিয়া রহিয়াছে ; কথা কয় আস্তে আস্তে। ভাইবোন্‌দের জলখাবার দেওয়া, ভাত খাওয়ানো, বোনেদের চুল বাঁধা, মা'র পাকা চুল দেখা, বাপের পা টিপা— কত কাযেই সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া বেড়ায়! প্রমীলা তাহাকে "চোর চোর" খেলিতে ডাকিলে, ঈষৎ সলজ্জ হাস্যের সহিত সে নিজের অক্ষমতা জানাইল ; হাসিমুখে বলিল—"না ভাই, এখন কি ও-সব খেলতে আছে? তা ছাড়া ও-সব আমি ভুলেও গেছি।" নির্জ্জন ঘরে ডাকিয়া আনিয়া কমল বরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রমীলা এই প্রথমবারের জন্য—নিজের জন্য যেন একটা লজ্জা বোধ করিল। বরের কথা তাহার ত সব শেষই হইয়া গিয়াছে। সে কথা বলার আর আছে কি? সে চুপ করিয়া রহিল। কমলিনী বলিতে লাগিল—"তুই কি আর সেই পর্য্যন্ত শ্বশুরবাড়ী যাস্‌নি না কি? চারু বাবু আসেন ত? সে কি ভাই! তোরা দু'জনে

দু'জনকে ছেড়ে কেমন ক'রে আছিস্ বল ত? আমরা হ'লে কিন্তু পার্‌তুম না। এই দু'দিন হলো এসেছি, মনে হচ্ছে যেন কত দিনই হয়ে গেছে। একটু সামান্য ঝগড়া নিয়ে কি ক'রে এমন ক'রে আছিস্ ভাই?"

প্রমীলা নিজের পক্ষে বড় দৌর্ব্বল্য অনুভব করিয়াও সাহঙ্কারে জবাব দিল,—"একটু সামান্য! জুতো মারাটা সামান্য হ'ল?"

কমল মুখটা বিকৃত করিয়া তাচ্ছীল্যের সহিত উত্তর দিল, "সামান্য না ত কি? এই সে দিন অনেক রাত হয়ে গেছলো শুতে যেতে, যেমন ঘরে ঢুকেছি, অমনই তোর ভগ্নীপতি ফোঁস ক'রে উঠ্‌লেন, 'যাও, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও—আসতে হবে না ঘরে। সারা রাত কে ব'সে ব'সে তোমার পথ চেয়ে থাকে?' খুব রেগে গেলুম, কাঁদলুম, কথা কইলুম না অনেকক্ষণ। আবার খোসামোদ, পায়ে ধরতে যাওয়া, সব মিটমাট হয়ে গেল। এ রকম কার না হয়, ভাই? তুই যেমন মানোয়ারী গোরা। এতটাই কি করতে আছে?"

প্রমীলার মনের উপর একটা বিষাদের গাম্ভীর্য্য যেন ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। তথাপি সে জোর করিয়াই নিজের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। রোষগম্ভীর মুখে সে জবাব দিল, "তাতে আর এতে ঢের তফাৎ আছে। তোমায় ত আর জুতো মারে নি!" তাহার পর ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ ভাই, তোর শাশুড়ী আছে? সে তোকে জ্বালা দেয়?"

কমলিনী মুখখানা ঘুরাইয়া হাসিয়া কহিল,—"হ্যাঁ, আমার আবার শাশুড়ী কোথায়? সৎ-শাশুড়ী ত! তা ভাই, জ্বালা যে দেয় না, ঠিক তা বল্‌তে পারি নে। তবে আমি তাতে ঠিক জ্বালা বোধ করি নে। রাগ-ঝাল সবারই আছে, কখনও কখনও তা' আমার ঘাড়ে ঝেড়েও ফেলে। ফেল্লেই বা? গায়ে ত আর আমার তাতে ফোস্কা পড়ে না। তবে ইদানী

তাঁকে আমি খুব বশ ক'রে ফেলেছি। কোন কায বড় একটা করতে দিই না, হাতে হাতে সব জোগাই। তাই খুব সুখ্যাত করেন, বলেন,—'মেজ বৌমা আমার মানুষের ঘরের মেয়ে বটে!' শাশুড়ী বশ করা, ভাই, অনেকটা নিজের হাত। খুব গতর বার করলে, আর চোপা না করলেই ত বেশীর ভাগ শাশুড়ী বশে থাকে। তবে নেহাৎ দজ্জাল যারা, তাদেব কথা ছেড়ে দাও!"

প্রমীলার বুকে এই মন্তব্যগুলা একটা দাগ কাটিল। এই সর্ব্বপ্রথম তাহার মনে হইল, তাহার শাশুড়ীকে সে যত মন্দ করিয়া তুলিয়াছিল, হয় ত তিনি ততটা নহেন। সে-ও ত কৈ কোন দিনই তাঁহার সহিত একটুখানিও ভাল ব্যবহার করে নাই। বরং অশেষবিশেষে তুচ্ছ-তাচ্ছীল্যই করিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ বিলাসীর শিক্ষাতেও সে তাঁহার সঙ্গে বড়ই কুব্যবহার করিয়াছে। বিলাসীর উপর তাহার মনটা যেন বিষাইয়া উঠিল। সে-ই যেন যত নষ্টের গোড়া।

সে রাত্রিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রমীলা জাগিয়া পড়িয়া রহিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে; প্রকৃতি দেবী যেন জগতের উপর একটা স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যের ঘন আবরণ বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রমীলা নিঃশব্দে পড়িয়া পড়িয়া ভূত-ব্যাপারগুলিকে লইয়া বিশেষ বিশ্লেষণ করিতে লাগিল। তাহার চোখে ঘুম দেখা দিল না। চিন্তার পর চিন্তার স্রোতঃ আসিয়া তাহাব বুকের ভিতরটাকে যেন ত্রস্তব্যস্ত করিয়া তুলিল।

চারুর সেদিনকার সেই দীনমূর্ত্তিখানা এই এক বৎসরকাল ধরিয়া অনেকবারই প্রমীলার মনের চোখে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিতে গিয়াছে; কিন্তু কোন দিনই সে সেখানার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে নাই; ভ্রূকুটি করিয়া অবজ্ঞার সহিত মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। সে মনে মনে রাগ করিয়া বলিয়াছে, "জুতোম্মরা ছোটলোকের কথা আমি মনেও আস্‌তে দিই নে।"

কিন্তু আজ সে কথাটা সে মনে করিতে যেন ভুলিয়া গেল। শুইয়া শুইয়া সেই ঘন অন্ধকারের রাশির মধ্য দিয়াও সে যেন সুস্পষ্টভাবে সেই বিষাদের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ম্লান মুখ ও বেদনার অশ্রু-ভারাতুর গভীর দৃষ্টি চোখের উপরেই দেখিতে পাইল। কি সুগভীর নৈরাশ্যের সেই সজল গম্ভীর স্বর! উঃ, কি বেদনা, কি নৈরাশ্যই না তাহার মধ্যে স্পন্দিত হইতেছিল! আজ তাহার সেদিনকার মনের অবস্থা যেন সহসাই নিজের মনে মনে অনুভব করিয়া, তাহার অন্তরেব সেই পাষাণভার নিজের বুকে উপলব্ধি করিয়া, অকস্মাৎ প্রমীলার নিজের বুকটাও যেন তেমনই একটা নিদারুণ নৈরাশ্য-জড়িত ব্যথায় ভরিয়া আসিল; তাহার চোখ দুইটা জ্বালা করিয়া অকস্মাৎ কোথা হইতে হুহু কবিয়া জলের স্রোতঃ বহিয়া আসিল; সে নীরবে একা পড়িয়া পড়িয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল।

সেই দিন হইতে প্রমীলার জীবনের গতি ফিরিল। আর তাহার খেলার দাপাদাপি নাই। তাহার ছুটাছুটি, হা হা হি হি কলহাস্য সবই যেন কাহার মন্ত্রবলে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। তাহার মুখে আর হাসিটুকুও বড় একটা দেখা যায় না। তাহার মনে হয়, তাহার চারিদিকটা যেন অন্ধকার। সমগ্র সংসারটাতেই যেন কেমন একটা আলোর অভাব ঘটিয়াছে। সবই ত আছে, তবু মনে হয়, তাহার যেন কোথাও কিছু নাই। এই বাড়ী, এই ঘর, এই যে সুখ-ঐশ্বর্য্য, এত দিন পরে সহসাই তাহার মনে হইল, এ সবকে সে যে এত আপন মনে করিয়া গর্ব্বে সারা হইয়া আছে, তা' এ সকলে তাহার কিসের অধিকার? এ সব ত তাহার দাদাদের; বৌদিরাই ত এ সমস্ত ভোগ করিবে; তাহার নিজের বলিতে এ জগতে কোথায় কি আছে? তাহার প্রাণের মধ্যে যেন হু হু করিয়া একটা ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস ভাসিয়া উঠিতে থাকে, বুকের মধ্য হইতে একটা বুভুক্ষু পীড়িত তৃষিত চিত্ত সকাতরে কাঁদিয়া বলে—"হায় রে! সর্ব্বহারা!

এই নিঃসম্বলে তুই পথ চলিবি ভাবিয়াছিলি!" প্রমীলার মনের মধ্যে দিনের পর দিন সেই অন্ধকারটা যেন ব্যাপ্ত ও নিবিড় হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহা যেন তাহার অস্তিত্বকে পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দিবার উপক্রম করিতে লাগিল।

১০

প্রমীলার দাদা ধীরেন্দ্রনাথের প্রথম সন্তানের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বাড়ীতে খুব ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। যেখানে যত আত্মীয়-কুটুম্ব আছে, সকলেরই নিমন্ত্রণ হইয়াছে। এক দিন যাত্রা, এক দিন থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখানর ব্যবস্থাও হইয়াছে; বাড়ীর ও পাড়ার লোক এই লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল। এই উৎসবের বাড়ীতে প্রমীলার শুধু মনের মধ্যে একটুখানিও সুখ নাই। সে মনে মনে একটা আশা করিতেছিল যে, এই উপলক্ষে হয় ত এইবার চারুকে ইঁহারা নিমন্ত্রণ করিবেন, এবং নিমন্ত্রণ পাইলে হয় ত বা সে একবারটি আসিবে। কিন্তু সে আশার স্বপ্ন তাহার ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। নিমন্ত্রণের ফর্দ্দ ধীরেন বাপকে পড়িয়া শুনাইতেছিল। তাহার ভিতর একটা শব্দ কাণে ঢুকিতেই প্রমীলার পিতা সারদা বাবু ও প্রমীলা উভয়েই উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন—"চারুচন্দ্র বসু, হাউস সার্জ্জন, মেডিক্যাল কলেজ।"

সারদা বাবু বলিলেন, "এ লোকটা কে হে? নাম ত কখন শুনি নি!"

প্রমীলার বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া কে যেন সজোরে একটা দরজা বন্ধ করিয়া দিল, সে আর্ত্ত বিমূঢ়ভাবে দাদার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিল।

ধীরেন্দ্রনাথ মাথাটা একটু চুলকাইয়া ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত উত্তর

করিলেন, "আজ্ঞে, ও আমাদের চারু। সে এখন পাশ ক'রে ঐ চাকরীটা পেয়েছে।"

সারদা বাবু ক্রোধগম্ভীর মুখে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিবার পর স্থিরগম্ভীর স্বরে মন্তব্য করিলেন, "তা' ও নাম আমার বাড়ীর নেমন্তন্নের ফর্দ্দে কেন? চামড়াছেঁড়া কসাই কি কখন কায়েতবাড়ীতে পাংক্তেয় হয়? নাম কেটে দাও।"

ধীরেন কিছু বলিতে ইচ্ছুক হইয়াও ভরসা করিল না; শুধু নীরবে আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। তাহার সেই কালী-কলমের খোঁচাটা কিন্তু প্রমীলার বুকের উপর দিয়া বেদনা-ভরা বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ রেখার মতই করকর করিয়া টান দিয়া গেল। তাহার বোধ হইল, তাহার ভাইপোর অন্নপ্রাশনে তাহাকেই যেন অপাংক্তেয় করা হইল; তাহারই যেন নিমন্ত্রণ রদ হইল। তাহার মনের মধ্যে একটা অব্যক্ত ক্রোধের শিখা যেন অস্পষ্টভাবে ধূমায়িত হইয়া উঠিতে লাগিল। তীব্র বেদনার সহিত মিশ্রিত কোপে সে মনে মনে বলিল—"বাবার এ আবার বেশী বাড়াবাড়ি কাণ্ড!"

কোন রকমে পলাইয়া গিয়া নিজের ঘরে প্রমীলা এলোমেলো বিছানা-গুলার উপর শুইয়া পড়িয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। বাপ ত ঐ; মা-ত জামাইএর নাম করেন না। দাদার যদিই বা একটু দয়া হইয়াছিল, তাহাও শেষ হইয়া গেল। কেন, এতই বা কেন? সে দোষ ইঁহারাই বা কি কমটা করিয়াছেন? নালিশ-ফরিয়াদ যাহা করিবার, তাহার ত কিছুই বাকী রাখা হয় নাই। এখনও—এখনও কি একটা মিটাইবার চেষ্টা করা উচিত নহে? আর ইঁহারা নিমন্ত্রণ করিলেই কি সে আসিত? তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? এখন চাকরী হইয়াছে। হয় ত, হয়তই বা কেন? প্রায় দুই বৎসর হইতে যায়, এত দিনে নিশ্চয়ই আর একটা বিবাহ করিয়াছে। আচ্ছা, সত্যই কি বিবাহ করিয়া বউ আনিয়াছে? আশ্চর্য্য

কি ? এ ত আর মেয়েমানুষ নয় যে মারই থাক্, যাই হ'ক, তবু সেই ভিন্ন গতি নাই ! নাঃ, এ কিন্তু বড় অন্যায় ! এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে আবার যাহারা বিবাহ করে, তাহাদের মুখ দেখিতে নাই ।

প্রমীলার অশ্রুপ্লাবিত মুখে চোখে হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, মুখ দেখা ত এ জন্মের মতই শেষ হইয়াছে ! কে কাহার মুখ দেখিবে ?

"ও মা ঠাকুরঝি ! এই কি তোর শুয়ে থাকবার সময় ? নে, ওঠ, কায কি নেই বাড়ীতে একটুও ? আয় দেখি, ছেলেমেয়ের দল জমা ক'রে বাদামগুলো ভাঙ্গবি ।"

এই বলিয়া প্রমীলার বড় ভাজ সুধারাণী প্রমীলার হাত ধরিয়া টান দিলেন। "ও মা ! ও কি লো ! আজকের দিনে শুয়ে শুয়ে কাঁদছিস ? কেন ভাই ? কার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস বল্ ত ?"

প্রমীলা ধরা পড়িয়া মহা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল ; কিন্তু তথাপি এই ধরা পড়ার লজ্জাকেও ছাপাইয়া তাহার মুক্ত বেদনা যেন এই কথায় উথলিয়া উঠিল। সে জোর করিয়া হাত টানিয়া লইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকা দিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিছুতেই সে কান্না আর থামে না ।

সুধারাণী পাশে বসিয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সস্নেহে সজল চোখে বলিতে লাগিলেন, "বুঝেছি, ওলো বুঝেছি ! একদিন যে এম্‌নি করেই কাঁদতে হবে, সে আমার জানাই ছিল। মেয়েমানুষ বই ত আর কিছুই নস্ ! নে, এখন ওঠ, অমন ক'রে কেঁদে ভাসালে আর কি হবে ? যদি বর চাস, তার উপায় কর। মা'র কাছে বল্ না যে, আমি শ্বশুরবাড়ী যাব। মা'র কাছে আবার লজ্জা কি ?"

প্রমীলা বিস্ফারিত জিজ্ঞাসু নেত্রে বৌদিদির মুখের দিকে তাকাইল। কথা কহিতে তাহার ভারী লজ্জাবোধ হইতেছিল, তথাপি চেষ্টায়

জিহ্বার জড়তাকে জয় করিয়া সে মৃদু স্বরে কহিল, "তুমি বল, আমি বল্‌তে পারব না।"

সুধারাণী কহিলেন, "আমি বল্লে হবে না ভাই, আমি কি আর বলিনি ব'লে মনে করছ? তোমার অন্যমনস্ক ভাব আর লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে বেড়ানো দেখে অবধি দু'তিন দিন কথা তুলেছিলুম। তাতে প্রথম দিন কাণ দিলেন না, দ্বিতীয় দিন বল্লেন, 'বাবুকে ব'লে দেখি।' তৃতীয় দিন বল্লেন, 'কেন বৌমা! ননদ বুঝি তোমাদের জ্বালা হয়ে উঠেছে! তাই বিদায় করবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছ অত? মেয়ে আমি পাঠাব না, সেবার জুতো মেরেছে, এবার হাতে পেলে চাই কি প্রাণেই মারবে। কেন, আমার মেয়ে কি এতই ফেল্‌না হয়েছে যে, তাকে যমের মুখে পাঠাবো'?"

প্রমীলা শুনিয়া একটুখানি নিশ্বাস ফেলিল।

সুধারাণী কহিতে লাগিলেন, "তা কিন্তু নয়, ঠাকুরজামাই চিরদিনই খুব ভদ্র। তুই কি ক'রে যে ওঁকেও দিয়ে গায়ে হাত তুলিয়েছিলি, সে তুই-ই জানিস। এই ত আমার বাপের বাড়ীতে আজকাল ওঁকেই আমরা ছোট-খাট অসুখ-বিসুখে ডেকে আনি, এত যত্ন ক'রে দেখেন, আর এমনই শান্ত-স্বভাব। পয়সা ত নেনই না কিছুতে, তাই মধ্যে মধ্যে খেতে বলা হয়, ফলটল পাঠানও হয়। আমার দাদারা ব'লে, 'তোর ননদের বাহাদুরী আছে, এমন লোকের হাতেরও জুতো খায়!' সত্যি ভাই! তোর বরাত ভাল নয়, নৈলে অমন স্বামী তুই পেয়েও হারালি!"

প্রমীলার বুকের মধ্যটা আনচান্‌ করিতে লাগিল। সকলেই যাহার অত সুখ্যাতি করে, সে একাই তাহাকে অত মন্দ চোখে কেন দেখিল? তাহার উপর এই চারিদিকেই নিজে নিজেদের একটা এতবড় অখ্যাতি রটনা করাইল, ইহার ফলে না জানি তাহাকেও জনসমাজে কতই না লজ্জা পাইতে হইয়াছে ও হইতেছে! যাহারা চিনে না, তাহারা ত

তাহাকেই দোষী করিবে! প্রমীলার চোখ ফাটিয়া আবার জল আসিল।

সুধা আঁচল দিয়া প্রমীলার চোখ মুছাইয়া বলিল, "তবু ভাল যে, তোর এত দিনে চৈতন্য ফিরেছে। আচ্ছা ভাই, আমি তোর একটা উপায় দেখছি দাঁড়া, তোর দাদাকে দিয়ে দেখি যদি কিছু করতে পারি।"

খোলা জানালার মধ্য দিয়া আকাশের অনেকখানি দেখা যাইতেছিল। বাড়ীতে লোক-জন অনেক আসিয়াছে, ছেলেদের হুড়াহুড়ি ও কলহাস্যের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল। প্রমীলা কয়েক মুহূর্ত্ত বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার অশ্রু-বাষ্পসমাচ্ছন্ন দৃষ্টি বৌদিদির চোখের দৃষ্টি হইতে সরাইয়া রাখিয়া গাঢ় স্পন্দিত স্বরে উত্তর করিল, "বাবার মত হবে না দেখো।"

বলিয়াই আবার সে কাঁদিয়া ফেলিল। লুকান বেদনা যখন আজ বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছে, তখন আর যেন তাহাকে কোনমতেই ঠেকাইয়া রাখা যাইতেছিল না।

সুধারাণীর মুখ অহঙ্কারে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, "ইস্, মত না করলেই হ'ল আর কি! কেন মত করবেন না, শুনি? দেখিস্, তোকে তোর বরের ঘাড়ে চাপাতে পারি কি না! নে, এখন উঠে আয়, ভাইপোর ভাতে কায কর্, খা-দা, আমোদ-আহ্লাদ কর্, তা না হ'লে কিছুই আমি করব না ব'লে রাখলুম।"

সেই কান্নাভরা চোখেই হাসিয়া ফেলিয়া প্রমীলা তখন উঠিয়া বসিল।

১১

কিন্তু সুধারাণী কাযটাকে যত সহজ মনে করিয়াছিল, কার্য্যারম্ভের পর সে দেখিল, ব্যাপারটা তত সোজা নহে। ধীরেনকে সে সকল কথাই বলিয়াছিল। চারুর সঙ্গে যদিও সেই পর্য্যন্ত ধীরেনের আর চাক্ষুষ হয় নাই, তবুও তাহাব শ্বশুরবাড়ীর মারফৎ সে চারুর খবরাখবর রাখিত। দেখা ইচ্ছা করিয়াই করে নাই। চারুর প্রতি তাহার বাপের ব্যবহারটাকেও সে খুব সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারিত না। তাই এই দেখা-সাক্ষাতে তাহার একটা লজ্জা বোধ হইত। তবে এটুকু সে জানিয়াছিল যে, চারু আর বিবাহ করে নাই এবং তাহার এক শালার মুখে শুনিয়াছিল, সকল বিষয়ে পূর্ণ মাতৃভক্ত চারু শুধু এই বিষয়েই মা'র একান্ত অবাধ্য হইয়া তাহার মা'র মনোব্যথার কারণ হইয়াছিল। ডাক্তার বাবুর মা তাহার কাছেও অনেক দুঃখ করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন, "সে বউ যখন তোকে ত্যাগই করলে, তখন মেয়েমানুষের মতন তারই ধ্যানে জীবন কাটান—এ কি রকম বেটাছেলে, তা বুঝতে পারি নে।"

ধীরেন গিয়া সে দিন বাপের পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহাকে বলিল, "আপনাকে আমার কিছু বলবার আছে।"

সারদাচরণ চশমার মধ্য দিয়া বারেক ছেলের কুণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ খবরের কাগজে দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিয়া কহিলেন, "কি বলতে চাও, বল।"

ধীরেন বিপন্ন হইয়া উঠিল, বাপের মেজাজ ত তাহার অজ্ঞাত নহে। তাহার কপালে ঘাম দেখা দিল। তাঁহার মতের বিরুদ্ধ উপদেশ তিনি স্বয়ং গুরুঠাকুরের মুখেও শুনিতে অভ্যস্ত নহেন, ইহা সর্ব্বজনবিদিত।

তথাপি হতভাগিনী বোন্‌টার মুখ চাহিয়া সে মোরিয়া হইয়াই বলিয়া ফেলিল, “প্রমীলার এখন তাহার স্বামীর ঘরে যাবার ইচ্ছে হয়েছে, চারুকে একবার আনবার চেষ্টা করলে হয় না ?”

সারদাচরণ খবরের কাগজ হইতে চোখ তুলিলেন, “ওঃ, এই কথা! প্রেম কি তোমায় বলেছে যে, তাহার স্বামীর ঘরে যাবার ইচ্ছে হয়েছে ?”

ধীরেন্দ্রনাথ দৃষ্টি নত করিলেন, একটুখানি কাসিয়া গলা ঝাড়িয়া বলিলেন, “আমায় বলেনি, আমার স্ত্রীকে বলেছে।”

সারদাচরণ তীক্ষ্ণ চোখে ছেলের আনত মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন, “কিছুদিন থেকেই শুনতে পাচ্ছি, তোমার স্ত্রী আমার মেয়ের এ বাড়ীতে বাস করার সম্বন্ধে কিছু অতিমাত্রায় অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছেন। এখন দেখছি, শুধু তিনিই নন, তাঁর পরামর্শে তোমারও মনে সে বেচারীকে বিদায় করবার জন্য আগ্রহ কিছু প্রবল হয়ে উঠেছে। তা হ'লে এক কায করা যাক্, তুমি ও তোমার স্ত্রী বরং কিছুদিন আলাদা একটা বাসাটাসা ক'রে তাতেই উঠে যাও। প্রমীলা আমাদের জীবনের শেষ পর্য্যন্ত আমার কাছে থাকবে। তার পরের জন্যও তার ব্যবস্থাটা আমিই ক'রে রেখে যাব। তোমাদের সে গলগ্রহ হবে না।”

বাপের এই শান্তভাবে উচ্চারিত কথাগুলিতে ধীরেনের বুকে যেন শেল মারিল। একটিমাত্র বোন্ বলিয়া প্রমীলাকে সে মনের সহিতই ভালবাসিত। বাপের কথায় ঘায়ে আহত হইয়া তাহার মুখ-চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিলেও কোনমতে আত্মদমন করিয়া সে শান্ত বিনীতভাবেই উত্তর করিল, “আমি কি তার জন্যই বলছিলুম ; চারু এখন ডাক্তারীতে বেশ পসার জমাচ্ছে, বিয়েও করে নি, সকলেই তাকে ভাল বলে। বিশেষ যখন প্রমীলা স্বামীর জন্য উৎসুক হয়েছে। সে যদি যায়, তখন কেন না আমরা তাকে যেতে দিই

সারদাবাবু কহিলেন, "সে যদি আকাশের চাঁদ চায়, তুমি তাকে পেড়ে দিতে পারবে ? চাইলেই ত আর হয় না ! বুঝে-সুঝে চাইতে ও দিতে হয়। একদিন মেয়ে বল্‌লেন, 'আমার স্বামী চাইনে'। আজ বল্‌ছেন, 'আমার স্বামী চাই !' তা ব'ল্লে হবে কি ক'রে ? এখন আর তার স্বামী পাওয়া চলে না ! তাঁকে বলো, আমি যা করি, তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করি। তাঁরই মতে তাঁর স্বামীর সঙ্গে তাঁর ফারখৎ ক'রে দেওয়া হয়েছে। হিন্দুর ঘর না হ'লে আমি আবার তাঁর বিয়েও দিতুম। এখন যে আবার সেই লাথি মেরে পায়ে ধরতে যাওয়া, সে আমার বংশে হবে না। মনে করুন, তিনি বিধবা। এই মনে ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে বসবাস করুন। থাকবার একটা বাড়ী আর মাসিক একশো টাকা, এ ছাড়া নগদ দশহাজার, এই আমি তাঁর নামে লিখে রেখেছি, যা তাঁর স্বামীর ঘরে জন্মে কখন জুটতো কি না সন্দেহ। আচ্ছা যাও, তুমি না পার, আমিই তাকে বলবো। তবে তোমরা আর আমায় এ নিয়ে বিরক্ত করতে এস না। এ কথাটা বেশ ক'রে মনে রেখ,—আর তোমার স্ত্রীকেও সেটা বুঝিয়ে দিও। হুঁ,তা হ'লে এখন যাও !"

প্রমীলা বৌদিদির মুখ দিয়া কতকটা ছাঁটকাট করিয়া খবরটা পাইয়াছিল, তথাপি বাপের মুখেও তাহাকে স্পষ্ট ভাষাতেই ইহা শুনিতে হইল। শুনিয়া তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সে গুম হইয়া বসিয়া থাকিল, তাহার পর উঠিয়া গুম্-গুম্ করিয়া পা ফেলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। সেখানে একটা কোণের মধ্যে বসিয়া পড়িয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সে সবলে কান্না চাপিতে লাগিল। বাপের উপর একটা অকথ্য ক্রোধের জ্বালায় তাহার বুকটা যেন ভিতরে ভিতরে আগুন লাগার মতই জ্বলিয়া উঠিতেছিল। একবার তাহার মনে হইল, এক বোতল কেরোসিন তেল ঢালিয়া নিজের গায়ে আগুন ধরাইয়া দিলেই ইহার উত্তম প্রতিশোধ লওয়া হইবে। তাহার পর আবার

মনে হইল, নাঃ, কায কি, বাস্তবিকই চারু এখনও তাহাকে ঘরে লইতে চাহে কি না, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই! হয় ত সে-ও তাহার দুর্ব্বলতা দেখিয়া মনে মনে হাসিবে এবং নিশ্চিন্ত হইয়া আবার বিবাহ করিবে।

এখন চারুর আর একটা বিবাহের চিন্তায় প্রমীলার মনটা বড় তিক্ত হইয়া যায়। বিবাহ করে নাই বলিয়াই তাহার উপর যেটুকু মায়া হয়। সে যদি আবার কাহাকেও বিবাহ করিত, তবে কি আর প্রমীলা তাহাকে মনেই ভাবিত?

১২

আষাঢ়ের ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন আকাশে সদ্য বৃষ্টি থামার সুযোগে অস্ত-রবির আলোর ধারা বারিসিক্ত ধরণীবক্ষে নামিয়া আসিয়াছিল। ঝিপ্-ঝিপ ঝিম্-ঝিম্ রব থামাইয়া ঝির্-ঝির্ হাওয়া বহিতেছিল। সিক্ত তরুর সবুজ পত্রে বৃষ্টি-জলের বিন্দুগুলি টল্‌টলে নিটোল মুক্তার মতই শোভনীয় বোধ হইতেছিল। টগর, করবী ও কৃষ্ণচূড়া—অপর্য্যাপ্ত ফুলের রাশি সদ্যস্নাতা সুবেশা সুন্দরীদের মতই সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছিল। আকাশের উত্তর-পূর্ব্বদিকে একটা রামধনুর বর্ণশোভা অপূর্ব্ব সাজে সাজিয়া উঠিয়াছে, বাদলের অপরাহ্ণে সোনালী রংয়ের আলোর রাশিতে ধরণী যেন স্বপ্নপুরীর শোভা ধারণ করিয়াছিল।

দল বাঁধিয়া সে দিন সারদা বাবুরা আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখিতে আসিয়াছিলেন। সারদা বাবুর অবশ্য আসিবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না, কিন্তু হাজারিবাগের নিকটবর্ত্তী রামগড়ের জঙ্গলে ধৃত প্রকাণ্ডাকার বেঙ্গল টাইগারটাকে দেখার ও দেখাইবার উৎসাহে ছেলের দল তাঁহাকে টানিয়া আনিয়াছে। সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সারিয়া টিফিন কেরিয়ারগুলা

ভরিয়া লইয়া বাড়ী শুদ্ধ সকলেই দুইখানা মোটরে করিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে প্রমীলার মেজ ভাই নরেনের বিবাহ হইয়া গিয়াছে—নূতন বধূ সাবিত্রীও এই দলের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিল।

ছেলে মেয়েরা কাঠবিড়ালীর মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বুড়া-বুড়ীরা একটু-আধটু ঘুরিয়াই বিশ্রাম-স্থলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তরুণ-তরুণীরা কখন সবুজ ঘাসের উপর বসিয়া হাসি-খুসী গল্প করিতেছিল, কখন দ্রষ্টব্য জন্তু-জানোয়ারদের সম্বন্ধে তর্কাতর্কি করিতেছিল, কখন তাহাদের ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল।

বাগানে আরও কয়েক জন ভদ্রলোক বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একটি তরুণবয়স্ক লোক একখানা খাতা ও পেন্সিল লইয়া পাখীর দিক্‌টাতেই নিবিষ্ট হইয়া দেখা-শুনা ও নোট করায় ব্যস্ত ছিলেন। প্রমীলা সেই স্থান দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া যেন চমকিয়া উঠিল। বিস্ময়দীপ্ত তীক্ষ্ণ-নেত্রে সে সেই অজানা বাবুটির দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল এবং তাহার সেই বিস্ময়াভিহত দুই চোখের দৃষ্টি দিয়া সংশয়-শঙ্কিত বক্ষে তাঁহার কার্য্যরত আনত মুখের দিকে চাহিয়া অসাড় হইয়া রহিল।

সুধারাণী, সাবিত্রী, কমল এবং ইহাদের সঙ্গে ধীরেন, নরেন, জীতেন প্রভৃতি আপন মনে গল্প-স্বল্প করিতে করিতে খানিকটা দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল, এখন কি একটা কথায় সাক্ষী-স্বরূপে সুধা বলিল, "আচ্ছা, হয় না হয় ঠাকুরঝিকেই জিজ্ঞাসা কর্‌! হ্যাঁ ভাই ঠাকুরঝি! তুমিই বল ত—"

বলিয়া সম্মুখে, পাশে, পিছনে চাহিয়া দেখে, তাহার ঠাকুরঝি তাহাদের মধ্যে নাই! "ও মা! ঠাকুরঝি কোথা গেল?" বলিয়া পিছনদিকে অনেক দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিতেই দেখা গেল, সে একটা লতার

খুঁটি ধরিয়া কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া আছে; অবাক্ হইয়া কি যেন একটা দেখিতেছে বুঝা গেল। সাবিত্রী ঠাট্টা করিয়া বলিল, "দেখ দিদি! ঠাকুরঝি ভাই পাখী চুরীর মতলবে আছে নিশ্চয়! কি রকম চোরের মত চুপটি ক'রে দেখ্ছে দেখ!"

সুধাও তাহার এই স্তব্ধ নিশ্চলতা লক্ষ্য করিয়া এই কথায় একটুখানি হাসিল, তাহার পর বলিল, "তোরা এইখানে দাঁড়া, আমি ওকে ডেকে আন্ছি।"

জিতেন বলিল, "তুমি কেন ডাকতে যাবে আবার, আমি এইখান থেকেই একটা হাঁক দিচ্ছি!"

বড়বৌ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "না না ছোটঠাকুর-পো! তুমি থাম, আমি চুপি চুপি যেয়ে আগে দেখি, ও অমন হাঁ ক'রে কি দেখছে।"

নিকটে আসিতেই প্রমীলার দ্রষ্টব্য বস্তুটা সুধারাণীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সুধা তাহার বাপের বাড়ীতে দুই একবার চারুকে দেখিয়াছিল বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে চিনিতে পারিল। প্রমীলা সুধাকে দেখিয়া ঈষৎ অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি মুখটা ফিরাইয়া আনিল বটে, কিন্তু তাহার মুখখানা যে গভীর বেদনায় সাদা হইয়া গিয়াছিল, ঈষৎ লজ্জার লালিমাও তাহাকে মুছিয়া লইতে পারিল না। সুধা ডাকিল, "চারু বাবু!"

চারু বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। তাহার হাত হইতে পেন্সিলটা মাটীতে পড়িয়া গেল। সে মুখ তুলিয়া চাহিতেই পুনশ্চ অস্বাভাবিকরূপে চমকিত হইল। একটি মুহূর্ত্তমধ্যেই সে তাহার তিন বৎসরের অদর্শনে অদেখা স্ত্রীর মুখ দেখিয়া চিনিতে পারিল;—পারিয়া আর সে যেন সে দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে সমর্থ হইল না। বজ্রাহতের মত নিশ্চল নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

এই আকস্মিক নিশ্চলতার হাওয়া হইতে শুধু সুধারাণীই নিজেকে মুক্ত

করিয়া লইতে পারিল। সে তাহাদের দুই জনেরই সেই অভিভূতভাব দেখিয়া, দুই জনের দিকেই এক একবার করিয়া চাহিয়া হাসিল। তাহার পর সেই হাস্যস্মিত মুখে বলিয়া উঠিল,—"একেই বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ! কেমন তিনি ষড়যন্ত্রটা ক'রে দু'জনকে দু'দিক থেকে টেনে এনে মিলিয়ে দিয়েছেন দেখ ত!"—এই বলিয়া প্রমীলাকে টানিয়া লইয়া সে চারুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

প্রমীলার তখন হয় ত শরীরে সংজ্ঞাটুকু পর্য্যন্ত ছিল না। সে বৌদিদির হস্তে আকর্ষিত একটা মাটীর পুতুলের মতই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিল। তাহার চিন্তাশক্তি, তাহার বোধশক্তি সমস্তই তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছিল। তাহার পা এমন করিয়া কাঁপিতেছিল যে, সুধা তাহাকে ধরিয়া না থাকিলে সে হয় ত তখনই পড়িয়া যাইত।

এ দিকে এই আকস্মিকতার অতর্কিত বিস্ময়ের আঘাত হইতে চারুও আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। সে-ও চুপ করিয়া নীরবে প্রমীলার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতরটায় একটা তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। এখন ইহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহার কিছুই যেন সে ঠিক করিয়া উঠিতে না পারিয়া গভীর সন্দেহের দোলায় তাহার মনটা ভীষণভাবেই দুলিতে লাগিল। প্রমীলা এখনও তাহার স্ত্রী হইলেও সে ঠিক তাহার স্ত্রী নহে। তাহারা যে তাহার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে।

হিন্দুবিবাহে বিবাহবিচ্ছেদ নাই বটে, তবু চারু যে স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছে,—প্রমীলাকে সে কোন দিন নিজের কাছে আনিতে চাহিবে না।

সুধার মুখের দিকে চাহিয়া কোনমতে মৃদু-কণ্ঠে চারু কহিল, "ভাল আছেন, বৌদি?"

"ভাল আছি ভাই! তুমিও এইবার থেকে ভাল যাতে থাকতে পার,

ভগবানই তার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন বুঝি! ও মা! বাবা আসছেন যে! ঠাকুরঝি! ও ঠাকুরঝি! ও ভাই! শীগ্গির ভাই পালিয়ে আয়! এ দেখতে পেলে আর আমায় উনি আস্ত রাখবেন না। ভাববেন, আমিই ওঁকে ডেকে এনেছি!"

সুধারাণী শ্বশুরকে তাহাদের অদূরে দেখিয়াই এক রকম ছুটিয়া পলাইল। কিন্তু প্রমীলা যেমন অবস্থায় যেখানে ছিল, তাহা হইতে সে এক পাও নড়িল না। তাহার বুকের মধ্যে যে একটা অসহ্য বেদনার প্রবল আলোড়ন ঠেলিয়া উঠিতেছিল এবং একটা অব্যক্ত অসহ্য আর্ত্ত-ক্রন্দনে যে তাহার সমস্ত শরীর-মন ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছিল, তাহা তাহার সেই নিদাঘ-অপরাহ্নের আসন্ন-ঝটিকাব্যাপ্ত স্তব্ধ আকাশের মত মুখভাবেই প্রকাশ পাইতেছিল। নিদারুণ আত্ম-তিরস্কারের কঠোর লাঞ্ছনায় মনে মনে নিজেকে লাঞ্ছিত করিয়া তুলিয়া স্বামীর পায়ের তলায় নিজেকে লুণ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য প্রাণ তাহার তখন সকল কুণ্ঠার সহিত প্রাণপণে যুঝিতেছিল। আর কিছুরই অস্তিত্ব তখন তাহার মনের ভিতর প্রবেশপথ মাত্র পায় নাই।

সারদা বাবু ছেলেমেয়েদের খোঁজে আসিয়া এই পথ ধরিয়া চলিতেছিলেন। সহসা তাঁহার পায়ের গতি একেবারে নিশ্চলতার চরমে গিয়া আটকাইয়া পড়িল। এ কি! এই নির্জ্জনে লতাবিতানে এক জন পুরুষের সঙ্গে মুখামুখি সাম্‌না-সাম্‌নি দাঁড়াইয়া তাঁহারই মেয়ে প্রমীলা! ওঃ! এইবার বুঝা গিয়াছে! তাই বটে!

একটি মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া সারদাচরণ মেয়ের দিকে ফিরিয়া জলন্ত স্বরে ডাকিলেন,—"প্রমীলা!"

তাঁহার সেই স্বরে যেন একটা অগ্নিগর্ভ বোমা ফাটিয়া পড়িল।

"প্রমীলা! আমার কাছে চ'লে এস।"

বাপের আদেশ লঙ্ঘন করিবার শক্তি প্রমীলার মত আদুরে মেয়েরও

ছিল না। সে যেন মন্ত্রবশীভূতার মতই যথানির্দ্দেশিত কার্য্য করিল।

"তোমারই ইচ্ছানুসারে আমি তোমায় তোমার স্বামীর সঙ্গে স্বতন্ত্র থাকার ব্যবস্থা করেছিলুম। তোমার অনিচ্ছায় তা করা হয় নি। কেমন—না? এখন আমার অপমান ক'রে, আমার মুখে চূণকালি দিয়ে গোপনে গোপনে তোমার স্বামীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করছ, এর মানেটা কি? আজ থেকে তোমার বাড়ীর বার হওয়া বারণ হ'ল, এর পর থেকে আর কোথাও কখনও যেতে পাবে না। এটা জেনে রাখ।"

একটা জ্বলন্ত উল্কার মতই তীব্র দৃষ্টি জামাতার দিকে হানিয়া সারদাচরণ হন্ হন্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। যাত্রারম্ভের প্রথমেই বজ্রকঠিন কণ্ঠে আদেশ প্রদত্ত হইল,—"প্রমীলা! আমার সঙ্গে চলে এস।"—

একবারও আর পিছনে না চাহিয়া প্রমীলা নতমুখে শ্লথপদে পিতার অনুসরণ করিল। তাহার বুকের মধ্যটা তখন ঝড়ের হাওয়ায় নদীর মতই ভীষণ বেগে তোলপাড় হইতেছিল।

আর চারু? সে সেই তিন বৎসর পূর্ব্বের সেই বিদায়-দিনের মতই আর একটা প্রাণ-ফাটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাসে নিজের অন্তরস্থ ক্ষুধিত ব্যাকুল আর্ত্তনাদের একটুমাত্র বাহিরে প্রেরণ করিয়া অকথ্য অসীম যন্ত্রণার রাশিকে সবলে নিজের মধ্যেই চাপিয়া লইল।

১৩

রাত্রি প্রায় দশটা বাজে। কলেজ ষ্ট্রীটে একটি বড় ডিস্পেন্সারির উপর-তলায় চারুর বাসাবাড়ীতে একটি কক্ষে চারু বসিয়া নিজের কথাই ভাবিতে-ছিল। আজ তিন বৎসর পরে কি আশ্চর্য্যভাবেই তাহাদের এই সাক্ষাৎটা ঘটিয়া গিয়াছিল! কিন্তু কতটুকুই বা সে!—

ঘরখানি একটু বড়। খাটের উপর পরিষ্কার বিছানা পাতা। ঠিক সাম্‌নের দেওয়ালে প্রমীলার একখানি ফটোগ্রাফ এনলার্জ্জ করিয়া খুব চওড়া ফ্রেমে বাঁধান। ছবির ফ্রেমটিকে বেষ্টন করিয়া একগাছি যুঁইয়ের গোড়ে মালা। কিছু শুষ্ক হইয়া আসিয়াছে। মালাটি বেশী দিন পূর্ব্বের গাঁথা নহে, মাত্র এক দিনের বাসি। এখনও তাহা হইতে তাহাদের বিবাহিত জীবনের অতীত স্মৃতির মতই একটা ক্ষীণ সৌরভ উত্থিত হইয়া ঘরের বাতাসে ভাসিতেছিল।

আজিকার এই সদ্য দেখাব সমস্ত আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা মিলিয়া এই ক্ষীণ স্মৃতির সৌরভকে যেন অভিনব করিয়া দিতেছিল। এত দিনের সকল সংযম যেন আজ তাহাকে একেবারেই পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

ভোঁ ভোঁ করিয়া হর্ণ বাজাইয়া দিয়া হাজারখানা মোটরকার যাতায়াত করিতেছিল, তাহারই মধ্যের একখানা আসিয়া যেন দরজার কাছে থামিল। হয় ত ডিস্পেন্সারী সম্বন্ধীয় লোক, হয় ত বা কোন রোগী।—চারু সে দিকে বড় একটা মন দিল না। কিন্তু সহসাই তাহার মনকে মনের রাশ ফিরাইয়া লইতে হইল। হঠাৎ তাহার ঘরের বন্ধ করা দরজাটা সবেগে খুলিয়া গেল এবং এক জন কেহ ত্রস্ত গতিতে সেই দ্বারপথে ঘরের মধ্যে

ঢুকিয়া পড়িল। তখন চারু সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, সে এক জন স্ত্রীলোক!

এত রাত্রিতে তাহার ঘরের মধ্যে স্ত্রীলোক কে আসিল এবং কেই বা তাহাকে লইয়া আসিল? ইহার কোন মীমাংসা খুঁজিয়া না পাইয়া গভীর বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া চারু দারুণ সংশয়ে উচ্চারণ করিয়া উঠিল,—"কে আপনি? হয় ত ভুল করেচেন।"

"আমি প্রমীলা"—অস্পষ্ট স্বরে এই কথা বলিয়াই সেই আগন্তুকা নারী খানিকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়া এবার স্পষ্ট স্বরে কহিল,—

"আমি বাড়ী থেকে চ'লে এসেছি। জিতুকে সঙ্গে নিয়ে চুপি চুপি পালিয়ে এসেছি। সেখানে হয় ত আর ফিরে গেলেও বাবা আমায় তাঁর বাড়ীতে স্থান দেবেন না। তুমি কি আমায় একটুখানি জায়গা দেবে?"

বিস্ময়বিমূঢ়তা হইতে নিজেকে টানিয়া তুলিয়া চারু গভীর আনন্দে বালকেব মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাহার দুই চোখ দিয়া অনেক দিনের জমান গভীর বিষাদাশ্রুরাশি আজ এই শুভক্ষণে অজস্র আনন্দাশ্রুর রূপ ধরিয়া ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তারই মধ্য হইতে সে কোনমতে ভাষা সংগ্রহ পূর্ব্বক গভীর স্বরে কহিল,—"তুমি আমায় ক্ষমা করেছ, প্রমীলা?—তা যদি করে থাক, তবে এস, এ ঘর তো তোমারই।"

ঝড়ের রাতে

১

উজ্জ্বল প্রশস্ত দিবালোক। কারাগৃহের চারিধার হইতে একটা অস্পষ্ট কোলাহলের ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল। প্রকাণ্ড ভারী দরজাগুলা সজোরে মুক্ত ও রুদ্ধ করিবার শব্দে, চাবীর ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজে, রূঢ় কণ্ঠের চীৎকারে চারিধার মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল; নীরস কঠোর পাষাণ গৃহে এই সকল কোলাহলেরই সহিত সম্মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে আরও একটা ধ্বনি ভাসিয়া উঠিতেছিল, সেটা কঠিন কারা-জীবনে অভ্যস্ত বন্দীদিগের কাহারও কাহারও উল্লাস-সঙ্গীত ও আনন্দ-কোলাহল।

কারাগারের মাঝখানে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ; তাহার চারিপাশে পায়রার খোপের মত ছোট ছোট জানালা দেওয়া অসংখ্য কুঠরী; প্রত্যেক কুঠরীর সামনের অপ্রশস্ত ছোট্ট একটুখানি দালানের মাঝে মাঝে দেওয়াল দিয়া পরস্পর হইতে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। আর এই সমস্তটাই দুর্গ-প্রাচীরের মত সুদৃঢ় ও উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত।

উত্তর সারির একটা বন্দিগৃহের মধ্যে নিজের বহু দিনের অধিকৃত অপ্রশস্ত বিছানার এক প্রান্তে ১২৭ নম্বরের কয়েদী সদানন্দ দাস উৎকর্ণ ও উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া ছিল। চারিদিকের ঐ পরিচিত রাগিণীর ঝঙ্কারগুলি তাহার কর্ণকুহরে যেন প্রবিষ্টও হইতেছিল না; আর প্রবেশ করিলেও, সে সকলের অর্থ যেন আজ তাহার চিত্ত উপলব্ধি করিতে পারিতেছিল না। ঐ সকল প্রাত্যহিক মিশ্র কলরবকে চাপিয়া ফেলিয়া এক অখণ্ড বিচিত্র সঙ্গীতের সুর তাহার সমুদায় হৃদয় ব্যাপিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছিল;—আজ সে মুক্তি পাইবে! ওই যে লৌহদ্বার দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আছে, উহা উদ্‌ঘাটিত

হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আজ সে এখান হইতে মুক্তি পাইবে। মুক্তির মূল্য দেওয়া হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি সে যেন এই কথাটাকে এখনও ভাল করিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, যে সত্য সত্যই এই সুদীর্ঘ দিনের অধিবাসিত কারাগৃহে তাহার এই শেষ ঘণ্টা কাটিতেছে। এমনই অসম্ভব এ কথা।

হাঁ, এতঃ ইহা অসম্ভব। এমন সময় ছিল, যখনকার সমস্ত দিনের, রাত্রির, মাসের ও বৎসরের মধ্যে একবারেরও জন্য সে নিজের মনকে আজিকার এই দিনের জন্য প্রস্তুত করিতে ভরসা দিতে পারে নাই। ঐ দিন যে এ জীবনে আবার কখন দেখা দিবে, সে ভরসার ছায়াও তাহার হৃদয়ে প্রতিভাসিত হইত না। আনন্দাতিশয্যে তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, জীর্ণ শয্যার উপর সে হতাশ হইয়া যে ভাবে কত দিন ঢলিয়া পড়িয়াছে, তেমন করিয়াই শুইয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকা দিল।

মুক্তি! মুক্তি! সত্যই কি সে মুক্তি পাইবে? আর একটি ঘণ্টা পরেই সে বাহিরের উন্মুক্ত উদার বিশাল আকাশের তলায়, স্নেহ-মায়া-প্রেম-প্রীতিভরা অপরূপ সুন্দর পৃথিবীর মধ্যে গিয়া তাহারই আর একজন হইয়া দাঁড়াইবে? আলো ও সূর্য্যের তাপ সুপ্রচুরভাবে উপভোগ করিতে পারিবে? পাখীর গান, শিশুর হাসিকান্না, যুবক-যুবতীর মান-অভিমান, বৃদ্ধের আশীর্ব্বচন যে পৃথিবীর বুকের উপর স্বতঃস্ফূর্ত্ত ঝরণার মতই নিরবধি ঝরিত ক্ষরিত হইতেছে, তাহারই মধ্যে তাহারও অতটুকু একটুখানি স্থান মিলিবে? আঃ, সত্য এ কথা!

সহসা এই সুখ-চিন্তার মাঝখানে সদানন্দ ঈষৎ ম্লান হইয়া পড়িল। সহসা মনে হইল, এই যে দীর্ঘকাল সে সেই আনন্দময়, আলোকময়, জনকোলাহলময়, সজীব জগৎ হইতে এই নিরালোক, নিরানন্দ, হতাশাপূর্ণ, প্রাণহীন জীবলোকে স্থান লইয়াছে, ইহার বাহির হইয়া আর কি সে সেই তাহার পুরাতন স্থানে ফিরিয়া গিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে? আর কি,—

কিন্তু কেনই বা পারিবে না? তাহার বয়স এখন পঁয়ত্রিশ, আর সে ত এই সবে দশ বৎসর তিন মাস মাত্র এখানে আসিয়াছে। দশ বৎসর তিন মাস মাত্র! সদানন্দের শুষ্ক অধরপ্রান্তে এক ফোঁটা তীব্র বেদনার হাস্য অত্যন্ত ক্ষীণভাবে প্রকটিত হইল। মাত্র দশ বৎসর তিন মাস। এই দশ বৎসর তিন মাস যে তাহার জীবনের দশটি হাজার তিন শত বৎসর! প্রথম যখন সে এইখানে আসিয়াছিল, তখনকার কথা মনে পড়িল। প্রত্যেক মুহূর্ত্তটি তখন তাহার কাছে কি অসহনীয়ই বোধ হইয়াছিল! প্রতি নিমেষেই মনে হইয়াছে, আর কিছুক্ষণ এখানে থাকিলে সে উন্মাদ হইয়া যাইবে। একটি প্রহরকে একটি যুগ বলিয়াই সে দিনে বোধ হইত; এবং প্রত্যেক অর্দ্ধ ঘণ্টার ঘড়ীর বাজনা শুনিতে পাইলেই সে মনে মনে এই ভাবে হিসাব করিতে বসিত।

এই ত আধ ঘণ্টা গেল, ইহার পর আবার এতখানি সময় লইয়া আর আধ ঘণ্টা গেলে এক ঘণ্টা হ'বে। তাহার পর আবার আধ ঘণ্টা, আবার আধ ঘণ্টায় এক ঘণ্টা। এমনই ক'রে আটচল্লিশ বার হ'লে একটা দিন-রাত্রি কাটবে। তেমনই ক'রে একটির পর একটি ক'রে দিনরাত কেটে কেটে এক একটি হপ্তার শেষ হ'বে। চারিটি ক'রে ক'রে হপ্তা কেটে একটি মাস। তা'রপর আবার—আবার—আবার সেই রকম চল্‌তে থাক্‌লো, দুই মাসে এক এক ঋতু; এই ভাবে,—বর্ষার পর শরৎ, তা'র পর শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, এমনই ক'রে একটি বৎসর পূর্ণ হ'বে। এই এত দিন ধ'রে যে বৎসর হবে, সেই বৎসরের দশ বৎসর পূর্ণ হওয়া চাই—তাহার পর আরও তি—ন—মা—স। ওঃ ভগবান্! এ কি কখন সহ্য হয়? না, না, এ জন্মে আর কখন এই মুক্তির মুখ দেখা কপালে নাই! অসম্ভব এ মুক্তি পাওয়া!

কিন্তু ইহাও সহিয়া গেল। সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতি দেবী তাঁহার স্বভাবজ বৈচিত্র্য দিয়া যেমন জগতের সকল বস্তুজাতকে, তেমনই মানব-প্রকৃতিকেও

গঠিত করিয়াছেন। তাই বুঝি মানুষেরও প্রাণে সকল সহে ; এবং শুধুই যে সহ্য হয়, তাহাই নহে ; সে স্বভাবতঃই আবার সকল অভ্যাসেরই একান্ত দাস হইয়া পড়ে। সদানন্দও তাহার জীবন হইতে এই বিচিত্রতার অধিকারকে ছাড়াইতে পারিল না। ক্রমে ক্রমে যতই দিন যাইতে লাগিল, সে-ও সবিস্ময়ে দেখিল যে, এই ঘৃণা ও বিভীষিকাপূর্ণ কারাজীবনে সে-ও যেন ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। এমন কি, উহারই ভিতরে আবার ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ অনুভবও করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তাহার এই কারাদণ্ড সপরিশ্রম। তাই তাহাকে সারাদিন ধরিয়াই প্রায় কায করিতে হইত। প্রথম কিছুদিন তাহাকে ঘানি টানিতে হয়। সর্ব্বপ্রথম দিন গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে ঘানি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তাহার ফলে কয়েক দিন হাঁসপাতালে বাস করিয়াছিল। উঃ, সে কি ভীষণ স্থান! অপরিচ্ছন্ন শয্যা, চারিদিক হইতে একটা রোগযন্ত্রণার ক্লিষ্ট আর্ত্তনাদ, রোগের ও ঔষধের উৎকট একটা দুর্গন্ধ। কিন্তু তাহার পর যখন আরোগ্য লাভ করিল, তখন সেই ভীষণ স্থান হইতে ফিরিতেই কি আতঙ্ক! আবার সেই নিদারুণ গুমোটের ভিতর শ্বাসরোধকর ভীষণ পরিশ্রম! উপায় কি? তখন অল্পবয়সে, সুস্থ শরীরে রোগ ত আর চাপিয়া বসিতে পারে না, কাযেই সে দুই দিনে ছাড়িয়া গেল! কাযেই হাঁসপাতাল ছাড়িতে হইল, আবার সেই বন্দিশালার রুদ্ধ কক্ষ! সেই নিজেরই দুর্ভাগ্যের স্মৃতি-তাপতপ্ত দীর্ঘশ্বাসে উত্তপ্ত বায়ু সে কক্ষকে ভরাইয়া রাখিবে, নিরাশার—হতাশার তীব্র বৃশ্চিকদাহে বক্ষ ক্ষণে ক্ষণে ছিঁড়িয়া কাটিয়া পড়িতে থাকিবে, এমনই করিয়া দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি। শুধু তাই নহে, পল, দণ্ড, প্রহর গণনা করিয়া করিয়া দিন কাটান। আর সেই সঙ্গে—উঃ, কি সে ভয়ানক পরিশ্রম! আর কি সে অমানুষিক লাঞ্ছনা! ভাবিতে গেলে মাথার ভিতর দিয়া আগুন ছুটিতে থাকে ;

উত্তেজনায় সর্ব্বশরীরের শিরাসমুদায় দপ দপ করিয়া উঠে। অথচ সেই উত্তেজনার এতটুকুর বহিঃপ্রকাশের উপায় নাই! তাহা হইলেই তখনই লাঞ্ছনার একটা প্রবল ঝড় উঠিয়া পড়িবে। উপায় নাই, কোনই উপায় নাই; শরীরে না বহিলেও ঠিক ঐ একই ভাবে খাটিতে হইবে, মনে না বহিলেও ঠিক সেই একই অবস্থায় পড়িয়া পড়িয়া সকলই তাহাকে সহিতে হইবে। কারণ, সে যে অপরাধী, সে যে বন্দী।

তাহার পর ক্রমশঃ ইহাও যেন কতকটা সহিয়া আসিল। এই সময় ঘানিটানা বন্ধ করিয়া দিয়া জেল-কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে অন্য কাযে নিয়োজিত করিলেন। কিছু দিন করাত দিয়া বড় বড় কাঠের গুঁড়ি তাহাকে চিরিতে হইল, দুই হাত তাহাতে তাহার ফোস্কা-ছেঁড়া ঘায়ে ভরিয়া গেল; আবার একবার হাঁসপাতালটাকে তাহার এই সময় ঘুরিয়া আসিতে হইয়াছিল। এ বার দুই চারি দিনেই সেখান হইতে তাহাকে উহারা ফিরাইয়া আনিতেও পারে নাই। পূরাপূরি একটি মাস সেখানে বাস করিবার পর ফিরিয়া আবার তাহাকে পূরা দমে কায করিতে লাগিতে হইল। এই সময়ে আবার কায বদল হইয়াছিল। হাতুড়ি দিয়া পাতর ভাঙ্গিয়া বর্ষার জলে ক্ষয়প্রাপ্ত পুলের ধারে ঢালা, এই তা'র এখনকার কায হইল; সব কাযের চাইতে এই কাযটাকেই সে কিন্তু পছন্দ করিল। ঐ যে দিনের মধ্যে এক বার দুই বার প্রহরি-বেষ্টিত হইয়া সে নদীতীরে যাইতে পারিত, সেই-টুকুতেই যে তাহার সকল শ্রম সার্থক হইয়া যাইত। আঃ, সেই মুক্ত উদার আকাশের তলায়, জননী ধরিত্রীর মাটীর বক্ষে দাঁড়াইয়া, সর্ব্বশরীরে নদীর জলস্পৃষ্ট সুস্নিগ্ধ বায়ুর স্পর্শ অনুভব করিয়া তাহার সকল শ্রান্তি, সকল তাপ নিমেষে ঝরিয়া পড়িয়া যাইত। আবার এইখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া একবার তৃষিত চক্ষুতে ইহার এ পারে ও পারে, ইহার বুকের উপরকার চঞ্চল তরঙ্গভঙ্গ, তদুপরি তরণীর মেলা, সেই তরীর উপরকার মৎস্যজীবীদের

কার্য্যপ্রণালী, খেয়ার নৌকায় যাত্রীদলের ঠাসাঠাসি, মহাজনী সুবৃহৎ বোঝাই তরণীর উপর বোঝাই করা মালের মধ্যে মাছির ঘরকরণা করা, তীরে স্নানের ঘাটে মেয়ে-পুরুষের ভিড়, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অবাধ জলক্রীড়া, অভিভাবকদের ভৎ‍্সনা, যুবতীবৃন্দের ঘোমটা ফাঁক করিয়া এদিক ওদিক চাওয়া, যুবকদলের আধখানা নদী তোলপাড় করিয়া সাঁতার দেওয়া, আর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদলের আবক্ষ জলে দাঁড়াইয়া বা তীরে বসিয়া পূজাজপ করা—সে মুগ্ধ লুব্ধ তৃষিত নেত্রে এই সব দৃশ্য দু'চোখ ভরিয়া পান করিয়া লইত। এই সকলের মধ্যে যে এত রস, এত আনন্দ লুকান ছিল, জন্মাবধি দেখিয়া দেখিয়া কোন দিনই সে যে তাহা বুঝিতেও পারে নাই! কিন্তু আজ? ওঃ! আজ এইটুকু দেখিবার জন্য সে অনায়াসে নিজের সমস্ত প্রাণটাকেই নিঃশেষে ফুরাইতে দিতে পারে, এইটুকু সুখের স্বাদ পাইবার জন্য সে সারা রাত্রিদিন ধরিয়াই অসুরের মত খাটিতে রাজী আছে। কিন্তু শুধু এইটুকু যেন তা'র কাছ হইতে কেহ কাড়িয়া না লয়!

২

এমনই করিয়া কয়টা বৎসর কাটিয়া গেল। কারাজীবন অনেকখানিই এখন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি যখন পাতর বহিয়া লইয়া যাইতে যাইতে পথের উপর কোন ছোট ছেলেকে সে দেখিতে পায়, অমনই তাহার বুকের মধ্যে একটা প্রবল স্নেহের তৃষ্ণা আকুল তৃষিত হইয়া উঠে। নদীর ধারে যখন স্নানরত ছেলেমেয়েগুলি আনন্দের কলহাস্যে সারা নদীতীর ঝঙ্কৃত মুখরিত করিয়া তুলিত, তখন বিচিত্র সঙ্গীতের সুরের মত সেই স্বরলহরী তালে তালে সদানন্দের বুকের মাঝখানে একটা প্রবল হর্ষ-বেদনার আলোড়নে তাহাকে যেন অভিভূতপ্রায় করিয়া ফেলিত। বহু যত্নে চাপিয়া

রাখা সমস্ত স্মৃতিসরোবরের তলদেশ যেন একটা সহসাগত ঢেউএর ধাক্কায় একেবারে উলটিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইতে চাহিত। উঃ, কেমন করিয়া আর সে সহ্য করিবে? মানুষের প্রাণ আরও কি সহিতে পারে?

সদানন্দরও যে ঐ রকমেরই একটি ছোট ছেলে আছে। আহা, বেচারী দুলাল আমার! আজ কোথায় তুই? আর কি তুই তোর এই হতভাগ্য বাপের কাছে আসিবি না? তা'র নামও কখন তুই সহ্য করিতে পারিবি? কিন্তু সে একদিন ছিল—যেদিন পিতার সে কি ভালবাসায়ই না তোকে ঘেরিয়া রাখিয়াছিল! তা'র চুম্বনে, তা'র আদরে, তা'র প্রাণঢালা স্নেহে তুমি মায়ের কোল ফেলিয়া ছুটিয়া আসিতে, কতই না তৃপ্তি বোধ করিতে; মায়ের উপর অভিমান হইলে—ওরে অভিমানী! তুই যে তোর আধ আধ ভাঙ্গা বুলি লইয়া ছোট ছোট বাঁকা পায়ে টলমল করিতে করিতে বাপের কাছেই নালিশ করিতে ছুটিয়া আসিতিস্! চোখে যেন জল ধরিত না, কচি নরম ঠোঁট দু'টি ফুলিয়া উঠিত। তখন তোর এই অভাগা বাপই যে তোকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া অজস্র চুম্বনে চুম্বনে তোর সকল ব্যথা মুছিয়া লইয়া তোর সেই রাঙ্গা ঠোঁটে হাসি ফুটাইয়া তুলিত! ওরে মাণিক আমার! ওরে আমার বুকের নিধি! আমার প্রাণের দুলাল! আজ সেই বাপের স্মৃতিই কি না তোর কাছে সব চেয়ে বেশী দুর্দ্দৈবের হইয়া দাঁড়াইল! আজ তোর অনেকটাই জ্ঞান হইয়াছে, বয়স বাড়িয়াছে, ভদ্রসন্তানরা তোর সঙ্গী সহচর। তাদের কাহারও বাপ ত আর তোর বাপের মত তা'র নিজের ছেলেকে লজ্জা-ঘৃণার কলঙ্কে ডুবাইয়া রাখে নাই! আমার নামে তাহার প্রাণ কি শিহরিয়া উঠিবে না? আমার নামে জীবনের যত লজ্জা—যত অপমান তা'র অন্তরে কি জাগিয়া উঠিবে না? লোক কি তা'র বাপের কথা মনে রাখিয়া তা'র দিকে

একটুখানি অবজ্ঞা, একটুখানি ঘৃণা, একটুখানি অনুকম্পায় মিশ্রিত দৃষ্টিতে চাহিবে না? আর তা'দের সেই দৃষ্টি! উঃ, কেমন করিয়া সে সব সে সহিবে? যে পিতা তাহাকে এই জীবন-ভরা অভিশাপের মধ্যে নিক্ষেপ কবিয়াছে, তা'র স্মৃতি তা'র মনের কাছে কি বীভৎস ঘৃণার জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকিবে, সে কি কখনও তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিবে?—ওরে নির্ম্মল, পবিত্র প্রসূন আমাব! ওরে আমার পঙ্কিল জলজাত অম্লান সুপবিত্র শতদল! তাই করিস্, তাই করিস্ বাপ! ঘৃণাই তুই করিস্ আমাকে! তাই আমাব যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত! আর আমি তোকে প্রাণ ভরিয়া এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যেন তোব ছেলে তোকে শ্রদ্ধা করিতে পারে। ছেলের কাছে যে বাপ ভক্তি-ভালবাসার দাবী করিতে পারিল না, জীবন্তেই তাহার প্রাণে নরকেব অসহ্য দাহজ্বালা জ্বলিতে লাগিল। দয়াময়! আমার দুলালের যেন কিছুতেই এত বড় দুর্গতি না ঘটিতে পায়।

এমনই করিয়াই সেই আত্মহারা পিতা বিশ্বের সকল ছোট ছেলেদেরই মধ্যে তাহার দূরাবস্থিত সন্তানের স্মৃতিকে জাগ্রত করিয়া কত কথাই মনে মনে আলোচনা করিতে থাকিত। কখনও তাহাদের উদ্দেশে প্রাণপণে চোখ বুজিয়া ভগবান্‌কে ডাকিয়া বলিত—দেখ ঠাকুর! এতগুলো সরল প্রাণ তোমারই হাতের মুঠোয় ধরা রয়েছে, এদের যেন ব'সে ব'সে গরল মাখিও না! আহা, তোদের ভাল হোক, আমার দুলালও যে, তোরাও সে, তাহার মত তোরাও পাপকে ঘৃণা করতে শিখিস্। কিন্তু ওরে, পাপীকেও একেবারে ঠেলে ফেলিসনে সব! তা' হ'লে তাদের দুর্গতিটা হ'বে কি? না না দুলাল! তোর বাপের জন্য ঘৃণা ক'রে হোক, অভিমান ক'রে হোক, এক ফোঁটা চোখের জল একটি দিনের জন্যও ফেলিস্ বাপ! একেবারে মরুভূমির মত হয়েও শুকিয়ে যাসনে।

সকালে সন্ধ্যায় নাম ডাকা হইয়া গেলে, নির্জ্জন নিরানন্দ ঘরের কোণে

স্তব্ধ হইয়া বসিয়া বসিয়া সদানন্দ তাহার নিজের সমুদায় অতীতটাকে সাম্‌নে টা'নিয়া আনিত এবং যেমন করিয়া এক একটি ফুলকে সূচের মুখে পরাইয়া লোক মালা গাঁথে, সে-ও তেমনই করিয়া তাহার অতীত কথা-গুলিকে দিয়া একটি প্রকাণ্ড মাল্য রচনা করিত। অথচ কতই বা সে কথা, আর কি-ই বা এমন বিচিত্র ঘটনাময় তাহার সে অতীত! তা' যতই যা' হোক, তা'র জন্য কিন্তু কিছুই আটকাইয়া থাকিত না। যে কথাটাকে সহজ দিনের স্বাভাবিকতায় নেহাৎ তুচ্ছ বলিয়া মনে করা যায়, তাহারও একটি সময় আছে, যে দিন সে তা'র সেই সহজ রূপকে বদল করিয়া এমন একটি অপরূপ ভাবে আপনাকে প্রকাশ করিয়া বসে যে, তাহা দেখিয়া হয় ত চমৎকৃত হইয়া যাইতে হয়! তুচ্ছ চিরদিনই কখন তুচ্ছ থাকে না।—তাহার পর সেই গাঁথা মালার প্রত্যেকটি ফুলের মধ্যে নিহিত পুষ্পবাসের মতই তাহারই সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকিত—তাহার ছোট শিশুটির অজস্র স্মৃতি। সেইটুকুই যেন ছিল সেই মালাগাছির প্রাণ, তাহার সমস্ত মূল্য। এতটুকু অসহায় কচি শিশু, মায়ের বুকের জন্যই শুধু যা'র একমাত্র বিলাপ আবেদন, তখনই সে কি অফুরন্ত স্নেহ-নির্ঝরের ধারা তাহারই উদ্দেশে এই বুভুক্ষিত পিতৃস্নেহাস্বাদবঞ্চিত সদ্য-পিতৃ-গৌরবে গৌরবান্বিত পিতৃহৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া আসিয়াছিল! তাহার পর সেই শিশু চন্দ্রকলার মত দিনে দিনে বাড়িয়া একটি হাস্য-রহস্যময় আনন্দের প্রতিকৃতিস্বরূপ বালকে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিল। তাহার পর?—তাহার পরের কথা ভাবিতে গেলে বুকের ভিতর এখনও ফুটিয়া থাকা কাঁটার খিচ করকর করিয়া উঠে! পাঁচ বছরের ছেলেকে সেই যে তাহার মা জোর করিয়া তাহার বাপের বুক হইতে টানিয়া লইল, সেই হইতেই ত তাহার এই দুর্ভাগ্য-জীবনের সূচনা!

পাতর-ভাঙ্গা কায দুই মাস পরেই বদল হইয়া গেল। জেলখানার

ভিতর বসিয়া সদানন্দকে এখন সতরঞ্চি বোনা শিখিবার আদেশ হইল। কারণ, অত বড় শ্রমসাধ্য কার্য্য অনেকদিন ধরিয়া করাইলে কয়েদীদের শরীর খারাপ হইয়া যাইবে। কিন্তু সদানন্দের মনে হইল, তাহার উপর এত বড় নিষ্ঠুরতা বোধ করি আর কেহ কোন দিন করে নাই, এমন কি, তাহার স্ত্রী পর্য্যন্ত নহে!

স্ত্রী,—স্ত্রীর কথা মনে পড়িতেই বুকখানা তাহার স্ফীত হইয়া উঠে। সমুদ্রের বিশাল উত্তাল তরঙ্গেরই মত একটা প্রচণ্ড বেদনা ও সংশয়ের তরঙ্গ তাহার বুকের উপর যেন ভীম বলে আছড়াইয়া পড়ে। স্ত্রী,—হ্যাঁ, তাহার স্ত্রী! ধরিতে গেলে সেই স্ত্রীর জন্যই তাহার আজ এই এত বড় মন্দ দশা!

আজ এই মুক্তির পরশ প্রাণে লইয়াও সদানন্দ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতেছিল—মুক্তি পাইবে বটে, কিন্তু এ পাওয়ার কি কিছু দরকার ছিল? মুক্তি সে এই জেলখানা হইতে পাইলেও দশের কাছে—সমাজের কাছে—নিজের বিবেকের কাছে, আর—আর তাদের—তাদেব কাছে—তার স্ত্রীপুত্রদের কাছে কি এমনই করিয়া আর কখনও মুক্তি পাইতে পারিবে? না না, তাহা সম্ভব নয়, কখনই তা সম্ভব নয়, এই হীনসংসর্গী, হেয়-চরিত্র, নীচকর্ম্মী, অপরাধীকে ক্ষমা? সম্ভবে না।

কেমন করিয়া সে তাহার একমাত্র সন্তানকে, তাহার চির-স্নেহের তুলালকে এই দীর্ঘ দিনের অদর্শনের পর—এত বড় ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর একবার না দেখিয়া থাকিবে? অথচ তাহার কাছে মুখই বা সে দেখাইবে কেমন করিয়া? ইহা অপেক্ষা চির-সমাহিত হইয়া এইখানেই সে যদি রহিয়া যাইতে পারিত! যদি তাহার মৃত্যু ঘটিত!

৩

সদানন্দ বড়লোকের ছেলে না হইলেও পল্লীগ্রামেব মধ্যে তাহার জমী-জমা, গোলা-মরাই লইয়া অবস্থাটা নিতান্ত মন্দও ছিল না। চব্বিশ বিঘা ধানজমী, দুখানা লাঙ্গল, এক জোড়া বেশ বলিষ্ঠ বলদ, দুইটা দুগ্ধবতী গাভী, পুকুরে মাছ, গাছে নারিকেল, তাল, কাঁটাল, আম, জাম, আমড়া, আতা, বাতাবী ও কাগজী লেবু, ক্ষেতে শাকসব্জী, চালে লাউ-কুম্‌ড়া—পাড়াগাঁয় এই থাকিলেই এক সময়ে লোক নিজেকে সৌভাগ্যবান্‌ বলিয়া মনে করিত। অবশ্য সে দিন এখন চলিয়া গিয়াছে, নানা কারণে লোকের এখন অভাব ও অভিযোগ অনেকখানিই বর্দ্ধিত হইয়াছে; তথাপি যত দিন সদানন্দর বিবাহ হয় নাই, তা'রা মা ও ছেলেতে তা'দের এই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট ছিল। সদানন্দর মা ইহার কাছাকাছি পল্লীগ্রামেরই সামান্য ঘরের মেয়ে। শারীর শ্রম তাঁহার আজন্মেরই অভ্যস্ত, নিজের ঘরেও তিনি এই বয়সেও যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন। লোক রাখিয়া ধান রোপণ, ধান কাটানো, দোউনি করা, তৈরি ফসল ঘরে তোলা, ধান সিদ্ধ করা, শুকানো, ভানা, ঝাড়া-কাঁড়া এ সকলই তিনি যথাসাধ্য স্বহস্তে করিতেন। যাহাতে দুই পয়সা বাঁচে, কম খরচে সংসারটি চলে, চুরি না যায়, অপচয় না হয়, এই সকল ভাবনা-চিন্তাতেই তাঁহার রাত্রিদিনগুলি অতিবাহিত হইত। ছেলেটিকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া তাহাকে গ্রাম্য পাঠশালায়, সেখান হইতে ক্রমে গ্রামান্তরের স্কুলে পড়িতে পাঠানো, ছেলে পড়িতে গেলে সহস্র কাযকর্ম্মের মধ্য দিয়া তাহারই পথের দিকে উন্মনা হইয়া চাহিয়া থাকা, ছেলে বাড়ী ফিরিলে তাহাকে আঁচলে মুখ মুছাইয়া পাখার হাওয়া দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া তাহার পর চারিটি গুড়-মুড়ি বা মুড়ি-মটরভাজা, নারিকেল, দু'খানা বা

ফুলুরি-বেগুনী খাইতে দেওয়া—এই ছিল তাঁ'র নিত্যকর্ম্ম ও সব চেয়ে আনন্দের ও গৌরবের কার্য্য। হায়, সেই মা-ই বা আজ তাহার কোথায়?

পৃথিবীতে তখন আর কেহ, আর কিছুই ছিল না। এই দুইটী মাতা-পুত্র তখন নিজেদের সুখ-দুঃখ লইয়া পরস্পরের মধ্যে এক হইয়া থাকিত। মায়ের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল—ছেলেমানুষ করা, আর ছেলের জীবনেরও সেই ভিন্ন আর অন্য কোন উদ্দেশ্যই ছিল না। লেখাপড়া করিলে মা খুসী হইবেন, মা'র মনে গৌরব হইবে, এইজন্যই সে যেন লেখাপড়ায় অতখানি মন দিতে পারিয়াছিল; নতুবা চাকরী করিব, কি বড়লোক হইব, সে রকম কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাহার মনের মধ্যে স্থান পাইত না। সে জানিত, এই সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা গ্রামখানিই তাহার সকল দেশের সেরা। ইহার বাহিরে গিয়া যদি সে লক্ষপতিও হয়, তবু কি এমন সুখ সে পাইবে?

হায়, কোথায় সেই সবুজ ভেলভেটের গদী-আঁটা সোফার মত নবীন তৃণাস্তীর্ণ গো-চারণের মাঠ! কোথায় সেই সুন্দরীর সীমন্তরেখার ন্যায় শুভ্র সরল অনতিপ্রশস্ত পল্লীপথ! প্রতিদিনের প্রাতে সেই পথের উপরে ভারে ভারে দুগ্ধ-দধির পসরা মাথায় লইয়া পসারিণীরা আমড়াতলীর হাটের মুখে ত্রস্ত চলিয়াছে; পসারীর দল কাঠের বোঝা ও মাছের ঝাঁকা মাথাতে ও কাঁধে করিয়া, বাঁকে দুগ্ধ লইয়া কেহ হাটের দিকে, কেহ বা ষ্টেশনের অভিমুখে চলিতেছে। মাঠের উপর নিশ্চিন্ত আরামে সুপুষ্ট গাভীগুলি ইচ্ছাসুখে বিচরণ করিতে থাকে, প্রতি চলনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গল-ঘণ্টার মৃদু-মধুর রব শুনা যায়; রাখাল-ছেলেরা গাছের ডালে দড়ী টাঙ্গাইয়া ঝুল খেলে, কখনও বা বাঁশের বাঁশীতে ফুঁ দিয়া, কখনও বা শুধু গলায় গাহিয়া উঠে,—

"আর কি সময় নাহি রসময় বাজাতে মোহন বাঁশী।"

আবার সন্ধ্যার সময়েও আর এক নূতন দৃশ্য! শূন্য পসরা মাথায় লইয়া দলে দলে পসারিণীরা শ্লথ-মন্দগতিতে ঘরের পানে ফিরিয়া চলিয়াছে; তাহাদের রূপার তাবিজের, কাঁসার পৈঁছের জলুষের উপর অস্তগামী সূর্য্য-কিরণ ঝিলিক দিয়া উঠিতেছে; তাহাদের সুখ-দুঃখের আলোচনার গুঞ্জনে পথ মুখরিত। মাঠের উপর দিয়া সারি বাঁধিয়া গোরুগুলি গোষ্ঠের অভিমুখে চলা আরম্ভ করিয়াছে। প্রকাণ্ড শিংওয়ালা সব চেয়ে বড় গোরুটার পিঠের উপর শুইয়া পড়িয়া, তাহার গলা জড়াইয়া গোয়ালার সব চেয়ে ছোট ৪ বছরের ছেলেটা আপন মনে আধ আধ স্বরে রাগিণী ভাঁজিতে ভাঁজিতে চলিয়াছে, ভয় বা ভ্রূক্ষেপ নাই,—

"তোলা দা' গো তবে আমাল দাওয়া হলো না—"

আর সেই নদীর উপকূল! স্তব্ধ শান্ত নির্ম্মলসলিলা নদী জননীর বক্ষের মত সুশীতল নীরধারা বিলাইবার জন্য প্রত্যেককে সস্নেহে আহ্বান করিতেছেন! কে তাপিত আছ, এসো, এসো,—কে তৃষিত আছ, ওগো এস,—কে কোথায় ব্যথিত আছ, আহা, সে-ও এস,—ওগো, সকলেই তোমরা আমার এই শান্তিময় শীতল বক্ষের সংস্পর্শ লাভ করিয়া যদি এমনই শান্ত, এমনই শীতল হইতে চাও, তবে আমার সঙ্গে এসো,—এসো—এসো। এস গো!

মনে পড়ে, ঐ নদীর বক্ষে কত ছুটীর দিনের আনন্দ-সন্তরণ। উহারই তীরে পড়িয়া কত কাদা মাথামাথি, সঙ্গিদলের প্রত্যেককে ধরিয়া ধরিয়া তেমনই করিয়া কাদা মাখানো, তীর বা বালুকার মধ্য হইতে শামুক কুড়ানো, ঝিনুকভাঙ্গা সংগ্রহ, নদীর ধারের দত্তদের বাগান হইতে কাঁচা আম চুরি করিয়া লবণাভাবে তাহা অমনই কচমচিয়া খাওয়া! তাহার পর উন্মুক্ত সুবিস্তৃত মাঠের উপরে সে কি ছুটাছুটি,—খেলা, সে কি লুটাপুটি খাওয়া। হায় রে সুখের অতীত সাধের শৈশব! তোকে ফিরাইয়া

আনিবার—তোর কাছে ফিরিবার কোন পথই যে বিধাতা মানুষের জন্ত সৃষ্টি করেন নাই; তাই কি তোর স্মৃতি অত মধুর হইয়া মানুষের সমুদায় হৃদয়-মনকে ব্যাপ্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া থাকে? ওরে আমার শৈশব, কৈশোর-জীবন, ওরে আমার সোনার অতীত! আর একটিবারের জন্যও যদি তোকে একবার ফিরাইয়া আনা যাইত! আর একবাব তোকে ফিরিয়া পাইলে, এই জটিল, জটপাকানো, বিশৃঙ্খল জীবনটার উপর হইতে তাহার সকল বিশৃঙ্খলা—সমস্ত জটিলতার পাশ ছিঁড়িয়া খুলিয়া সামঞ্জস্য করিয়া লইয়া তাহাকে আর একবাব সোজাভাবে ফিরাইয়া লইয়া যাইত যাইত। আর তাহা হইলে, এই জীবনের এই উজ্জ্বল মধ্যাহ্নে, এই আশা-দীপ্ত যৌবনের মধ্যসীমায় এমন করিয়া হতাশার অনুতাপের আত্মগ্লানির আগুনে তাহাকে দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতে হইত না।

হা ভগবান্! কেন তোমার সকল নিয়মকে এমন করিয়া অখণ্ডনীয় করিয়া তুমি তৈয়ারী করিয়াছিলে? কেন অজস্র হাহাকারে, অফুরন্ত অশ্রুনির্ঝরেব ধারা ঢালিয়া দিয়া, বুকফাটা অনুতাপের মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদেও মানুষের কৃত কর্ম্মকে ফিরাইয়া আনা যায় না? কেন?—এ কি জগতের কঠোর নিয়ম! এ অবিচার, না সুবিচার? না—না—এই ত তোমার ন্যায়বিচার!

৪

বসন্তের এক পুষ্পামোদিত জ্যোৎস্নাভূষিত আনন্দোৎসব-সমারোহিত মধ্য-রাত্রিতে সদানন্দ দাসের সহিত বড়গাঁয়ের বাবুদের বাড়ীর মেজবাবুর মেজমেয়ে লাবণ্যলতার বিবাহ হইয়া গেল। সে কি আশ্চর্য্য—অভাবনীয় বিবাহ।

জমীদার বাবুদের এখন পড়তির মুখ, জ্ঞাতিগোষ্ঠীতে মিলিয়া তাঁহাদের এখন প্রায় এগার ঘর সরিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বংশ ত বৎসর বৎসর বৃদ্ধি পায়, কিন্তু জমী ত মাপা-জোকা, তাহার ত আর এতটুকুও "বাড়" নাই। বরং দিনে দিনে উর্ব্বরতা নষ্ট হইয়াই যায় ও বন্যা, অনাবৃষ্টি, কীটাধিক্য ইত্যাদিতে ফসল জন্মাইবার পক্ষে সহস্র বাধা উপস্থিত করে ; কাযেই চিরদিন পুরুষানুক্রমে বসিয়া খাওয়া চলে না ! মেজ তরফের সেজ বাবুকেই সেই বিরাট গোষ্ঠীর মধ্যে লোকে "দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ" আখ্যা দিয়াছিল ; কারণ, তিনি জমীদারগোষ্ঠীর হইলেও লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, এবং ঘরে বসিয়া জ্ঞাতিদের সহিত বিবাদ কি ভাবে আইন বাঁচাইয়া করা যায়, তাহারই অভিনব পন্থায় মাথা না ঘামাইয়া বাহিরে গিয়া দুই পয়সা বাড়াইবার চেষ্টায় নিরত থাকিতেন। সেই শৈলেশ্বরবাবুর চতুর্থী কন্যা লাবণ্যদেবীর সে দিন বিবাহ।

চৈত্রমাস, বসন্তের হিল্লোলে নবীন বৃক্ষপত্র মর্ম্মর করিতেছে, প্রস্ফুটিত আম্রমুকুলের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। কোকিল পাপিয়া দিগ্‌দিগন্ত ছাপাইয় ঝঙ্কার তুলিয়াছে। সেই কোকিল-কূজিত, ময়লানিল-বিকম্পিত, বসন্তপুষ্প-পরিমলাকুল প্রকৃতির মধ্যে দুইটি হৃদয়ের পরস্পর বিনিময়। কি সুখের পুলকে তরুণ চিত্ত দু'টি স্পন্দিত হইতে থাকে! কি গভীর গূঢ় হৃদয়ভারে চিত্ত দু'টি অবনত হইয়া পরস্পরাশ্রয়ী হইতে চাহে!

কিন্তু এ বিবাহ ত সে বিবাহ নয়। লাবণ্যদেবীর বয়স পূর্ণ চতুর্দ্দশ, তিনি পিতার কর্ম্মস্থলে থাকা কালে সেখানকার বালিকা-বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিতেন। বিদ্যা তাহাতে যত বেশী দূর অগ্রসর হৌক বা না-ই হৌক, আধুনিক কেতাদুরস্ত ভাবটা ঠিকই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। সেমিজ, পেটিকোট, বডি, জ্যাকেট সর্ব্বদাই তাঁহার পরিয়া থাকা অভ্যাস,

পায়ে চটি-জুতা তাঁহাকে রাখিতেই হয়, না হইলে সর্দ্দি হয় ও পায়ে হাজা ধরে। শাড়ীখানি হাল ফ্যাসানে পরিয়া ঠিক কেমন ভাবে ব্রোচটি আঁটিলে মানায়, ডানদিকে বা বাঁদিকে সঁাথি কাটিয়া কি ভাবে চুলগুলিকে সাজাইলে সামনে ভাল দেখায়, খোঁপাটি কতখানি উঁচু করিয়া বাঁধিলে চুলগুলি বেশী বলিয়া বোধ হয়, সে সকল বিষয়েই এই মেয়েটির যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞান জন্মিয়াছিল। অগত্যাই তাহাকে শিক্ষিতা মহিলা বলিতে পারা যায়। সেই মেয়ের উপযুক্ত বর অনেক খুঁজিয়া মিলিয়াছিল। ছেলেটি মেডিকেল কলেজের পাশ করা ডাক্তার, ছেলের বাপও বেশ অবস্থাপন্ন লোক, বাড়ী তাঁহাদের রাজসাহী জেলায়। বিবাহ দিতে এত দূর যে আসিয়াছিলেন, সে কেবল ধনী কুটুম্বের টাকায় পথখরচ করিতে পারিবেন বলিয়া। বিবাহের লগ্ন একটু বেশী রাত্রিতে, কিন্তু লগ্ন আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল।

পণের টাকা দেখিয়া বরের বাপ চটিয়া উঠিলেন, "না মশাই, অত কমে হ'বে না, তা' ব'লে দিচ্চি। দূর কি কম? পথের কষ্টটা কি সোজা দিলেন! তা'র পর মেয়েও যতটা সুন্দর ব'লে শুনেছিলুম, দেখছি তাও নয়। আপনারা সহুরে লোক, রং মাখিয়ে মেয়ে দেখান, সে ত এক রকম জোচ্চুরি! ও হাজার টাকা নগদের কর্ম্ম নয়, আরও হাজার টাকা আমার চাই।"

কন্যাকর্ত্তা এই কথায় রাগে আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "জোচ্চোর কে, তা' এই আপনার কাযেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। যে কথা হয়ে গেছে, তা'র উপর আমি একটা পয়সাও বা'র করবো না, তা'তে না হয় না হ'বে আমার মেয়ের বিয়ে।"

মধ্যস্থগণ দর কষাকষি করিয়া বরের বাপকে ৫শত টাকায় রাজী করিল, কিন্তু ক'নের বাপকে কিছুতেই তাহারা তুলিতে পারিল না। অগত্যা

সবাই হাল ছাড়িয়া দিল। তখন বর নিজে উঠিয়া আসিয়া ভাবী শ্বশুরের কাছে দাঁড়াইল, বিনীত বাক্যে কহিল, "বাবার কথায় কিছু মনে করবেন না; টাকা এখন দিয়েই দিন, আমি না হয় পরে ওটা আপনাকে ফেরত দেব।"

মেয়ের বাপ উত্তর দিলেন, "যদি দিই ত আমি তা' আর ফেরত নেব না, কিন্তু আমি দেব না!"

বর বলিল, "তা' হ'লে আর কোন উপায় নেই; আমার বাপকে ত আর আমি চটাতে পারিনে।"

বরকর্ত্তা সদলবলে বাহির হইয়া গেলেন। গ্রামান্তরে এক ধনী কন্যার পিতা পথে তাঁহাকে বিস্তর টাকার লোভ দেখাইয়াছিল, সেই জন্যই তাঁহার মনটা হঠাৎ উঁহাদের উপর বাঁকিয়া উঠে।

যাহা হোক, তাহার পর সেই রাত্রিতেই ত আবার একজন বর চাই। মেয়ের বাপের গা-গোছ নাই দেখিয়া প্রধান প্রধান জ্ঞাতিরা আসিয়া অশেষবিশেষে ভয় দেখাইতে লাগিল। সমাজরীতি রক্ষার জন্য ইহা না হইলে ক'নের বাপকে একঘরে করা হইবে ইত্যাদি বলিয়া নিজেরাই চারিদিকে বর খুঁজিতে লোক পাঠাইল। এই এমনই করিয়াই দরিদ্র বিধবার প্রবেশিকা-পাশকরা ছেলে শৈলেশ্বরবাবুর জামাই হইল। এমন ঘোরফের না করিলে ত আর এ ব্যাপারটি ঘটে না, তাই বিধাতাকে ঐ রকম করিয়া এই খেলাটুকু খেলিতে হইয়াছিল।

সদানন্দকে দেখিতে ভাল, স্বভাবটিও তাহার পাঁচ জনের কাছে সার্টিফিকেট পাওয়ার মত। বিদ্যা ও ধন এই দুইটিই সে পরিমাণে বড় কম। তা' বলিয়া আর করা যায় কি? বিদ্যার জন্য এখনও যথেষ্ট অবসর পড়িয়া আছে, এই ত সবে তাহার সতের আঠারো বৎসর বয়স-মাত্র! আর বিদ্যা হইলেই ধনও হইবে। যাহা হোক, বিবাহ হইয়া গেল।

প্রথম এই অসম্ভাবিত বিবাহের ফলে মাতাপুত্র উভয়েই আপনাদিগকে অতিরিক্ত সৌভাগ্যবান্ বোধ করিয়া আনন্দে ও গর্ব্বে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু এইখানেই তাহার জীবনেব দুঃখ-অমানিশার আরম্ভ হইল। বড়লোকের মেয়ে পুত্রবধূ শাশুড়ীর সঙ্গে একেবারেই বনাইতে পারিল না। মা গো! কি কুৎসিত চেহারা! প্রণাম করতে ঘেন্না করে যেন! যেমন জঘন্য রান্না-বান্না, আর তেমনই হাজা-ধরা হাতের পরিবেশন, খেতে যেন বমি উঠে আসে। মাটীর ঘরে চলতে পা পিছলাইয়া যায়, দাওয়ার বাতা মাথায় ঠেকে, পুকুরে নামিলে পায়ে জোঁক ধরিবার ভয়, রাত্রিতে সারারাত্রি কানের পাশে শিয়ালের ডাক, আর থাওয়া-দাওয়ারও তেমনই কষ্ট! সব চেয়ে কষ্ট—জামা, সেমিজ, পেটিকোটপরা বিবি-বউ দেখিবার জন্য দেশের লোকের হুড়াহুড়ি। গ্রামবৃদ্ধারা অনেকেই তাহার শাশুড়ীর হাতের জল খাওয়া ছাড়িয়া দিল; কারণ, বধূ তাহার নিশ্চয় খৃষ্টানী, না হইলে ঘাগরা পরিয়া বেড়ায় কেন? যুবতী বালিকারা দলে দলে আসিয়া তাহার পোষাকের রহস্য ভেদ করিয়া লইতে চায়, তাহার বাঁকা সীঁথায় সিন্দূর দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে থাকে; বধূ গির্জ্জায় যায় কি না, তাহারা এ কথাও জিজ্ঞাসা করিয়া বসে। লাবণ্য মায়ের কাছে গিয়া কান্দিয়া ফেলে, "আমায় অমন ক'রে হাত-পা বেঁধে জলেই যদি ফেলে দেবে, তা'লে আমায় অমন ভাবে মানুষ করেছিলে কেন? অত দুর্দ্দশা—অত অপমান আমার সহ্য হয় না, আমি সেখানে আর যাবো না।"

দুই বৎসর সদানন্দ কলিকাতার মেসে থাকিয়া আই-এ পড়িল; দুই বৎসর বধূ পল্লীগ্রামের মুখ দেখিল না; কিন্তু ছুটীর সময় তাহার বার-কয়েক স্বামিসন্দর্শন ঘটিল। স্বামীর সুরূপ মূর্ত্তি, বাধ্য বিনীত ভাব লাবণ্যের নেহাইত অসহ্য বোধ হইত না; কিন্তু যখনই সে তাহার মায়ের কথা পাড়িত, পরীক্ষাশেষে তাহাকে লইয়া বাড়ী যাইবার কথা তুলিত,

তখনই লাবণ্যের পতিভক্তি একেবারে উড়িয়া যাইত। তাহার মনে হইত, জেলখানাও বুঝি তাহার স্বামিগৃহের তুলনায় শ্রেষ্ঠ!

তবু দুই চারি দিনের জন্যও দুই একবার করিয়া যাইতে হইল। বিবাহের দুই বৎসর পরেই তাহার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহারই অন্নপ্রাশন উপলক্ষে একবার যাওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। আর একবার যাইতে হইল—শাশুড়ীর ব্রত উদ্‌যাপনে। সেই বার ফিরিয়া আসিয়া সে এমনই কোট ধরিল যে, আর কেহ কোন দিন তাহাকে পিত্রালয় হইতে নড়াইতে পারিল না। শাশুড়ী সে বার গোটাকত কঠিন কথার বাণ ছুঁড়িয়াছিলেন, তাই কান্দিয়া রাগিয়া সে শপথ করিয়া বসিল যে, অমন শাশুড়ীর মুখ সে আর কখন দেখিবে না।

সদানন্দ বার বার তিন বার আই-এ পরীক্ষায় ফেল করিয়া এ পর্য্যন্ত বেকার বসিয়া আছে। কখন নিজের ঘরে, কখন শ্বশুরবাড়ীতেই খাইয়া শুইয়া কোনমতে সে আলস্যে দিনগুলাকে কাটাইয়া দেয়। আর বেশীর ভাগটাই যে শ্বশুরের দ্বারে সে অমন করিয়া নির্লজ্জভাবে পড়িয়া থাকে, তাহার প্রধান কারণ ঐ তা'র ছেলে। ঐ ছেলেটিই যেন তাহার জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা, একটিমাত্র সুখ, তাহার জীবনের ধ্রুবতারা! ঐ ছেলেটিকে বুকে চাপিয়া, তাহার কচিমুখে চুমা খাইয়া সে নিজের স্ত্রীর সকল অবহেলাই অনায়াসে সহিয়া যাইত। এমন কি, মা'র কথাও সব সময় তা'র এখন আর মনে পড়িত না। পড়িলেও নিঃসঙ্গ মা'র দুঃখ বিস্মৃত হইয়াও সে নিজের সুখে তন্ময় হইয়া থাকিত। দুলালকে ছাড়িয়া সে কেমন করিয়া দূরে থাকিবে? অথচ সেই দুলালকে—তাহারই বুকের রক্ত, দেহের অংশ আপনার সন্তানকে সে তা'র নিজের ঘরে লইয়া যাইতে পারে, এমন সামর্থ্য তাহার নাই। তাহার সে সাধ্য কোথায়? যেহেতু, সে গরীব আর দুলাল ধনীর দৌহিত্র!

লাবণ্য কোন দিনই তাহার গরীব স্বামীকে তেমন করিয়া ভালবাসিতে পারে নাই। বিশেষতঃ নিজের বিবাহের কথা মনে পড়িলেই তাহার বুকের মধ্যে একটা অনিঃশেষিত যন্ত্রণার তরঙ্গ বহিয়া যাইত। তেমন বিড়ম্বনার পাকে জড়াইয়া পড়িয়া তাহাকে এই অভাগা দরিদ্রের গলায় না পড়িতে হইলে ত আর তাহার এ দুরবস্থা ঘটিত না। সে-ও তাহার দিদিদের মত সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাইয়া দিতে পাইত। হয় ত এত দিনে তাহার সুখের সংসারে দাসদাসী, সোফার, সরকার গিস্‌গিস্‌ করিতে থাকিত। বারো মাস বাপের বাড়ী পড়িয়া থাকায় কখন মানুষের ইজ্জত থাকে?

এক দিন সেই কথাই সে স্বামীর কাছে বলিয়া ফেলিল; দুঃখ করিয়া কান্দিয়া বলিল, "আমার মতন পোড়া কপাল ক'রে কেউ যেন জন্মায় না। বিয়ে হয়ে ক'দিন আমি স্বামীর ভাত খেলুম! এখন বয়েস হচ্ছে, সব কথায় কি মা-বাপের কাছে হাত পাতা যায়? একটা এমন পয়সা থাকে না যে, আপনা হ'তে খরচ করি।"

শুনিয়া সদানন্দর বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিল। স্ত্রীকে সে ভয় করিত বটে, কিন্তু মনে মনে তাহাকে সে কি কম ভালবাসিত! তবে যে অমন চুপটি করিয়া একধারে আড়ষ্ট হইয়া থাকিত, সে শুধু সঙ্কোচে। গরীব সে, অক্ষম সে, স্ত্রীকে আদর দেখাইতে যাইবে সে কিসের ভরসায়? এই যে এত দিন বিবাহ হইয়াছে, এক ভরি সোনা কি স্ত্রীর গায়ে দিতে পারিয়াছে? আজ এই অনুযোগে একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া ধীরে ধীরে সে উত্তর করিল, "তোমরা আমড়াতলীতে চলো না, সেখানে থাক্‌লে তবু মোটা ভাতটা আমাদের চ'লে যায়, আর—"

কথাটা শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার আর ধৈর্য্য না রাখিয়াই উত্তেজিত কণ্ঠে লাবণ্য ঝঙ্কার করিয়া উঠিল—"থামো বাপু, তুমি আর কাটাঘায়ে নুণের ছিটে দিও না। সেই মোটা ভাত খাবার মত প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা ভগবান্‌

আমাকে দিয়ে পাঠান নি। তোমার যদি তা' অতই মিষ্টি লাগে, তা' হ'লে কিসের লোভে দিনের পর দিন ধ'রে এই শ্বশুরবাড়ীর বালাম চা'ল খাবার জন্যে ভিকিরীর মত প'ড়ে আছ, শুনি? তোমার এতে লজ্জা করে না? তোমার যদি লজ্জাই থাকবে, তা' হ'লে শ্বশুরের পয়সায় পড়ে' তিন তিন বার ফেল হও? আর কোন কিছু না ক'রে দিব্যি আরামে শ্বশুরের ঘাড়ে ব'সে থাক? কিন্তু তোমার এই নির্লজ্জতায় আমার গলায় দড়ী দিতে ইচ্ছে করে। কোন দিন না কোন দিন আমায় হয় ত দিতেও হ'বে তাই!"

৬

সেই হইতে সদানন্দ শ্বশুরবাড়ীর বাস ছাড়িল, কিন্তু সে কলিকাতাকে কোনমতেই ছাড়িতে পারিল না। প্রথম কয়দিন সে অনবরত দিন নাই, রাত্রি নাই, ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটি চাকরী যোগাড় করিল। এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সংসারে তিনটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে পড়াইবার চাকরী। বলিয়া কহিয়া খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করিল। মাহিনা সে জন্য মোটে পাঁচটি টাকা ধার্য্য হইল। তাহার মনে হইল, তাহার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। তবু ত প্রত্যহ একবার করিয়া দুলালকে সে দেখিতে যাইতে পারিবে।

প্রথম দিনেই একটি টাকা চাহিয়া লইয়া সদানন্দ এক শিশি লজঞ্চুস কিনিয়া লইল। হাসিমুখে দুলাল আসিয়া শিশিটি যখন দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বাপের দিকে চাহিয়া মধুর স্বরে বলিল, "আমার বাবা কত লক্ষ্মী, আমায় অতুলের, প্রতুলের বাবার মত লজঞ্চুস এনে দিয়েছে! মা, তুমি আমার বাবাকে আর বকো না যেন। বাবা রাগ ক'রে যদি আবার চ'লে

যায়!" সদানন্দর চোখে তখন অশ্রু যেন আর চাপা থাকিতে চাহিতেছিল না। ছেলেকে সে দুই হাতে বুকে সাপটাইয়া ধরিয়া ঘন ঘন চুম্বনে নিজের সেই অদম্য অশ্রুপ্রবাহকে কোন মতে প্রশমিত করিয়া লইল।

একটু পরে ছেলে খেলিতে গেলে লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "পয়সা কোথা পেলে, কোন চাকরী-বাকরী জোগাড় করেছ না কি?"

সদানন্দ স্ত্রার সহিত একা হইতেই ঈষৎ সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। এখন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াই সে যেন চমকিয়া উঠিল। কিন্তু নিরুত্তরে থাকিতেও তা'র ভরসা হইল না। একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া সে মৃদু কণ্ঠে উত্তর করিল—"হ্যাঁ।"

লাবণ্য ঈষৎ প্রসন্নমুখে কহিল, "তা' ভালই হয়েছে। পুরুষ বেটাছেলের কি খালি ব'সে ব'সে পরের অন্ন ধ্বংস করতে আছে! একটা কিছু চেষ্টা করতেই হয়। তা' কি রকম হলো? কাযটা কি শুনি?"

"তিনটি ছোট ছেলেমেয়েকে পড়াতে হবে।"

"মাইনে কত?"

এইবার সদানন্দর বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। মাহিনার কথা শুনিয়া যে লাবণ্য খুসী হইবে না, তাহা সে জানিত। ভয়ে ভয়ে একটু ঘুরাইয়া সে বলিল, "তা'দেব বাড়ীতেই থাক্‌তে হ'বে, খাওয়ার ব্যবস্থাও সেখানেই করেছি।"

লাবণ্য মুখটা ঘুরাইয়া সবিদ্রূপ হাস্যে কহিল, "সে ত ভাল কথাই। শ্বশুরের ভাতটা না হয় বেঁচেই যা'বে। তা' মাইনেটা কত পাবে, না হয় সেটা শুনিই না, কেড়ে ত আর নিতে যাচ্ছিনে।"

সদানন্দ একটুখানি কাসিয়া একনিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "পাঁচ টাকা দিতে চায়, তা'র বেশীতে উঠলো না।"

গায়ের উপর জ্বলন্ত আগুনের ফিন্‌কী উড়িয়া পড়িলে মানুষ যেমন

চম্‌কাইয়া উঠে, তেমনই করিয়া বিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিয়া লাবণ্য দুই নেত্র বিস্ফারিত করিয়া স্বামীর পানে চাহিল। তাহার পর দেখিতে দেখিতে গভীর অবজ্ঞায় ও ঘৃণায় তাহার ললাট যেন অন্ধকার হইয়া আসিল। ক্ষণকাল বাক্যহীন স্তব্ধ থাকিয়া শেষে রোষে, ক্ষোভে, রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে সে সবেগে বলিয়া উঠিল, "খুব লোকের হাতে পড়েছিলুম! আমার বাপের বাড়ীর একটা চাকরেরও যে এর চেয়ে মাইনে বেশী! ছি ছি, একগাছা দড়ী জোটে না!"

বলিতে বলিতে কান্দিয়া ফেলিয়া রাঙ্গামুখে সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। আর হতভম্ব সদানন্দ সেইখানে পাতর হইয়া জমিয়া গিয়া বসিয়া রহিল।

৭

একবার সদানন্দ মনে করিল, এই ঘৃণিত চাকরী না হয় ছাড়িয়া দিবে। তাহার পরই তাহার মনে পড়িল যে, আজ প্রথম দিনই সে তাঁহাদের কাছে একটি টাকা চাহিয়া লইয়াছে! এখন যদি সেখানে ফিরিয়া না যায়, তবে তাঁহারা তাহাকে জুয়াচ্চোর বলিয়া মনে করিবেন। যাইতেই হইবে।

ছেলে আসিয়া চাপিয়া ধরিল, "হ্যাঁ, লজঞ্জুস দিয়ে চুপিচুপি পালিয়ে যাওয়া হচ্ছে! কক্ষনো যেতে দোব না, তা হ'বে না। এস।"

লাবণ্যের ঝি আসিয়া বলিল, "দিদিমণি বল্লে, শীগ্‌গির ক'রে পোষাক প'রে পার্কে বেড়াতে চলো, চব্বিশ ঘণ্টা ঘরে পোরা থাক্‌লে শরীর খারাপ করবে। দেখুন, জামাইবাবু! ওকে অমন ক'রে ধ'রে রাখ্‌বেন না—ছেড়ে দিন দেখি! দিদিমণি রাগ করবে।"

দুলাল বাপকে সবলে জড়াইয়া থাকিয়া ঝিয়ের উদ্দেশে তর্জ্জন করিয়া

উঠিল, "ধ্যেৎ, আমি বেড়াতে যাবো না, বাবার কাছে থাকবো, মা রাগ করুক গে।"

"বটে! এই যাচ্ছি আমি মা'র কাছে। মা যখন আস্‌বে, তখন সব ভিরকুটি বা'র করবে।"

"যা' না, এক্ষুণি যা', মা এসে আমার কি করবে? বাবা আমায় যেতে দেবে না, দেখিস্ তুই—"

"মা এসে কি করবে', দেখ তা' হ'লে!" ছেলের পিঠে গুম্-গুম্ করিয়া গোটা দুই তিন কিল বসাইয়া দিয়া তাহাকে কঠিন হস্তে টানিয়া লইতে লইতে ক্রুদ্ধ বক্রকণ্ঠে নির্ম্মম বিদ্রূপে লাবণ্য স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "ভাল কবতে পারি না মন্দ করতে পারি—কি দিবি তাই বল্, সেই যে কথায় বলে, তোমার হয়েছে ঠিক তাই! করবার ত কিছুরই যোগ্যতা নেই, শুধু শুধু ছেলেটাকে বিগড়ে দেবার চেষ্টা করা কেন? ওর ত আর তোমার মত বেকাব হয়ে ব'সে থেকে দিন কাটানো চলবে না, মানুষ ত হ'তে হ'বে। নিজে ত ঐ হয়েছ, ওটাকেও কি নিজের মত কর্‌তে চাও? তার চেয়ে ও ওব মামাদের কাছেই মানুষ হোক, তোমার আর ওকে এসে এসে দেখা দিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলার দরকাব নেই!"

বিচারক জজেব মত এই দণ্ডাদেশ প্রদান করিয়াই ক্রন্দনপবায়ণ বালককে তাহার একান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কঠিন হস্তে টানিয়া লইয়া ক্রুদ্ধা ক্ষুব্ধা অবমানিতা স্ত্রী তাহার সকল দুর্ভাগ্যের মূল মূঢ় স্বামীকে অধিকতর বিমূঢ় করিয়া দিয়া ঝড়ের মতই চলিয়া গেল। সদানন্দর মনে হইল, যেন তাহার ফাঁসির হুকুম হইয়া গেল। এবং সেই ফাঁসির দড়ী তাহার গলায় পরানোও হইয়া গিয়াছে।

৮

তবু সদানন্দর দিন কাটিত! বড় অসহ্য হইলে যখন আর নিতান্তই থাকিতে পারিত না, এই বাড়ীটার আশেপাশে একবার উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া যাইত; কোন দিন পার্কের ধারে গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া ছেলেটিকে দেখিতে চেষ্টা করিত। কোন দিন দুলালের একটু গলার সাড়া তাহার কাণে ঢুকিত, কোন দিন তাহার ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটি বারেকের জন্য হয় ত চোখে ঠেকিত। সব দিন তাহাও ঘটিত না; তথাপি সেইটুকুই ছিল তাহার জীবনের সান্ত্বনা।

মাসকাবারে চারিটি টাকা দিয়া সদানন্দ দুলালের জন্য ছবির বই কিনিল, খানকতক জলছবি, একটি রবারের বল, এবং আরও কয়েকটি খেলনা ও লজঞ্জুস কিনিয়া লইয়া সে দিন পার্কে গিয়া সেগুলি দুলালের হাতে দিয়া আসিল। দুলাল প্রথমে কোনমতেই বাপের কাছে আসিবে না,—তাহার দেওয়া ঐ অতি সখের জিনিষপত্রের দিকে সে একবার তাহার নীচুকরা চোখ'দুটা তুলিয়া চাহিয়াও দেখিল না,—ঝি-এর কাপড় শক্ত করিয়া ধরিয়া সে গম্ভীর মুখে ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বালকের এই গভীর অভিমানের ব্যথা পিতার আহত হৃদয়কে যেন শতধা করিয়া দিতেছিল। সে তখন আর যেন নিজের উদ্বেলিত অন্তরের উছলাইয়া-পড়া অশ্রুপ্রবাহকে শত চেষ্টা করিয়াও রুদ্ধ রাখিতে পারিতেছিল না। শিশুর মত হা হা করিয়া কান্দিয়া উঠিয়া একেবারে বুকের ভিতরে সে ছেলেকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া দুই হাতে সবলে চাপিয়া ধরিল।

"দুল্ দুলু! মাণিক আমার! চেয়ে দেখ, কথা ক';—একটা কথা ক'—এম্‌নি হতভাগা বাপ তোর আমি—"

পিতাকে কাঁদিতে দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গিয়া দুলাল পিতার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে তাহার নিজের চোখ দিয়াও জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পর যেই তাহার বাপ "ছিঃ, কেঁদো না"—বলিয়া অশ্রুসিক্ত গণ্ডে চুম্বন দান করিল, অমনই সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া বাপের বুকের ভিতর মুখ গুঁজিল এবং তেমনই করিয়াই বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। পিতাও নিজের চোখের জল মুছিবার অশেষবিধ চেষ্টা করিতে কৰিতে নিঃশব্দে হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহার পর কত করিয়াই পিতাপুত্র দুই জনে শান্ত হইল। অবশেষে বাপের আদরে আদরে ছেলে তাহার মনের মধ্যের দুর্জ্জয় অভিমানব্যথা ভুলিয়া আসিল। সেই অপূর্ব্ব উপহার-সম্ভার তখন সাগ্রহে গৃহীত হইল। তাহাদের এই মিলনদৃশ্য দেখিতে যে সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাহাদের চারিদিকে জড় হইয়াছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া দুলাল সহর্ষে তাহার ধন-সম্পত্তিগুলি দেখাইতে লাগিয়া গেল। মুরলা, বেলা, চুনী, দোপাটি সবাই মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিল, তাহাদের বাবার চাইতে দুলুর বাবাই লক্ষ্মীছেলে, সে দুলুকে অনেক জিনিষ দিয়াছে।

সে দিন অনেক কষ্টে ছেলেকে ছাড়িয়া ফিরিবার সময় সদানন্দ মনের মধ্যে একটা নিদারুণ শূন্যতা অনুভব করিতে লাগিল। ইহার পর দুই চারি দিন সে যেন কোন কাযেই মন দিতে পারিল না; স্নানাহার পর্য্যন্ত তাহার এক রকম বন্ধ হইয়া গেল; কেবল উন্মনা হইয়া ছেলের কথাই সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। এতক্ষণ সে কি করিতেছে? বাড়ী গিয়া কান্নাকাটি করিয়া তাহার মা'কে বিরক্ত করিয়াছিল কি না? ছেলের কান্নার কথা মনে করিতেই তাহার নিজের চোখের জল আর চাপা থাকিল না। দুই দিন পরে সে আবার পার্কে গিয়া ছেলের সঙ্গে

দেখা করিল। দুলাল এ দিন হাস্যোজ্জ্বল মুখে বাপের কাছে ছুটিয়া আসিল।

কিন্তু এ সুখটুকুও সদানন্দর ভাগ্যে বেশী দিন সহিল না। দেশ হইতে খবর আসিল, জননী মৃত্যুশয্যায়। সদানন্দ বাড়ী গেল, যাইবার পূর্ব্বে একবার স্ত্রীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল। লাবণ্য বলিল, "বল কি তুমি! এই বর্ষাকালে সেই মেটে বাড়ীতে দুলালকে নিয়ে গেলে ওকে কি আর ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌ব? আর ওকে ফেলে ত আমার যাওয়া হয় না! তুমি ত যাচ্ছোই, তা' হ'লেই হ'বে।"

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সদানন্দ একাই বাড়ী গেল। মা বলিলেন, "হাঁ রে, মরবার সময় একবার আমার দুলালকে আমি দেখ্‌তে পাবো না রে?"

কাতর কণ্ঠে সদানন্দ উত্তর দিল, "তোমার দুলাল আর কৈ মা! তোমার হ'লে তুমি দেখতে পেতে, সে যে মা বড়লোকের নাতি।"

দুই মাসাধিক কাল রোগ ভুগিয়া সদানন্দর মা তাঁহার একমাত্র সন্তানের অকৃত্রিম সেবা লইয়া চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিলেন। মায়ের রোগে ও শ্রাদ্ধে সদানন্দের জোতজমী, কুটীর কয়খানি সমস্তই বাঁধা পড়িল।

কলিকাতায় ফিরিয়া দেখা গেল, চাকরীতে অন্য লোক বাহাল হইয়াছে। এ মাষ্টার বেশী যত্ন লইয়া পড়ায়। গৃহস্বামী সদানন্দর পাওনা দুইটি টাকা তাহাকে দিয়া দিলেন। সে আবার শ্বশুরালয়ের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বেশী দিন সেখানেও আর তাহার পোষাইল না; এক দিন লাবণ্যের শ্রুতিদগ্ধকারী অনেকগুলি অত্যন্ত কটুবাক্যে নিতান্তই অপমানিত বোধ করিয়া লজ্জারক্তিম মুখে সদানন্দ বাড়ীর বাহির হইয়া আসিল, কঠিন শপথ করিয়া সে সে দিন বলিয়া আসিল, যদি কখন পয়সা হয়, তবেই আবার সে মুখ দেখাইবে, নতুবা তাহার এই শেষ!

শুনিয়া লাবণ্য উত্তর দিল যে, সে-ও তাই চায়! সদানন্দ তাহার এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

এই ঘটনার দেড় বৎসর পরে এক দিন এক সন্ধ্যাকালে সদানন্দ আসিয়া আড়াই হাজার টাকার নোটের একটা তাড়া তাহার স্ত্রীর পায়ের গোড়ায় ফেলিয়া দিল, এবং এক জোড়া অতি উজ্জ্বল চুণির ও মতির বালা স্ত্রীর হাতে দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এইতে হ'বে? না আর কিছু চাই?"

সদানন্দর মুখ অত্যন্ত পাণ্ডুর; কিন্তু সেই বিবর্ণ মুখে চোখ দুইটা তাহার অস্বাভাবিক তেজে যেন মোটরের আলোর মত দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছিল। সে যে স্বরে কথা কহিল, তাহা যেন মানুষের গলার স্বর বলিয়া মনে হইল না, যেন কাঠের পুতুলের মুখ দিয়া কোন দৈববলে একটা প্রাণহীন শব্দ বাহির হইতেছে। তাহাকে কেহ তখন যদি স্পর্শ করিয়া দেখিত ত দেখিতে পাইত, তাহার সমস্ত শরীরটাও যেন অমনই পাতরের বা কাঠের মত শক্ত হইয়া গিয়াছিল। দেহে যেন তাহার প্রাণ নাই!

লাবণ্য বিস্ময়ে চমকিত ও আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল। সে ব্যগ্রভাবে টাকাগুলা মাটীর উপব হইতে তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইয়া মাথায় ঠেকাইল, দুই একখান উল্টাইয়া দেখিল, সবই মোটা অঙ্কেব আঁক কাটা কাটা নোট। বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গিয়া সে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল; অত্যন্ত আশ্চর্য্যের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এত টাকা কোথায় পেলে?"

সদানন্দ মাথা হেঁট করিয়া ভারী মুখে জবাব দিল, "সে কথা তোমার কেন? তুমি টাকা চেয়েছ, এনে দিয়েছি। আরও চাও ত তা'ও পাবে; এখন বোধ হয়, দুলালকে তাহার বাপ একটুখানি আদর কর্‌বার যুগ্যি হয়েছে?"

যেন আকাশ হইতেই বা খসিয়া পড়িয়াছে, এমনই ধারা ভাব করিয়া অধিকতর আশ্চর্য্যের স্বরেই লাবণ্য কহিয়া উঠিল, "ও মা, কথার শ্রী দেখ! তোমার ছেলে, তুমি তা'কে আদর করবে, তা'র আবার 'যুগ্যি' 'অযুগ্যি' কি? বসো তুমি, আমি আস্‌ছি। ততক্ষণ একটু জিরিয়ে নাও, জলখাবার, পান-টান নিয়ে আসি গে।"

এই বলিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসিয়া লাবণ্য তাড়াতাড়ি মা'র কাছে গেল। হাতে তাহার সেই নোটের তাড়া ও জড়োয়া বালাজোড়া।

মেয়ের মুখ অদৃষ্টপূর্ব্ব আনন্দের আভায় সমুজ্জ্বল দেখিয়া মা একটু বিস্মিত স্বরে কহিলেন, "সদানন্দ এসেছে নাকি শুনলুম?"

মেয়ে সে প্রশ্নের উত্তরে এক মুখ আনন্দের হাসি হাসিয়া বলিল, "এই আড়াই হাজার টাকাটা, মা, তুমি বাবাকে দিয়ে রাখ, কালই যেন খোকার নামে ব্যাঙ্কে জমা ক'রে দেন।" এই বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া মা'র হাতে নোটের তাড়াটা চালান করিয়া দিল।

লাবণ্যের মেজদিদি পুণ্যলতাও সেখানে ছিল, লাবণ্যের হাতে বালা দেখিয়া তাড়াতাড়ি সেটা টানিয়া লইয়া দেখিতে দেখিতে প্রশংসাসূচক স্বরে কহিয়া উঠিল, "খাসা বালা দিয়েছে ত! দেখলি ত লাবি, অত তাচ্ছীল্য করতিস্! সবেরই একটা সময় আসে। খোকার জন্যে কি আনলে রে?"

লাবণ্য কহিল, "তা' এখনও দেখিনি, আমায় জিজ্ঞেস করছিল, 'তোমার আর কি চাই বল?'—"

"তা তুই কি চাইলি?"

"এখনও বলিনি কিছু, ইচ্ছা আছে, একটা চুণি-মুক্তোর নেকলেশ আর দুটো হীরের ইয়ারিং চাইবো।"

মা কহিলেন, "জামাই বুঝি কোন ব্যবসা করছে? না হ'লে এর ভিতর এত টাকা জমালে কি ক'রে?"

লাবণ্য উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "ক্ষমতা ত আছে, মা, মনই ছিল না। এখন সেইটে হয়েছে বলেই—যাই, একটু জল-টল খেতে দিই গে।"

মা কহিলেন, 'হ্যাঁ, যাও, তাই দাও গে, ঝিকে বলো, ভাল খাবার আট আনার এনে দিক, তা'র কমে কি পেট ভরে।"

রাত্রি-ভোজনের পরই সদানন্দ স্ত্রীকে বলিল, "আজ তা' হ'লে চল্লুম, আবার কিছু হাতে হ'লেই আসবো'খন। দুলালকে কা'ল এসে পারি ত একবার দেখে যাব।" এই বলিয়া সে গমনোদ্যত হইল।

লাবণ্য এই কথায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেল। যে লোক এতটুকু একটু আদরের জন্য লালায়িত ছিল, সে আজ তাহার এত যত্ন-আদর, প্রেমসম্ভাষণ উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত! এ ব্যাপার কি? সে একটু অভিমানের সহিত কহিল, "এত রাত্তিরে আর না গিয়ে, থাক্‌লেই হতো না আজকের রাতটা?"

সদানন্দ স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া জবাব দিল, "না, এখানে আমার যায়গা নেই। আমি যে দিব্যি করেছিলুম।"

"তা হ'লে আমাদের কবে নিয়ে যা'বে মনে করেছ?"

অন্য দিকে মুখ করিয়া অস্পষ্ট স্বরে সদানন্দ উত্তর করিল, "তোমাদের নিয়ে যেতে আমার ত সুবিধে হ'বে না। তবে তুমি যে গহনার কথা বল্লে, সে আমি যত শীগ্‌গির পারি, তোমায় এসে দিয়ে যাব।" এই বলিয়াই সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। লাবণ্য আড়ষ্ট, অভিভূত, মুহ্যমান হইয়া দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

৯

তাহার পর এক দিন এক দল মোটর-ডাকাইত ধরা পড়িয়া গেল। তাহারা বড়বাজারের এক জহুরীর দোকান লুঠ করিয়া ফিরিতেছিল। পিস্তলের গুলীতে দোকানের একটা লোকও জখম হইয়াছিল। হাঁস-পাতালে তাহার মৃত্যু ঘটিল। বিচারে ডাকাইতদলের এক জনের যাবজ্জীবন ও তিন জনের যথাক্রমে ১০ বৎসর, সাড়ে ৮ বৎসর ও ৭ বৎসর করিয়া সপরিশ্রম কারাদণ্ড হইল। এই দস্যুদলের ভিতর সদানন্দ দাসের নামটাও সে দিন সহরশুদ্ধ লোকই শুনিল। যখন পুলিসের হাতে ধরা পড়ে, তখন পর্য্যন্ত তাহার পকেটে জহুরীর দোকানের অপহৃত একটা সুন্দর চুণির ও মতির নেকলেশ ও একজোড়া খুব দামী হীরার ইয়ারীং ছিল। তাহা ছাড়া হাজারখানেক টাকাও না কি মিলিয়া গিয়াছিল। আদালতে যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, কি উদ্দেশ্যে সে এই ডাকাইতের দলে মিশিয়াছিল, তখন সে হাসিয়া উকীল বাবুর দিকে চাহিয়া কহিয়াছিল, "আপনার বুঝি বিয়ে হয়নি ?"

* * * * *

এখন এই সদানন্দর মনে সব চেয়ে বড় সমস্যা, সে কেমন করিয়া তাহার দুলালকে মুখ দেখাইবে ? সেই ছেলে ! দূর হইতে বাপের ছায়া দেখিয়া যে চিনিতে পারিত, বাপকে একবার কাছে পাইলে যে জোঁকের মত ধরিয়া থাকিত, বাপের কোল পাইলে যা'র সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা-ধূলা, খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত মনে থাকিত না, সেই দুলাল ! সেই দুলাল এখন বাপকে দেখিলেও হয় ত চিনিতে পারিবে না। আর পারিলে ? চিনিতে পারিলেও হয় ত তাহার সেই হাসিমুখখানি লজ্জায়, ঘৃণায় কালীমাখা

হইয়া যাইবে। হয় ত গভীর বিরাগে সে তাহার সেই বিপন্ন-গম্ভীর মুখ সবেগে বিপরীত দিকেই ফিরাইয়া লইবে। হয় ত, হয় ত—

সদানন্দর বুকখানা বক্ষোনিবদ্ধ রুদ্ধ অন্তর্বায়ুর চাপে সঘনে যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল ; হয় ত—হয় ত সে তাহাকে চিনিতেই পারিবে না, পারিলেও তাহাদের মধ্যের যে নিকটতর, ঘনিষ্ঠতর পরিচয়, তাহাকে সে অস্বীকারই বা করিয়া বসিবে !

সদানন্দর বুক দুঃখে, ক্ষোভে অভিভূত হইয়া আসিল। তাহার চোখ দিয়া দর-দর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে দুই হাত যুক্ত করিয়া ঊর্দ্ধমুখে গদ্‌গদস্বরে বলিল, "নারায়ণ ! আমার ফুলের মত পবিত্র দুলালের যদি এমনই মনে হয়, তা' হ'লে সে যেন আমায় আর দেখতে না পায়, আমাকে শুধু একটিবারের জন্য তা'কে দেখতে দিও।"

প্রভাতের অম্লান আলোক বাহিরের চারিধারকে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছে। নির্ম্মল আকাশ, বাতাস তাহার সমুদায় শোভা-সৌন্দর্য্যকে যেন জাগাইয়া তুলিয়াছিল। আঃ, কি আনন্দ এই মুক্তিতে !

অসম্ভব ও অসঙ্গত জানিলেও সদানন্দর চিত্তে একটা অধীর আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগ জাগিয়াই উঠিতেছিল। সেটুকু তাহার নিছক কল্পনামাত্র জানিতে পারিয়াই তাহার সেই আশা-চকিত বুকের উপর একটা চাবুকের ঘা পড়িল। দুঃখে ক্ষোভে মনটা যেন তাহার গুঁড়াইয়া পড়িতে চাহিল। অথচ সে জানে যে, এত বড় ধৃষ্ট ও মিথ্যা আশা করিবার মত কোন কারণই তাহার জন্য বর্ত্তমান ছিল না। না, কেহ কোথাও নাই। প্রভাত-রৌদ্রকরোজ্জ্বল রাজপথে কদাচিত কোন সম্পূর্ণ অপরিচিত নাগরিক নিজ নিজ কর্ম্মব্যপদেশে যাওয়া আসা করিতেছিল, তাহারা তাহার দিকে একবার চোখ তুলিয়াও গেল না। তাহার দুই চোখ তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই একেবারে অনাহূত অশ্রুপ্রবাহে

ছাপাইয়া উঠিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে ক্ষিপ্রপদে চলিতে আরম্ভ করিল। পিছনদিকে আর একটিবারের জন্যও তাহার যেন চাহিয়া দেখিতে সাহস হইতেছিল না।

১০

কই দুলাল? কোথায় দুলাল? আর কত দূরে গেলে তাহার প্রাণের দুলালের মুখখানি সদানন্দ দেখিতে পাইবে? এই ত সেই কলিকাতা। এই কোলাহল-মুখরিত, জনারণ্য হাবড়া ষ্টেশন, হাবড়ার পুল, ইহার নীচেও যেমন ভাগীরথীর কলকল গদগদ নাদ, তাহার অসীম প্রবাহ, ইহার উপরেও তেমনই কলনাদে অসংখ্য যানবাহন ও জনস্রোত অসীমভাবেই দিবারাত্রি সমস্রোতেই চলিয়াছে। তাহার পর বিপণিশ্রেণী-সুসজ্জিত বড়বাজার, হ্যারিসন রোড। এই সেই গোপীচাঁদ দত্তের লেনের সেই চিরপরিচিত নম্বরের বাড়ী! হ্যাঁ, ইহাই ত বটে! সদানন্দর বুকের মধ্যে তাহাব সমস্ত শরীরের রক্ত জমা হইয়া এমনই ভয়ানক শব্দে তোলপাড় করিতে লাগিল যে, তাহার সে ভীষণ শব্দে তাহার কাণে তালা লাগিয়া যাইবার মত হইল। তাহার সহসা মনে হইল, সে হয় ত এখনই পড়িয়া যাইবে। অতি কষ্টে একটা বাড়ীর দেওয়াল ধরিয়া সে কোনমতে নিজের পতন সংবরণ করিল। কি সাহসে সে এই বাড়ীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে? সে কি ভুলিয়া গিয়াছে, সে এক জন জেলখালাসী অপরাধী? তা সে না হয় ভুলিতে পারে, কিন্তু তাহারা যে পারে নাই, এটা নিশ্চিত।

সারাদিন যে কোথায় কাটে, তাহার কোন নিশ্চিত হিসাব ছিল না; কিন্তু রাত্রিটা তাহার কাটিত এই গোপী দত্তর লেনেরই মধ্যে। কয়েক দিনের পর এক দিন সেই বাড়ীর এক জন ঝিয়ের নিকট হইতে খবর পাওয়া

গেল। যে খবর পাওয়া গেল তাহা এই—এই বাড়ীর কর্ত্তার নাম রামহরি চট্টোপাধ্যায়। তাঁহারা কত দিন এ বাড়ীতে আছেন, সে ঠিক বলিতে পারে না, তবে ৪ বছরের কম নয়।

সদানন্দব মনের অবস্থা ভীষণ হইয়া উঠিল। তবে কি আর সে দুলালকে —তাহার একমাত্র আশাপ্রদীপটিকে এ জীবনে কখন দেখিতে পাইবে না? না না, এই হয় ত ঠিক; এই হয় ত সঙ্গত! সে যে পাপী, মহাপাপী, পর-স্বাপহারী দস্যু। পুণ্য কি কখন পাপের সংস্রবে আসিতে পারে?

১১

সেই দিন মধ্যাহ্ন হইতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে নিবিড় ঘন মেঘে আকাশ ছাইয়া উঠিতেছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মূষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইয়া গেল। সারা দিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়া ক্লান্ত শরীরে কোথাও কোন গৃহস্থ-গৃহের দ্বারের পার্শ্বে কুকুরগুলার এক পার্শ্বে শুইয়া পড়িয়াই সদানন্দর দিন কাটিতেছিল। আজ অকস্মাৎ এই ঝড়-ঝঞ্ঝা আসিয়া তাহাকে একটা আশ্রয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। অবিরল ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছিল। অদূরে মল্লিক বাবুদের উদ্যানের বৃক্ষশ্রেণী বৃষ্টির অস্পষ্টতায় দিগন্তের নয়নতটে শ্যাম-কজ্জল রেখার মত দেখাইতেছিল। মাথার উপর ধূসর আকাশ দামি-নীর তীক্ষ্ণ হাস্যে থাকিয়া থাকিয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল, এবং আর্দ্র বায়ু অশ্রুসিক্ত দীর্ঘনিশ্বাসের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাঁ হাঁ শব্দে ধরণীর শীতল বক্ষে লুটাইয়া পড়িতেছিল।

শীতার্ত্ততায় কম্পিত, অনাহারে অনিদ্রায় দুর্ব্বল, সারাদিন পর্য্যটন-পরিশ্রমে ক্লান্ত সদানন্দ নন্দ বসাক গলির একটা ছোট বাড়ীর সাম্‌নের রকে উঠিয়া তাহার দ্বার চাপিয়া অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িল। আর যেন সে পারে

উঠিল। পুত্র কহিল—অত্যন্ত সাবধানতাপূর্ণ সঙ্কোচের সহিত সলজ্জে কহিল, "দেখ, এখানে কেউ জানে না যে, আমার বাপ বেঁচে আছে। আর সে সব কথাও এরা কেউ জানে না। আমি এখন আই-এস্‌সি পড়ি। ম্যাট্রিকে স্কলারশিপও পেয়েছিলুম। তোমায় যদি কেউ দেখে বা জানতে পারে তা' হ'লে আমি একেবারে লজ্জায় ম'রে যাব। তাই বল্‌ছি—" একটু থামিয়া তাহার পর আবার বলিল, "তুমি এখানে আর এসো না।" ক্ষণপরে বাক্যবিমুখ চেষ্টাবিরহিত বাপের উদ্দেশে ঈষৎ করুণার সহিত সে কহিল, "কোথায় আছ ? দেশে গেলে হ'ত না ?"

আর্ত্ত বাতাস তখন সমধিক উচ্চ-কণ্ঠে হাহাকার করিতেছিল। বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ ছুরী যেন আকাশের বিশাল বক্ষকে কুচি কুচি করিয়া কাটিতেছিল। ভিতর হইতে আর এক জন কেহ ডাকিয়া বলিল—"দুলালবাবু! কা'র সঙ্গে গল্প করছেন ?"

বিমূঢ় দুলালের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ভীত আর্ত্ত আহত কণ্ঠে সদানন্দ উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিল, "ওগো, কেউ নয় গো, কেউ নয়, আমি এক জন ভিকিরী।"—সে ছুটিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে বাহির হইয়া গেল।

এক দিন সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে এক দল পুলিস প্রহরী আসিয়া নন্দ বসাক লেনের একটা মেস-বাড়ীর চারিধারে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে পাড়ার লোক ও পথের লোক সেখানে একটা হাট বসাইয়া ফেলিল। সকলেই সমকৌতূহলে কারণ জানিবার জন্য পরস্পরকে একই প্রশ্ন করিতেছিল, ব্যাপার কি ?—উত্তর কিন্তু কাহারও মুখে শুনা গেল না।

পরিশেষে ব্যাপার যে কি, তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ দেখা গেল—পুলিস এক পরিণতমূর্ত্তি সুবেশধারী তরুণ পুরুষকে সঙ্গে লইয়া বাটীর বাহিরে আসিল। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঐ মেস-বাড়ীর বাসিন্দা

যুবকের দল। ছেলেরা সকলেই বিশেষভাবে উত্তেজিত। কেহ কেহ বলিতেছে,—

"ছি ছি, কি ঘৃণার কথা! এক জন আণ্ডার-গ্রাজুয়েটের এই জঘন্য কায!"

আবার অধিকাংশই ইহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ পূর্ব্বক তুমুল তর্ক তুলিতেছে।—"খোট্টাটাকে মেসে ঢুকিয়ে আজ ভদ্রলোকের ছেলের এত বড় অপমান ঘটতে দেওয়া হলো! ছি ছি, দুলাল যে মাস মাস পনর টাকা স্কলারশিপ পায়, সে কি না ওর একশ টাকা টেবলের উপর প'ড়ে আছে দেখে আর লোভ সামলাতে পারলে না! এ-ও বিশ্বাস হয! আচ্ছা, এর ফল আমরা দোব!"

প্রতিপক্ষ প্রবল কোলাহলে আত্মসমর্থন করিতেছিল—"সেই বৃষ্টির রাত্রিতে, কেউ বাড়ী ছিল না, শুধু দুলাল বাবু ছিলেন। তোমরা সে কথা ত আজ অস্বীকার কর্‌তে পার না। বাইরে কোন একটা ভিখিরীর সঙ্গে গল্প ক'রে বাবু যখন ভেতরে এলেন, তখন আমি খেতে বসেছি। টেবলে নোটের তাড়া প'ড়ে ছিল। কিছুক্ষণ পরে মনে পড়তে তাড়াতাড়ি দেখতে গেলুম, বেমালুম উপে গেছে! তা'র পর জিজ্ঞেস করতে প্রথমটা দুলাল-বাবু একটি কথা কইতে পারেন নি। সেগুলো মশাই কিসের লক্ষণ! আপনারা সব্বাই এককাট্টা হয়ে ওনারই পক্ষ নিলেন, অথচ—"

সেই ভিড়ের মধ্য হইতে একজন শীর্ণকায় দীর্ঘাকৃতি মধ্যবয়স্ক পুরুষ স্খলিতপদে কষ্টে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া ভিড় ঠেলিয়া পুলিসবাহিনীর সম্মুখে আসিয়া স্থির ও দৃঢ়-কণ্ঠে বলিল, "বাবুকে তোমরা ছেড়ে দাও, উনি কিছুই জানেন না। সে দিন ঝড়ের রাতে আমিই এখানে আশ্রয় নিয়েছিলুম, আর খোলা দরজা পেয়ে বাবু চ'লে গেলে চুপি চুপি ভিতরে গিয়ে নোটের গোছা দেখতে পেয়ে তুলে নিই। টাকা অবশ্য আমার কাছে নেই, সে

খোয়া গেছে! তবে আমি এক জন দাগী আসামী। হুগলীর জেলখানা থেকে মোটে এই পাঁচ দিন হ'ল বা'র হয়ে এসেছি। সেখানে আমার নম্বর ছিল ১২৭—খবর নিলেই টের পাবে।"

খোট্টা যুবকটি "শালা!" বলিয়া তাহার পিঠে একটা বিরাশী সিক্কা ওজনের কিল মারিল। তাহার পর পুলিস-হস্তমুক্ত স্তব্ধ স্থির অসাড় অ-নড় দুলালের জ্ঞানশূন্য—প্রাণশূন্যবৎ মুখের দিকে চাহিয়া সকাতরে হাতজোড় করিল এবং বলিল, "ধ'রে দু' ঘা যদি পিটিয়ে দেন, মুখে লাথিও মারেন—আমার কিচ্ছুটিও আপনাকে বলবার নেই।"

চিরদিনের স্থর

১

বর্দ্ধমান জিলায় আদিত্যপুর এক সময় একখানি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল বটে, তবে এখন তাহার সেই আগেকার ক্রমবর্দ্ধমান শ্রী-সৌন্দর্য্যটুকু ক্রমশই হ্রাসের দিকেই নামিয়া চলিয়াছে ; বৃদ্ধির সহিত কোনই সংস্রব দেখা যায় না। গ্রামের মধ্যে ম্যালেরিয়ার উপদ্রব নেহাৎই মন্দ নাই। ম্যালেরিয়ার উপকরণেরও বড় অভাব নাই। যথা,—পচা ডোবা, তাহার ধারেই ঘনসন্নিবিষ্ট বড় বড় বাঁশঝাড়। ঐ বাঁশের পাতা ঝড়িয়া ডোবার জলে সহজেই পড়িতে পায় এবং তাহার পচা জলকে সমধিক পরিমাণেই পচাইয়া তুলে। এ ছাড়া-গ্রামখানিতে মানুষের বাস যতই হ্রাস পাইতেছে, কালকাসন্দা, কচু ও ঘেঁটুবনের বৃদ্ধিটা ঠিক সেই হিসাবেই দ্রুততর বর্দ্ধিত হইতেছে। তবে না কি, মানুষের অপেক্ষা ইতর প্রাণী এবং তদপেক্ষাও উদ্ভিদ্ রাজ্যের প্রজননশক্তিটা পারসেণ্ট ধরিয়া হিসাব করিলে অনেক গুণই উপরে উঠিয়া পড়ে, তাই সেই হিসাবের অনুপাতে মানুষ কমার চাইতে জঙ্গলাংশটাও বাড়িয়া চলিয়াছিল।

গ্রামের মধ্যে মিত্তিররা, চৌধুরীরা, বাচপোত (পূর্ব্বতন বাচস্পতির উত্তরপুরুষ) রা এবং চাটুয্যেরা পূর্ব্বে এ গ্রামের মধ্যে গণ্যমান্য এবং কেহ কেহ বেশ বদান্যও ছিলেন। চাটুয্যে-গিন্নীর প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণীতে এখনও অবশিষ্ট গ্রামবাসীর পানের জলের সঙ্কুলান চলিতেছে, চৌধুরীদের আধভাঙ্গা প্রতিমা-আগমনশূন্য পূজার দালানে এখনও তাঁহাদের স্থাপিত পাঠশালা বর্ষা-শরতে ম্যালেরিয়ার জ্বালায় বন্ধ থাকিয়া শীত-গ্রীষ্মে কোন মতে টিম্‌টাম

করিয়া চলিয়া যাইতেছে। বাচপোতরা তেমন নাম-রাখার হিসাবে কোন একটা স্থায়ী কীর্ত্তি করিতে পারেন নাই বটে, তবে মিত্তির বাবুর সংস্থাপিত ডাক্তার-খানাটাই আপাততঃ এ গ্রামের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকারী হওয়ায় আপামর জনসাধারণের আশীর্ব্বাদের ভাগী তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইতে পারিয়া—বোধ করি বা সেই পুণ্যবলেই কলিকাতায় বসিয়া বড় আফিসে মোটা মাহিনা এবং মার্ব্বেল পাথরের কক্ষভূমি ইলেকট্রিক লাইটের আলো পাখা এবং প্রকাণ্ড কোল-কার তাঁহারাই ইঁহাদের মধ্যে প্রধানতঃ উপভোগ করিতেছিলেন।

এই হাঁসপাতালে একটি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত নেটিব ডাক্তার নিজের অস্থি-চর্ম্মসার হাতখানিতে সকাল ৭টা হইতে বেলা ৯॥০ পর্য্যন্ত তথায় সমাগত তদবস্থ অতিথিবর্গকে কুইনিন মিক্সচার বণ্টন করিয়া থাকেন। দেবাসুর যুদ্ধের পরে সুধাবণ্টন লইয়া দেবতা এবং অসুরের মধ্যে যে রকম হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছিল, তেমনই ঐ তুটি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে নিজ নিজ অভীষ্টসিদ্ধির প্রচেষ্টায় রোগগ্রস্ত দেহ ও শুষ্ককণ্ঠ গ্রামবাসী কাড়াকাড়ি লাগাইয়া দিত। বলা বাহুল্য, এই ম্যালেরিয়া-সুধা আহরণার্থ শুধু এ. গ্রামের নয়, আরও তুই তিনখানা ভিন্ন গ্রামের লোকও এই মিত্র বাবুদের প্রতিষ্ঠিত সুধাভাণ্ডের চারি পার্শ্বে প্রত্যহ আসিয়া জমা হইয়া ক্রমশই হাঁসপাতালের খরচা বৃদ্ধি করিতেছিল। অবশ্য ইহার জন্য ডাক্তার বাবুর ঘরের পয়সা খরচ করিতে হইতেছিল, এমন কথাটা বলিতে পারিব না। রোগীর সংখ্যা যতই বাড়িতেছিল, মিক্সচারে একোয়া বর্দ্ধিত হইয়া কুইনিনের মাত্রা ততই কমিতে-ছিল। উপায় কি? এক প্রকারে সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে ত? কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া কিঞ্চিৎ দেওয়াও ত ভাল। আর ইহারা ত ভোজের নিমন্ত্রিত নয়, নিত্য-পোষ্য। তা' এ বিষয়ে ছদ্মবেশিনী মোহিনীর তুলনায় আমাদের ডাক্তার বাবুটি লোক ভাল!

আদিত্যপুরের প্রসিদ্ধি কিন্তু তাহার ম্যালেরিয়ার প্রচণ্ড প্রকোপ অথবা ডাক্তার বাবুর তৈয়ারী ম্যালেরিয়া-সুধায় জলাধিক্যের জন্য নহে, এই পূর্ব্বতন সুসমৃদ্ধ এবং ইদানীন্তন শ্রীভ্রষ্ট গ্রামের মধ্যে এক সুপ্রাচীন দেবমন্দির থাকাতেই ইহা প্রায় ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভের দাবী তুলিতে সমর্থ। হয় ত বা অদূর ভবিষ্যতে কোন দিন না কোন দিন তাহা তুলিবেও। ঐ মন্দিরের নাম আদিত্যেশ্বরের মন্দির। আদিত্যেশ্বর মহাদেবের নাম। জগজ্জনবন্দিত ভগবান্ সূর্য্যদেব যে শৈব ছিলেন, এই মন্দিরেই তিনি শিবভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন, ইতিহাস-পুরাণে সে কথা লিখিত না পাওয়া গেলেও প্রত্নতত্ত্ব ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যখন উপস্থাপিত করিতেছে, তখন ইহা নিশ্চয়ই অবিসম্বাদী সত্য বলিয়া স্বীকারও করিয়া লইতে হইবে। পুরাকালে না কি গরুড়পক্ষী যখন গজ-কচ্ছপ লইয়া আকাশে উড়িয়া সূর্য্যমণ্ডলকে আচ্ছাদন করিয়াছিল, তখন দ্বিতীয় রাহু মনে করিয়া এবং এই নূতন রাহুর বিশালতায় সবিশেষ ভীত হইয়া সূর্য্যদেব না কি এইখানে আসিয়া, নির্জ্জন শতরূপা নদীতীরে বহু বর্ষের কঠোর তপস্থায় দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া মহাভয় ভঞ্জন করেন। সূর্য্যদেবের প্রতিষ্ঠিত সেই মন্দির ও দেবমূর্ত্তিই আজ পর্য্যন্ত এই আদিত্যশ্বর নামে বিখ্যাত। এখানে পূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী ও দূরস্থ অনেক যাত্রীর ভীড় বার মাসই লাগিয়া থাকিত। ঠাকুরের দেবোত্তর ভূমিও নেহাৎ কম নহে, তাহার উপর যাত্রীর আয়েও টাকা উঠিত। এখন কলির ও ম্যালেরিয়ার প্রবলতায় যাত্রীসমাগম অর্দ্ধেকও নাই। তবে শিবরাত্রির সময় একটি বড় রকম মেলা হয় এবং সেই সময় এখনও দুই চারি হাজার যাত্রীসমাগম হইয়া থাকে। দেবোত্তরের আয় না কি পূর্ব্বে সত্তর হাজারের কাছ ঘেঁষিয়াছিল, এখন নানা কারণে আবাদ প্রভৃতি নষ্ট হওয়ায় ততটা নাই, তবু পঁচিশ হাজারের কম হইবে বোধ হয় না।

অন্যত্রও যেমন এখানেও তেমনই মোহান্ত-মহারাজের চেলা মহারাজদের

মধ্য হইতেই এক জন মোহান্ত গদীতে বসেন। যিনি ভাবী মোহান্ত, তিনি পূর্ব্বাবধিই এক রকম মোহান্ত দ্বারা জনসাধারণে চিহ্নিত হইয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে এবার সে রকম কোনটিকেই দেখা গেল না।

মহেশ্বরানন্দ বলিয়া বহু পূর্ব্বে যাহার নামকরণ করা হইয়াছিল, সে নিজেও অনেকটা এবং সাধারণ লোকে সম্পূর্ণরূপেই একদা মনে করিয়াছিল যে, ইনিই ভবিষ্যৎ মোহান্ত।

কিন্তু ইদানীং সত্তর পার হইয়া এবং অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের দ্বারায় একবারে অসমর্থ হইয়া পড়িবার পড়ে যখন হইতে ভবানন্দ পুরী নিছক ধর্ম্মপথে মনোযোগী হইয়া পড়িলেন, তখন হইতেই তাঁহার এই মহেশ্বরানন্দের পরেই যেন কেমন একটা বিরাগ দৃষ্ট হইতে লাগিল। যে মহেশ্বর এতদিন তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিল, সে এখন একটা কড়ে আঙ্গুলের দরকারেও লাগে না। কিন্তু তাই বলিয়াই তিনি যে মহেশ্বরানন্দকে খর্ব্ব করিয়া আর কাহাকেও তাহার জায়গায় উঠাইয়া লইলেন, তাহাও নহে। ও জায়গাটা খালিই থাকিল।

মোহান্তজী তাঁহার সমস্ত সাঙ্গোপাঙ্গ, চেলা ইত্যাদির ভিড় কাটাইয়া একটুখানি নির্জ্জন কোণের ভিতর নিজেকে কোণঠাসা করিয়া ফেলিলেন। এতদিন যাহারা তাঁহার কাছে কাছে ফিরিয়াছে, এখনও কাছে কাছেই ভিড় করিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে তাহারা নিবৃত্ত হইল না। তবে ঠিক কাছাকাছি পৌঁছিতেও যে পারা যায় নাই, সেইটুকুই তাহাদের মনে সর্ব্বদা স্পষ্ট হইয়াই থাকিল এবং ইহার জন্য অস্বস্তিও তাহাদের মনের মধ্যে নেহাৎ কম জমিয়া থাকিল না।

মোহান্তের এই হঠাৎ বৈরাগ্যকে অনেকেই তাঁহার সমাগত-প্রায় বাহাত্তর বৎসরের পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়াই খুব জোরের সঙ্গে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনেকেই আশা করিল, এতটা অস্বাভাবিক প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের

ফলে তাঁহার এইবার এই নশ্বর দেহটারও বিবর্ত্তন ঘটা কিছু বিচিত্র নাও হইতে পারে। অতএব এই সময় হইতেই নিদানের বিধান লওয়ার সুযুক্তি গ্রহণ অবশ্য-কর্ত্তব্য। অবশ্য এই কর্ত্তব্য শিক্ষাটা শিক্ষকগণ নিজেদের মধ্যেই প্রচার করিতে লাগিলেন, শিক্ষার্থীর সম্মুখে এ কথার উল্লেখ করা অবশ্য একটুও সম্ভব ছিল না।

এই সময় সহসা একটি নূতন শিষ্যকে জনপূজ্য মোহান্তের পদে বসাইয়া দিয়া সত্য সত্যই ভবানন্দ মহারাজ জনমতকে সার্থক করিয়া তুলিয়া শিবলোকে অথবা কোন অশিবলোকে যাত্রা করিলেন। নূতন মোহান্তের নাম হইল মহেশানন্দ। মহেশানন্দ শিক্ষিত, বিনীত, সুচরিত্র। তবে একান্তই অল্পভাষী এবং লোকসঙ্গবিমুখ। তাই জনপ্রিয় হইতে পারিলেন না।

আদিত্যেশ্বরের নূতন মোহান্ত আর নূতন নাই, তাহার পর সুদীর্ঘ দ্বাবিংশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, আজ তিনি পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়স্ক প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ। এ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনটাই নিঃসঙ্গ নিরানন্দভাবে কাটিয়া গিয়াছে। আজও সেই সুখহীন নিস্পৃহ জীবনেই তিনি অভ্যস্ত।

এই সময় একটা নূতন কিছু ঘটিল। বর্ষা চলিয়া গিয়াছে। শরতের হল্‌দে আলো এবং শাদা আকাশ এক সঙ্গে প্রচুর হইয়া দেখা দিয়াছে। শতরূপার দুইটি তীর ভরিয়া সবুজ লতায় ছোট ছোট বেগুণী রংয়ের অজস্র ফুল ফুটিয়া কুঁড়ি ধরিয়া রহিয়াছে। বাঁশঝাড় কোথাও ডোবার উপর, কোথাও বৃষ্টি-জমা জলের ধারে, কোথাও নদীজলে নত হইয়া পড়িয়াছে। কচুপাতা বাতাসে তর্ তর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। এ-দিক ও-দিক বর্ষা-জলপুষ্ট ঝোপের গায়ে তেলাকুচার লতা উঠিয়া তাহাদের যেন নাগপাশে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। উহারই গায়ে গায়ে তাহার রাঙ্গা সবুজ ফল এবং শাদা শাদা ফুল বাহারের হিসাবে মন্দ দেখাইতেছিল না। বটগাছের

ঝুরির খুঁটিতে দোলনা বাঁধিয়া রাখাল ছেলেরা ঝুলনপর্ব্বের পুনরভিনয় করিয়াছে—তাহারই চিহ্ন প্রকটিত। গাছের ডালে শালিক পাখীর ঝাঁক কিচির-মিচির করিয়া সবুজ ঘাসের মখমলে চিত্রকরা চড়ুইগুলার ঘাসের বিচি খুঁটিয়া লওয়ার আনন্দ-ভোজের চিক্‌চিকানীর সঙ্গে সঙ্গত করিতেছিল।

চারিদিক্ দিয়া একটা ভালয় মন্দয় মিশ্র গন্ধ জলধৌত প্রসন্ন বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

মোহান্ত মহেশানন্দ তাঁহার বসিবার ঘরের সামনের 'দৌড়দার' বারান্দায় একখানি ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত ছিলেন। পূর্ব্বে এখানিতে যাহাই থাক, এখন সেই নরম ভেলভেটের উপর একখানি হরিণের ছাল আঁটা, গায়ে তাঁহার পূর্ব্ব-মোহান্তর মত কোমল ফ্রেঞ্চ শিল্কের গেরুয়া আলখাল্লা ও তাহার ভিতর ঐ জিনিষেরই অন্তর্ব্বাস নাই; এবং এগুলিকে এখন প্রত্যহ ধোলাই করিয়া প্রত্যহ নূতন গেরুয়া রংয়ে ছোপানও হয় না। তিনি এগুলি বড় জোর হপ্তায় একবাব করিয়া সাবান দিয়া কাচাইয়া লয়েন। উহা মোটামুটি ভাবেই মোটাকাপড়ে প্রস্তুত। ধোপা বাড়ীর ধোয়া জিনিষ মোহান্তজী তাঁহার নিজের শরীরে ঠেকিতে দেন না, উহা মোহান্তদের নিয়ম নহে। তবে গুরু মোহান্তের কথা ছাড়িয়া দাও!

বারান্দার বাহিরে দুই পাশে দুইটি কদম গাছ যেন সুখ-কণ্টকিত শরীরে একরাশ ফুলের ভারে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহাদের দুই পাশে ফুলগাছের কেয়ারি সার বাঁধিয়া চলিয়া গিয়াছে। করবীর রাঙ্গা শাদা ফুলে যেন আপনা হইতেই তোড়া বাঁধা হইয়া আছে। কিন্তু স্থলপদ্মের রঙ্গের উজ্জ্বলতায় তাহাদেরও অতটা রূপ যেন জলুষ হারাইয়াছিল। প্রজাপতিগুলা নানাবর্ণের রেখা গায়ে টানিয়া দিয়া মুক্তোজ্জ্বল প্রকৃতির মাঝখানে নিজেদের রূপ বিলাইয়া বেড়াইতেছে।

কিন্তু এতটা যে সৌন্দর্য্য চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে, সে দিকে

মোহান্তের দৃক্‌পাতই ছিল না। তাঁহার জড়তাময় চিত্ত নিজের মনের জীর্ণতায় আজও নিখিল প্রকৃতিকেই যেন জীর্ণ ও পুরাতন বলিয়াই বোধ করিতেছিল। ফুলফোটা ফল-ধরা, কিছুই যেন আর সেই বিস্ময়বিহীন-স্তিমিতদৃষ্টি নেত্রের সমক্ষে নূতনত্বের সমাবেশ করিতে পারে না। যে দিকেই তাঁহার চির-অস্বচ্ছন্দ মনের দ্বারা পরিচালিত হইয়া চোখ ফিরিতেছিল, মনে হইতেছিল, উহারাও যেন তাঁহারই মত রিক্ত ও চির-পুরাতন মন-প্রাণ লইয়া একঘেয়ে পড়িয়া আছে।

এখানকার সম্পত্তিতে বেশ রীতিমত বড় একটা জমিদারীর আয়। একটা বাঁধা আয় থাকিলেই, সেটা ভোগ করার জন্য লোক চাই। এই দেবোত্তর ভোগ করিবার জন্যও সেই মন্দির-প্রতিষ্ঠা-কাল হইতে অথবা তাহার অনতিবিলম্বিত দিন হইতে সেই বিপুল অর্থরাশির এক জন উপ-ভোক্তাও স্থির করিয়া রাখা হইয়াছিল। অবশ্য এ রকম স্থলে যেমন হইয়া থাকে, বিধানকর্ত্তা বোধ করেন যে, ভোক্তাকে একখানা গেরুয়া পরাইয়া দিতে পারিলে আর তাহাব উপভোগেব উপায় থাকিবে না; অতএব তখন নিশ্চিন্ত হইয়া সমস্ত দেবোত্তরের উপস্বত্ব তাহার হাতে ফেলিয়া দিতে পারা যাইবে এবং ঐ অর্থরাশি লইয়া তিনি শুদ্ধ-সত্ত্ব-চিত্তে কদলীপত্রে কাঁচকলা দিয়া হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিতে করিতে সাধারণের জন্য অসাধারণ পুণ্যকার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন; দেবতার সম্পত্তি নানারূপ দৈবকার্য্যে অতি সাত্ত্বিকভাবেই নিয়োজিত হইতে পারিবে; কিন্তু মানুষ যদি অতি সহজ পশু হইত, তাহা হইলে ইতর প্রাণীদের সমাজের মত মনুষ্য-সমাজটাও সম্পূর্ণ বৈচিত্র্যবর্জ্জিত হইয়া যাইত। মানুষ নিজেকে অত সহজেই বঞ্চিত করিতে পারে না। ডেন্‌জার-সিগনাল্‌ স্বরূপ গৈরিক বাসখানা যদিও এ পুরার মোহান্ত মহারাজদের পারিবারিক সুখসম্ভোগে বঞ্চিত রাখিয়াছিল, তথাপি তাঁহাদের মধ্যের অধিকাংশই প্রকাশ্য বিবাহের পরিবর্ত্তে এমন কতকগুলি

ব্যবস্থা করিয়া লইয়া চলিতেন, যাহাতে তাঁহাদের গেরুয়ার সম্মানটা বজায় রাখিয়াই তাঁহাদের ঘর-করণার সাধটাও মিটিতে থাকে। তা' বিবাহের গণ্ডীবদ্ধ জাবনের অপেক্ষা এমন ধারা সন্ন্যাস করা যে আঠারোগুণেই প্রার্থিত, সে কথাটা তাঁহারাও বুঝিতেন ; নতুবা, ঠাকুরবাড়ীর প্রথম দলিলেই ত লেখা আছে, যে মোহান্ত মহারাজ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তিনি তাঁহার প্রথম চেলার হস্তে মোহান্তী সঁপিয়া দিয়া অনায়াসেই তাহা করিতে সমর্থ। কিন্তু আবহমানকালের ইতিহাসে এ রকম ঘটনা ঘটিবার একটিও নজীর নাই। অথচ সেই আবহমানকাল ধরিয়াই দেশের মধ্যে ইঁহাদের সম্বন্ধে এমন সব কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায় যে, সময় সময় সে সব কথায় কাণে আঙ্গুল না দিয়া থাকা যায় না ; এবং এ সব আলোচনায় বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর দুইটি দল তৈয়ারী হইয়া কদাচিৎ লাঠালাঠিরও জোগাড় করিয়া তুলিয়া থাকে, এমনও জানা গিয়াছে। যাক্, সে সব অমন অনেক দেবস্থানেই ঘটিয়া থাকে। দেবতার পার্শ্বেই দানব থাকে, মানবের ভাগ্যে এ সৌভাগ্যটা দৈবাৎ ঘটিয়া উঠিতে দেখা যায়। এই দেখুন না, বাঙ্গালার তারকনাথ হইতে বেহারের বোধগয়া—আবার উত্তরাখণ্ডের ভুবনবিখ্যাত যোশীমঠ, স্বনামধন্য উষীমঠ এবং গোপেশ্বর ইত্যাদি বিখ্যাত বড় বড় মঠ—আরও কতই না অখ্যাত ছোট বড় মঠের মঠাধীশদের ভাগ্যে এ সব কু-যশ কু-কীর্ত্তির মালা পরার অবসর ঘটিয়াছে, তাহার ঠিক কি ? এক আধ জনকে ব্যতীত তাই বলিয়াই ত আর স্থানচ্যুত হইতে হয় নাই ! বড় জোর সরকারের একটুখানি চোকরাঙানি দেখিতে হইয়াছে বই ত নয়। তা হউক, পেটে খাইলে পিঠেও সহ্য করা যাইতে পারে।

কিছু দিন আগে এই আদিত্যেশ্বরের যিনি প্রধান পাণ্ডা বা মোহান্ত ছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধেও জনমতটা বেশ অনুকূল ছিল না। সম্মুখে যাহারা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ওই সাক্ষাৎ শিবাবতারের চরণরেণুকণা

প্রলিপ্ত করিত, অন্তরালে তাহারাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কুৎসা রটনা করিয়া বেড়াইত। নিন্দাটা অবশ্যই মুখের উপর হইলে কাহারও রুচিকর হয় না এবং এ দেশে একটি প্রবল প্রবাদ বাক্য আছে যে, আড়ালে রাজার মাকেও ডাইন বলা যায়। তখন রাজার মা না হইলেও স্বয়ং রাজতুল্য ঐশ্বর্য্য-ভোগপরায়ণ হইয়া যে মোহান্তঠাকুর কাহারও নেপথ্য আলোচনারও অযোগ্য হইয়া উঠিবেন, এতদূর তুচ্ছ তাঁহাকে আমরা মনে করি না।

মোহান্ত ভবানন্দপুরী ইদানীং অকালবৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য তখনও বৎসর বৎসর তাঁহাকে প্রচুরতররূপেই উপস্বত্ব যোগাইয়া দিতেছে। ভোগের আকাঙ্ক্ষাও না কি মানুষের কোন দিনই নিবৃত্ত হইবার জিনিষ নয়, কাযেই সেটাও ঠিক বজায় আছে। তবে বিপদ ঘটিয়াছিল ভোগ করার শক্তিটাকে লইয়া। সে না কি ধরাবাঁধা দেবোত্তর সম্পত্তিও নহে এবং অতি সূক্ষ্ম পদার্থ ও এক প্রকার অবস্তু স্বরূপ আকাঙ্ক্ষাও নহে। কাযেই তাহার একটা সীমা নির্দ্দেশ করা আছে, ইহার বাহিরে সে এক পাও হাঁটিতে অসমর্থ। মোহান্ত ভবানন্দ যদিও সত্তরের কোঠায় চলিতে চলিতে আপনার ভোগ-দেহটাকে ভিতরের তীব্র আগ্রহ ও বাহিরের অজস্র উপকরণ দ্বারা অনেকটা ভোগক্ষম রাখিয়াছিলেন, যে দিন সে সত্তরটা পার হইল, সেই দিনই কিন্তু সে সজোরে এই চেষ্টার জবাব দিয়াছিল। খাওয়া আর হজম হয় না, ব্রহ্মচারী মোহান্তের পক্ষে যে জিনিষটা সর্ব্বাপেক্ষা নিষিদ্ধ, তাহাদের সম্বন্ধীয় সেই নিষেধটা এত দিনে পালন করার কথা স্মরণে আসিয়াছে। দেখিতে দেখিতে এত দিনের ঘোর বিলাসী ভবানন্দ হঠাৎ একটি নৈষ্ঠিক সাধুসন্ত ধার্ম্মিক মোহান্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিলেন। তবে বেশী দিন এই বিড়ম্বনা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল না, একটুকুই তাঁহার শাস্তি!

আদিত্যেশ্বরের মোহান্তরা দশনামী সম্প্রদায়ের মধ্যস্থ পুরী উপাধিধারী।

ব্রহ্মচর্য্য ইঁহাদের সকলের জন্যই বিশেষ বিধি। ভগ্নস্বাস্থ্য ভবানন্দ নিজের মহাযাত্রার রথচক্রের মহা নির্ঘোষ শুনিতে পাইয়া সহসা একান্তভাবেই চিন্তিত হইয়া উঠিলেন যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের এই মহা নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন না করিলে যে মহাপাতকগ্রস্ত হইতে হইবে, তত বড় পাপ হইতে বিরত থাকিবে, তেমন একটি ভাবী মোহান্ত কোথায় পাওয়া যায়? নিজের আশে পাশে চোখ বুলাইয়া তেমন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না, যাহাকে এই কঠিন কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় একদা মহেশানন্দের অভ্যুদয় ঘটায়, এই মহাচিন্তার হাত হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিলেন। মহেশ ঠিক গুরুর বিপরীত স্বভাবের লোক। অতি কঠোরভাবেই জীবন কাটাইয়া এতদিন পরে মহেশানন্দও যেন তাঁহার অভ্যস্ত জীবনে কিছু ক্লান্তি অনুভব করিতেছিলেন।

একটা অজানা নূতনের জন্য প্রাণ তাঁহার এতদিন পরে যেন মধ্যে মধ্যে হায় হায় করিয়া উঠিতেছিল। এ জীবন যেন আর সহ্য হয় না!

সে দিন অকস্মাৎ এই চিরপুরাতনদের মধ্যে এক নূতনের অভ্যাগম ঘটিয়া গেল। অনতিবিলম্বিত সন্ধ্যায় একটি অচেনা পথিক আসিয়া হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল, বলিল, "আমি একটুখানি আশ্রয় চাই; পাব কি?"

ভিখারী অতিথি। ইহাদের এতটা দূর পর্য্যন্ত আসিতে দেওয়া কোন কালেই এখানকার বিধি নহে। এই লোকটি সেই সনাতন বিধির বিধান হইতে কেমন করিয়াই যে মুক্তিলাভ করিয়া একবারে এই খাস দরবারে আসিয়া পৌঁছিল, ইহা একটুখানি বিস্ময়ের বিষয় বটে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মোহান্তকে সে সম্বন্ধে বিস্মিত হওয়ার অবসর দিল না যে জিনিষটা, তাহা ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর বলিয়াই। সেটা এই আশ্রয়প্রার্থীর কণ্ঠস্বর হইতে তাহার সমস্ত চেহারাটা! এই যে ছেলেটি একটুখানি তুচ্ছ আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, ইহার গলার স্বরে কিন্তু যথেষ্ট বিনয় থাকা সত্ত্বেও

-ইহাকে এত তুচ্ছ যাচ্ঞাকারী বলিয়া কোনমতেই প্রমাণ দিতে পারিল না। আর মানুষের চেহারা যে এত সুন্দর হয়, এ যেন বিশ্বাস করাই যায় না!

গায়ে একটা মুটিয়ার আলখেল্লা, সেটার একবারে আনকোরা গেরুয়ার রং। সে রং তাহার সেই রংয়ের সঙ্গে মিশিয়া পড়া গায়ের উপর জায়গায়-জায়গায় উঠিয়া আসিয়াছে। মাথায় ঐ রংয়ের ঐ জিনিষেরই একটা প্রকাণ্ড পাগড়ী, হাতে একগাছা মোটা লাঠী। এই সাজ-পোষাকেই লোকটি যেন অপরূপ! সাধারণতঃ এ রকম সাজে কমবয়সী ছেলেদের একটু যেন গুণ্ডা গোছেরই দেখায়। কিন্তু এই নিতান্ত কিশোরবয়স্ক এবং অত্যন্ত সুরূপ চেহারার ছেলেটিকে এই পোষাক এত সুন্দর মানাইয়াছিল যে, উহাকে একবার দেখিলে যেন আর চোখ ফিরাইয়া লওয়া যায় না। মনে হয়, শত চক্ষু হইয়া জন্ম জন্ম ধরিয়া ইহাকেই চাহিয়া দেখি! প্রৌঢ় মহেশানন্দ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে এই তরুণ কিশোরের অপূর্ব্ব-দর্শন মূর্ত্তিটির সমুদায় রস যেন তাঁহার লোলুপ পিপাসিত দৃষ্টি দ্বারা শুষিয়া লইতে লাগিলেন। আগন্তুকের প্রার্থনাটুকু পূর্ণ হইল, কি হইল না, এ সম্বন্ধে যে তাঁহার একটা জবাব দেওয়াও দরকার ছিল, সে কথাটা তাহাব মনেও পড়িল না। এ দিকে ছেলেটি এমন করিয়া নিজেকে দ্রষ্টব্য হইতে দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল এবং বিব্রত নতমুখে মৃদু-কণ্ঠে কহিয়া ফেলিল, "যদি আপনার সুবিধে না হয়, আমি চ'লে যাচ্ছি।"

এই বলিয়া সে যেন একটুখানি অনিচ্ছা-মন্থর পদে অত্যন্ত ধীরে ধীরেই পিছন ফিরিল।

আকাশে যতক্ষণ চাঁদ থাকে, যে ভাবুক ব্যক্তি নির্নিমেষে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে, হঠাৎ তাহাকে মেঘঢাকা হইতে দেখিলে সে যেমন নিজের এতক্ষণকার রূপ-তন্ময়তা হইতে চমকিয়া জাগিয়া উঠে, তেমনই সেই বিস্ময়কর কিশোর-সৌন্দর্য্যকে সহসা প্রত্যাবর্ত্তনোন্মুখ দেখিয়া মহেশানন্দের

চটকা ভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি উহাকে ফিরিতে দেখিয়া ঈষৎ যেন উৎকণ্ঠা-শঙ্কিতভাবে ব্যগ্র হইয়াই কহিলেন,—"যেও না, আমি তোমায় রাখবো।"

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার সুন্দর মুখে এতক্ষণ যে একটা গভীর উৎকণ্ঠার ছায়া পড়িয়াছিল, সেটা হঠাৎ সরিয়া গিয়া তাহার সেই অপরূপ মুখ যেন রাহুগ্রাসমুক্ত চন্দ্রের মুখের মতই সমুজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল।

ছেলেটি ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে গড় করিয়া প্রণাম করিতেই তিনি তাহাকে দুই হাত বাড়াইয়া দিলেন। এই নিতান্ত অচেনা অথচ বিশেষরূপে সম্মানিত লোকটির সাগ্রহ আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করিতে বোধ করি কিশোর ঈষৎ কুণ্ঠানুভব করিতেছিল। বোধ করি, সেই জন্যই সে একটুখানি সন্ত্রস্তভাবে নিজেকে দূরে রাখিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা তুলিয়া লইয়া নিজের কপালে ঠেকাইল। মাথাটা তাহার সেই দীর্ঘ পাগড়ীতে একবারে এমনভাবে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল যে, মাথায় মনঃকল্পিত ধূলার মত সূক্ষ্মবস্তুরও প্রবেশ-পথ ছিল না।

মহেশানন্দের প্রথম আবেগ তরুণের এই কুণ্ঠিত ব্যবহারে ঈষৎ যেন বাধা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু বাধা পাইলেই নিজেকে প্রত্যাহৃত করা সকল বস্তুর ধর্ম্ম নহে। জল যেমন বাধা পাইলে চারিদিক্ দিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাঁহার এই নূতন আগ্রহ তেমনই করিয়াই যেন বর্দ্ধিতবেগে এই অপরিচিত ছেলেটিকে কেন্দ্র করিয়া উছলিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার অকালবার্দ্ধক্যে তেজোহীন দৃষ্টি দিয়া তাঁহার সম্মুখে নতমুখে উপবিষ্ট তরুণের মুখখানি গভীর প্রীতিভরে দেখিতে দেখিতে আবেগোত্তেজিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"আমি কি তোরই পথ চেয়ে এত দিন বসেছিলেম রে? কোথায় ছিলি এত দিন?"

তাঁহার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া বাতাস-লাগা গাছের পাতায় জমা

বৃষ্টিজলের মতই অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে অশ্রু যে কত সুখের —কত দুঃখের, সে কেবল এক তিনি এবং তাঁহার অন্তরের যিনি নিত্য অধিষ্ঠাতা, সেই তিনিই জানিলেন। ছেলেটি হয় ত ভাল করিয়া কিছু না বুঝিলেও সে যে এখানে তাহার দরকারের অতিরিক্ত ভাবেই গৃহীত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে তাহাকে কোন কষ্ট পাইতে হইল না। কে জানে কেন, সে-ও কাঁদিয়া ফেলিল।

২

ঐ যে ছেলেটিকে সে দিন সন্ধ্যাবেলায় মোহান্তজী তাঁহার কাছে আশ্রয় দিলেন, তাহার নাম না কি ভবেশ! নামটি শুনিয়া মহেশানন্দ মুখে কিছু না বলুন, মনের মধ্যে তাঁহার এই কথাটাই তখন প্রবল হইয়া উঠিল যে, এই ছেলেটিকে ভগবান্ নিশ্চয় আমার জন্যই তৈরি করিয়া রাখিয়াছিলেন। এ না হ'লে, যার নাম কাত্তিক, বিনোদ, অথবা সুকুমার হইতে পারিত, সে ভবেশ হইল কেন? একবার তাঁহার মনে হইল, এটি যদি তাঁহার নিজের সন্তান হইত! কিন্তু এই কথা তাঁহার মনে হইবামাত্র মনটা তাঁহার ছাঁৎ করিয়া চমকিয়া উঠিল,—"ভগবান্ রক্ষা করুন! ভাগ্যে তাহা হয় নাই! তাঁর ছেলে হইলে এর পরিণাম সম্বন্ধে কিছুরই ত নিশ্চয়তা ছিল না! এ তবু পরের ছেলে হইয়াছে বলিয়া শিষ্যত্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছে! এই ঢের, ইহার অধিক লোভে কায নাই। আদিত্যেশ্বর এইটুকুই এখন বজায় রাখিলে বাঁচা যায়।

ছেলেটি মোহান্তের কাছেই রহিল। অতিথিশালা, অথবা অন্য পরিজনবর্গের মধ্যে সে নিজের স্থান লইতে গেল না। মোহান্তও তাহাকে এ

সম্বন্ধে একটি কথাও বলিলেন না, তিনি যেন মনে মনে এইটুকুই চাহিতেছিলেন। অথচ, সে নিজে হইতে এই ব্যবস্থায় না আসিলে, তাহাকে এ সম্বন্ধে কিছু মুখ ফুটিয়া বলিতে তাঁহার যেন কোন্‌খানটায় বাধিতেছিল। বোধ হয়, সেটা সন্ন্যাসীর বাহ্যাড়ম্বরের খাতিরে অথবা গাম্ভীর্য্যময় মোহান্তীয় মর্য্যাদায়। যাহা হউক্, ভবেশ যখন আপনা হইতে বলিল যে, সে এইখানেই একটুখানি নিরিবিলিতে থাকিতে চাহে, অত লোকের মধ্যে সে যাইবে না, তখন যেন কৃতার্থম্মন্য হইয়া সেই চিরগম্ভীর-প্রকৃতি ব্রহ্মচারী, সর্ব্বত্যাগী হইয়াও পাইবার-আকাঙ্ক্ষায়-আকণ্ঠ-পরিপূর্ণ সন্ন্যাসী, সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তাইয়া গিয়া তাহার আবেদন অনুমোদন করিলেন। ফলে খুব অল্পদিনের মধ্যেই সকলে দেখিল যে, এই নূতন-আসা আগন্তুকটি তাহাদের সকলকার একান্ত প্রার্থিত স্থানটিতে যে রকম ভাবে দখল লইয়াছে, দস্তাবেজের লেখায় ইহাকেই মৌরসী পাট্টা বলা যাইতে পারে।

সকলেরই বুক কম বেশী ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলিতে লাগিল। মোহান্তজীর চেলাদের ভিতর প্রধান প্রধান জন কয়েকের, বিশেষতঃ গুরু-ভাই মহেশ্বরানন্দের এবং শিষ্য উমেশানন্দের মুখ ঈর্ষায় কালো হইয়া উঠিল। না জানি কোথা হইতে এই দুগ্ধপোষ্য শিশু সহসা বামন-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া দেখিতে দেখিতে তাহার ছোট ছোট দুইটি পদে স্বর্গমর্ত্ত্য ঢাকিয়া ফেলিয়া তৃতীয় পদে এখন আরও কিছু চাপা দিতে চাহে। এ যেন একটা বিপ্লব, যেন আকস্মিক ভূমিকম্পের অগ্ন্যুৎপাত, জলপ্লাবন। কোথাও কিছু নাই, একবারে হু হু করিয়া আসিয়া পড়িয়া পুরাতনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে চাহে। এ আপদের কি কোন শাস্তি হয় না?

চৌধুরীরা এ দেশ ছাড়িয়া অবধি এ দেশে আলোচনার জিনিষটা কিছু কম পড়িয়াছিল; কারণ, ক্রিয়াকর্ম্ম, ব্রাহ্মণভোজন, এ সব করার লোক আর কই? সংসারের নিয়মই এই যে, যাহার কাছে পাওনা আছে, তাহারই

কাযের খুঁৎ ধরিয়া পাওনাদাররা খুঁৎ খুঁৎ করে, যেখানে পাওয়ার আশা একবারেই ব্যর্থ, সেখানে মিথ্যা কেহ কথা কহে না।

দেশে বড় লোক থাকিতে আলোচনাও বড় বড় হইত। এখন যেমন দরের লোক, তাহাদের বিতর্কও তদনুরূপ। দিনকতক পূর্ব্ব-মোহান্ত যখন প্রথম ধার্ম্মিক হন, সেই সময়টায় কিছুদিন ধরিয়া গাঁয়ের লোক মেয়ে-পুরুষে দুইটা কথা কহিয়া বাঁচিয়াছিল, আর বর্ত্তাইল এখন।

মোহান্ত এই বুড়া বয়সে একটা পাগড়ী-বাঁধা পাঞ্জাবীদের ছেলেকে যে পুষ্যি বানাইয়াছেন, এই খবরটা দেখিতে দেখিতে আদিত্যপুর ছাড়াইয়া কাছাকাছি যে কয়খানা গাঁ ছিল, সব কয়খানাতেই ছড়াইয়া পড়িল। আজকাল মেয়ে-পুরুষের জলস্থলের সকল বৈঠকে কেবলমাত্র ঐ একটিমাত্রই আলোচনা যে, মোহান্ত ঠাকুর তাঁহার পুরানো চেলাদের বঞ্চিত করিয়া, এক নূতন চেলা খাড়া করিয়াছেন। এই সঙ্গে অনেকেই আবার অনেক রকম জল্পনা-কল্পনা করিলেন, বড় বড় টিকা, ভাষ্যকারদের হারাইয়া অনেক রকম টীকা-টিপ্পনীও চলিতে লাগিল। কেহ বলিল, "ভিতরের কথাটা যে না বোঝা গেছে, তা নয়, তত বোকা কেউ নেই। উইল করে দে'বার ত আর উপায় নেই, তাই চেলা বানিয়ে ওয়ারিশানটাকে বজায় রাখতে হচ্ছে!"

কেহ বলিল,—"ও কথা কাযের কথা নয়! সে রকম যে এ মোহান্ত ঠাকুরের কেউ আছে, তা ত কোন দিনই কেউ শোনে নি। সে বরং আগের মোহান্তের সময় বল্‌লে সাজতো। এ ত সে রকম মানুষ নয়। তা' নয়,— কুড়নোই বটে; তবে ছেলেটার কি ব্যাপার, সেইটেই ঠিক যেন বোঝা যাচ্ছে না! এত সুন্দর আর অত কম বয়সী ছেলে; সন্ন্যাস নে'বার ওর এর মধ্যে কি হলো যে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো?"

অপর ব্যক্তি বলিলেন, "ও যে কে, সে আমি ঠিক ধ'রে ফেলেছি। সাপের হাঁচি বেদে বই কি আন্‌লোকের চেন্‌বার সাধ্যি আছে! কোন

দিন তোমরা কেউ ওর গান শুনেছ? শোন নি? তা হ'লে বুঝতেই পারবে না। ও রকম সুর এক কল্‌কাতা, দিল্লী আর লক্ষ্ণৌএর বাইজীদেরই গলায় আছে! যখন গান করে, মনে হয়, লক্ষ্ণৌ ঠুংরি আপনি বেরিয়ে এসে সাম্‌নে দাঁড়িয়েছে!"

শ্রোতৃবৃন্দ এ সংবাদে একবারে বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল, "বল কি? এমন ধারা? তা ত আমরা জানি নে। আর জান্‌লেই বা করব কি? তোমার মত আমাদের ত মহারাজের কাছে যাওয়া আসা নেই। তা' একটা দিন নিয়ে যেয়ে শুনিয়ে আনো না,—কেমন গায়, দুটো শুনে আস্‌বো।"

যিনি ভবেশের গান গাওয়ার খবর দিয়াছিছেন, তিনি মুখ বিকৃত করিয়া উত্তর দিলেন, "ছোকরাটা তেমনই কি না! সে দিন আমি হঠাৎ গিয়ে পড়েছি, তাই শুনতে পেয়ে গেছলাম। তার পর কত সাধ্যি-সাধনা করা হলো; কোনমতেই আর গান শেষ করলে না। মোহান্ত পর্য্যন্ত বল্লেন, গাও না, তাতে ক্ষতি কি! তবু না! ভয়ঙ্কর একরোকা ছেলে।"

শ্রোতাদের মধ্যের এক জন প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, ঐ যে তুমি তখন কি বল্‌ছিলে যে, ও কে, তা জান্‌তে পেরেছ, তা কৈ বল্‌লে না ত? ও কে, বলবে কি?"

আর একটি লোক ঐ সময়েই প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, গান যে গাইছিল তার ভাষাটা কি? হিন্দি? না ফার্সি?"

বক্তা একজনের কথার উত্তরে কহিলেন, "ও কোন নামওলা বাইজীর ছেলে, ওর রূপ দেখে আর গলা শুনে আমি ধ'রে ফেলেছি। ওর মাকে আমি কলকাতার এক রাজবাড়ীতে মুজ্‌রো করতে দেখেছিলুম কি না, তাই একে দেখেই চিন্‌তে পারলুম। আর ঠিক সেই গলাটি যেন বসানো আছে।"

"সে কত দিন হবে গা, চক্কোত্তী মশাই? এখনও তোমার ঠিক মনে

আছে ? আমার ত এক বছর আগে দেখা লোকের মুখ মনে থাকে না, গলাও কাণে থাকে না।”

চক্রবর্ত্তী একটুখানি কৃপার সহিত হাসিলেন, “এ চক্কোত্তীর বেটার মাথাটা ভগবান্ হাইকোর্টের জজের মাথার মালমসলা দিয়ে গ’ড়েছিলেন যে! কেবল ঐ ছ দিনের রাতে মা বেটী আমার ঘুমিয়ে মরেছিল বলে কপালের লেখনখানিই অন্যের সঙ্গে বদ্‌লে গেছে। আমি যখন দিল্লীওয়ালী বাইজীর গান শুনি, তোরা তখন কেউ হামা দিচ্ছিস্, কেউ হয় ত মায়ের গর্ভে যোগাসনে আছিস্। তবু যা এক বার এই কাণের তারে ঘা দিয়েছে, সে একবারে ঐখানে কায়েম হয়ে ব’সে গেছে। বলি, এই কলের গান শুনেছিস ত? ঐ একবারই না ওর মধ্যে গাওয়া হয়েছে, অথচ সুরটা সেখানে রয়েই গেছে! আমারও ঠিক তেম্‌নি।”

একটি কমবয়সী শ্রোতা কহিল, “আর ঠাকুর্দ্দার চোখে বোধ হয় ফটোগ্রাফের প্লেট বসানো আছে ?”

ঠাকুর্দ্দা সোৎসাহে যুবার দিকে চাহিয়া হাসিমুখে কহিলেন, “ঐ যা বলেছিস্ ভাই! হ্যাঁ, তার পর নবনে কি জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলি রে ? গান হিন্দি না ফার্সি ? তা কেন ? খাসা পরিষ্কার বাঙ্গালা গানই ত গাচ্ছিল। কি যে ঐ গানটা—আমাদের খুবই ত জানাশুনো রে! বেশ যে কথাগুলি, সুরটিও একটু গম্ভীর গম্ভীর, ঐ সাঁওতালদের মাদল বাজানোর মত, হ্যাঁ, ভাল মনে পড়েছে,—

> ‘গাও হে তাঁহারই নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম,
> দয়ার যার নাহি বিরাম ঝরে অবিরত ধারে।’

খাসা গাইছিল, কিন্তু আমায় দেখে চুপ করলে; কিছুতেই আর গাইলে না। মা মাগী পয়সা নিয়ে গাইতো কি না, ছোঁড়া কি কম! যেখানে কোন পাওনা নাই, সেখানে গাইবে কেন ?”

শশী ইহার প্রতিবাদ করিল, "বাঙ্গালা গায়, তা হ'লে দিল্লীওয়ালী বাইজীর ছেলে কি বল্‌লেন ?"

এই অপ্রতিদ্বন্দ্ব আবিষ্কারের মধ্যে এবম্প্রকার প্রতিবাদে ঈষৎ চটিয়া উঠিয়া চক্রবর্ত্তী কিছু রুষ্টস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "তার আর আশ্চর্য্যিটা কিসের রে শশে ? ওদের কি কোন জাত আছে না ভাষা আছে ? আরে তাই যদি থাকবে, তা হ'লে মহম্মদ সার নাতির অন্নপ্রাশনেও নাচলে, আবার কলকাতার ওই মহারাজার পৌত্তুরের বিয়েতেও মুজরো কর্‌তে এলো কি ক'রে ? ওরা ত ঐ রকম ভোল ফিরিয়ে ফিরিয়েই বাদশা থেকে বাবু পর্য্যন্ত বশ ক'রে রেখেছে।"

তরুণটি কহিল, "তা যেন মানলুম। তবে বাইজী-পুত্র হঠাৎ সাধু হ'ল কেন, এর কি ঠিক করেছেন বলুন ত ?"

চক্রবর্ত্তী তখন নিশ্চিন্ততার হাঁফ ফেলিয়া, নিজের বহুদর্শিতার আনন্দ দন্ত দ্বারা প্রকটিত করিয়া, মৃদু মৃদু হাস্যের সহিত মিশাইয়া দিয়া মীমাংসা-টাকে প্রকাশ করিতে লাগিলেন,—

"তা—ওই রকমই ত সংসার-ক্ষেত্রে ঘটে থাকে রে ভাই ! ও যদি না সাধু হবে, তা হ'লে তুমি আমি কি হবো ? মনের ধিক্কার রে দাদা ! মনের ধিক্কারে মানুষকে যে কোন্ দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলে, তার কি কিছু ঠিক ঠিকানা আছে ? ভেবেছে, এই রকম সাধু হয়ে একটি কোণের ভেতর লুকিয়ে থাকলে ওর আসল পরিচয়টা আর বুঝি কেউ জান্‌তে পারবে না ! শাস্তরেও ত আছে কি না, মায়ের আর শ্বশুরের নামে যে পরিচয়—সে অধম।"

একটি লোক এতক্ষণ কোন কথাই কহে নাই। সে এতক্ষণ সব কথা শুনিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল, "ছোঁড়াটা আসল জোচ্চোর ! বুড়টাকে তুতিয়ে-পাতিয়ে গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে শেষে ওর মাথায় হাত বুলুবে, সেই ফন্দিতেই এসে ঢুকেছে।"

"থিয়েটারের অ্যাক্টর হওয়াও বিচিত্র নয়!"

"হতেও পারে বোমার দলের পলাতক কেউ! তা যদি হয়, তা হ'লে মোহান্ত ঠাকুরটি শুদ্ধ ফাঁসবেন এবার! একেই গবর্ণমেণ্ট এই সব মোহান্ত-হন্তীর পক্ষপাতী নয়, এটাকে যদি সিডিসনীষ্টদের আড্ডা ব'লে সন্দেহ হয়, তা হ'লে বুড়ো বয়সে ভদ্রলোককে পুলিপোলাও না ক'রে দেয়!"

"দেখ, এখন কার বরাতে কি নাচছে। মোদ্দা মহেশ্বর ঠাকুর আর মহেশ্বর পুরী হ'তে পাচ্ছেন না, এটুকুন ঠিকই হয়ে গেছে।"

আবার ইহারও প্রতিবাদ উঠিল, "তাই কি কেউ বল্‌তে পারে? শাস্তরে ব'লেছে, স্ত্রিয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

তা দেব-মানব যিনি যাহা জানুন বা না-ই জানুন, ভবেশের প্রতি মহেশানন্দের প্রগাঢ় আনুরক্তির সংবাদটা কাহারও জানিতে বাকি রহিল না। সে এমন আকর্ষণ,—যে যদি ভবেশ একটি ছেলে না হইয়া তার উল্টা জাতের কেহ হইত, তবে তাহা লইয়া আর বলিতে বা কহিতে কাহারও কোন কিছুই বাধা পড়িত না। পূর্ব্ব-মোহান্ত ভবানন্দ তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত জানিয়াও পূর্ব্বে বেশ একটুখানি বেলায় উঠিতেন। তাহার পর ঘণ্টাখানেক সময়ও জন চার পাঁচ ভৃত্য তাঁহার প্রসাধনের সাহায্য করিত। তাহার পর তাঁহার প্রাসাদের অন্তর্গত একটি সুবৃহৎ মর্ম্মর-গৃহে তিনি উপাস্যকে স্মরণার্থ প্রবেশ করিতেন। কোমল শয্যায় সুখস্পর্শ ব্যাঘ্র-চর্ম্ম বিছাইয়া ফুল-চন্দন ধূপ-ধূনা কস্তুরী-কেশর ও তাহার সঙ্গে মিশাইয়া ফ্রেঞ্চ পুষ্পসারের গন্ধে ভারাক্রান্ত সেই হর্ম্ম্যতলে দেবতা বা বিলাস-সঙ্গিদল কাহাকে বেশী মনে পড়িত, তিনিই জানেন। মহেশানন্দের অভ্যাস ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ভবেশ মহেশানন্দের ঠিক পাশের ঘরেই শোয়। অতি প্রত্যূষে ঘুম ভাঙ্গিয়া সে আপনি জাগিয়া উঠে। অমনই সেই সঙ্গে এ ঘরের মধ্যে আসিয়া

মহারাজেরও ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয়। তাহার পর চাকর-বাকরের বে সাহায্য না লইয়া কেবলমাত্র ভবেশের সাহায্যেই মোহান্তজীকে তাঁহার স প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া লইতে হয়। ইহার পর তাঁহারা দুইজনেই গিয়া উপাসনা-গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেন। কিছুক্ষণ ভবেশের গুরু-গিরি করিয়া, তাহার পর তাহার সঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া এই বৃদ্ধকালে তিনি যে রকম নিশ্চিন্ত শান্তির সহিত ভগবানের উদ্দেশে জপ-তপ-ধ্যান-ধারণা, আসন-প্রাণায়াম করিয়া যান, তেমন তাঁহার জীবনে কোন দিন তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল বলিয়া কোন রাত্রি-স্বপ্নেও দেখিতে পান নাই। দীর্ঘজীবনটা শুধুই শুষ্ক কঠোরভাবে তপস্যা করিয়া গিয়াছেন, ফল আজই যেন ফলিয়া উঠিয়াছে।

মহেশানন্দের গুরু উমেশানন্দ পুরী মহারাজ মানুষটা ডাকসাইটে বিদ্বান্ ছিলেন বলিয়া একটা নাম আছে। দুরূহ শঙ্করভাষ্যের একখানা ভাষ্য টীকা তিনি না কি লিখিয়া ছাপাইয়াছিলেন। ভবানন্দকেও তিনি পড়াশুনা নেহাৎ মন্দ করান নাই। তবে তাঁহার মৃত্যুর পর স্বয়ং মোহান্ত হইয়া পূর্ব্ব-শিষ্য আর সে সকলের চর্চ্চা বড় একটা করিতেন না। তাহা শুধু তিনি কেন? একজামিন পাশ হইয়া চাকরীতে ঢুকিবার পর লেজার বুক বা জুরিস্‌ডিকস্‌ন্, এই ধরণের জিনিষ ছাড়া ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ আর কে কাহার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া চলিয়া থাকেন? মহেশানন্দ বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, তিনি পড়ার মধ্যে ঢুকিয়া থাকেন।

আজকাল এই নূতন শিষ্যের পাল্লায় পড়িয়া এই বয়সে আবার তাঁহাকে নূতন করিয়া পুঁথি পত্র খুলিয়া বসিতে হইয়াছে। মহেশানন্দের এই নূতন ছাত্রটি একবারে সংস্কৃত ভাষার স-টি পর্য্যন্ত জানিতেন না। এই বয়সে ক খ গ ঘ করিয়া অক্ষর পরিচয় করানো বড় সোজা কথা নহে! বিশেষ যাহাকে ভাই ভাইপো, ছেলেমেয়ের জন্য কোন দিনই ও কায করিতে হয়

নাই, যিনি এম-এ ক্লাশের ছাত্র পড়ান, তাঁহাকে হঠাৎ যদি পাঠশালার গুরুমহাশয়গিরি করিতে হয়, তাঁহার যে দশা ঘটে, ইঁহারও তাহাই হইল! ভবেশ কিছু কুণ্ঠিত হইল। বলিল, "গোড়ায় না হয় আর কারু কাছেই পড়া নিই? তাকে কিন্তু এইখানে বসেই পড়াতে হবে।"

মহেশানন্দ এ কথায় ব্যস্ত হইয়া উত্তর করিলেন, "তাও কি হয়? ওরা না কি কোন যত্ন নিয়ে পড়াবে? তুমি আমার কাছেই শেখো না, শিখবে কি?"

ভবেশ মনে মনে খুসীই হইল, প্রকাশ্যে একটুখানি দ্বিধা জানাইয়া বলিল, "আপনার ভারি কষ্ট হবে।"

মহেশানন্দ বাধা দিয়া কহিলেন, "আহা, হয় একটু, তাই হোক না। কষ্টও ত একটু পাওয়া ভাল। নিছক মিষ্টি খেতে কি ভালই লাগে! মুখটা না হয় তেতো দিয়েই বদ্‌লাবে।"

মনে মনে বলিলেন, "ওরে আমার কুড়িয়ে পাওয়া মাণিক! তোর জন্যে সকল কষ্টই যে আমার মাথার মুকুট করে নিতে পারি। এই যে আমার পরম সুখ।"

সকাল, বিকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, যখন তখন শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে পঠন-পাঠন চলিতে লাগিল। মহেশানন্দ একদিকে বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে আর একদিক দিয়া, তাঁহার এই অত্যন্ত জ্ঞান-পিপাসু ও মেধাবী ছাত্রটিকে দর্শনশাস্ত্রের অনেক দুরূহ ব্যাপার মুখে মুখে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বঙ্গাক্ষরে লিখিত কালিদাসের কাব্য লইয়া তাহাকে তাহা এতই সযত্নে বুঝাইয়া দিতেন যে, ব্যাকরণের সন্ধি-বিচ্ছেদ শেষ হওয়াব পূর্ব্বেই ভবেশ সংস্কৃত কাব্য ও দর্শনশাস্ত্রের সহিত অর্দ্ধপরিচিত হইয়া আসিল। এ ভিন্ন আরও নানা কথার আলোচনা তাহাদের মধ্যে হইত। মহেশানন্দ ইংরাজী ভালরূপই জানিতেন। কিন্তু তাহার কোন ব্যবহার করিতেন না। ভবেশও

কিছু কিছু জানে। একখানা নামজাদা ইংরাজী দৈনিক তাহার জন্য আসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উহা হইতে ভবেশ তাঁহাকে বাছিয়া সংবাদ জানাইত। কোন সারগর্ভ প্রবন্ধ থাকিলে কাগজ-পেনসিল লইয়া সেটি বাঙ্গালায় তরজমা করিত। তাঁহাকে তাহা শুনাইত। মহেশানন্দ যত না তাহাদের প্রতি আকর্ষণে, শুধু ভবেশের তুষ্টির জন্যই অত্যন্ত আগ্রহের ভাণ করিয়া সেই সব তন্ময় হইয়া শুনিতেন। এই তন্ময়তাটুকুও তাঁহার আসিয়া পড়িত ভবেশের সেই মৃদু গম্ভীর অথচ সুসংযত সুললিত কণ্ঠস্বরের সুপ্রাচুর্য্যে। ভবেশ যে তাঁহার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, এই কথাটাই ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইয়া তাঁহার মনের ভিতরটাকে বাপীজলে বাসন্তী সমীরোৎপন্ন মৃদু মৃদু বীচি-বিক্ষেপের মতই সুধীরে আন্দোলিত করিত। কখন কখন সহসা দুই চোখ ভরিয়া জলের আভাস দেখা দিয়া অন্তরের অভ্যন্তরে একটা সুদীর্ঘতর দীর্ঘশ্বাস জমাইয়া তুলিত। পূর্ব্বস্মৃতির চকিতোদয়ে অনুতপ্ত চিত্ত, প্রাণ যেন এই বলিয়া নিজের কার্য্যফলের ভারকে কতকটা হাল্কা করিয়া লইতে চাহিত যে, যদিই ইহাকে দিলে, বছর কতক আগে দিলেই হইত!

৩

এমনই করিয়া দুঃখের মেঘে সুখের বর্ষণ লাভ করিয়া, মহেশানন্দের দিন কাটিতে লাগিল। ভবেশের এখানে আসার পরে প্রায় দুই বৎসর কাল কাটিয়া গিয়াছে। দুই বৎসর সময় নিতান্ত অল্প নহে। এই দুই বৎসরে জগতের আগাগোড়া সমস্তটাই বদলাইয়া যাইতে পারে। তা আগাগোড়া নাই হউক, এই দুই বৎসরে আদিত্যপুরের অনেক কিছুই বদলাইয়াছিল। প্রথমতঃ দেশের লোকের কাছে এখন ওই রহস্যময়—অজ্ঞাত-পরিচয়

বালকাকৃতি কিশোর আর নিতান্ত দুর্গ্রহের প্রেরিত প্রতিনিধির মতই আতঙ্কের বিষয় ছিল না !

যদিও ভবেশ পূর্ব্বের মত আজও সেই কোণের ভিতরেই আধ-ঢাকা হইয়া একমাত্র মহেশানন্দের অধীনেই জীবন যাপন করিতেছিল, তথাপি আজকাল মহেশানন্দের মধ্যে কত বড় পরিবর্ত্তনটা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা এই ক্ষুদ্রাকৃতি তরুণটিরই যে সাহচর্য্যের অনিবার্য্য ফল, সে বিষয়ে এই গ্রামের ছোট বড় ভাল মন্দ সকলকারই মনে কিছুমাত্র সংশয় ছিল না।

একটি পাঠশালামাত্র এত দিন আদিত্যপুরের একমাত্র সম্বল ছিল, বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় এবং শুভঙ্করের সট্‌কে, নামতা, কড়াঙ্কে, পণকিয়া বুড়িকিয়া পর্য্যন্ত এখানকার বিদ্যাশিক্ষার সীমা ছিল। আজি প্রায় এক বৎসর হইতে যায়, তাহার স্থানে একটি মিডল্ ইংলিশ স্কুল এবং মহেশানন্দ বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। অর্থাভাবে মিত্তিরদের প্রতিষ্ঠিত যে দাতব্য চিকিৎসালয়টির কার্য্য বন্ধ হইবার উপক্রম করিয়াছিল, এখন সেখানে একজন ভাল পাশকরা এম-বি ডাক্তার আসিয়া, জলের পরিবর্ত্তে কুইনিন, পিল, পুরিয়া, মিক্‌শ্চার প্রভৃতি নানাকারের বিশুদ্ধ কুইনিন্ অজস্র পরিমাণে বিতরণ করিতেছেন। পূর্ব্বতন ক্যাম্বেলপাশ ডাক্তারটি ইঁহার কম্পাউণ্ডারীতে লাগিয়া গিয়াছে। আর সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা হইয়াছিল, গ্রামের মধ্যে পাকা রাস্তা ও দুইটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করায়। বর্ষাকালে এ দেশে পথ চলা একটা দুর্দ্দৈবেরই সামিল হইয়া পড়িয়াছিল। কাঁচা রাস্তা পায়ে-পায়ে যেন কাদা—ঘোল হইয়া যায়, জল-নিকাশের ব্যবস্থা নাই, বর্ষার জল অবিরল ধারায় পথের উপর দিয়াই চলিতে থাকে, ফলে কোনখানের কাদা ধুইয়া প্রকাণ্ড গর্ত্ত বাহির হইয়া পড়ে, কোথাও পিচ্ছিল —পথিককে আছাড় খাইতে খাইতে চলিতে হয়। ইহার উপর গরুর গাড়ীর কৃপায় সে রাস্তায় আরও কি দুর্দ্দশা না হয়, তাহা বলা যায় না।

এই সমস্ত রাস্তাটি খোয়া দিয়া পিটাইয়া, রোলার দিয়া ঘষিয়া যখন পাকা করা হইল, তখন দেশের লোক মোহান্তকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া তাহার বেশীর ভাগটাই খরচ করিয়া বসিল—তাঁহার শিষ্যটিরই উপরে। কে জানে, কেমন করিয়াই তাহাদের মনে দৃঢ়বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছিল যে, এই যে সমস্ত সদনুষ্ঠান আজকাল মোহান্তজীর দ্বারা সংঘটিত হইতেছে, মোহান্তজীব নির্লিপ্ত উদাস চিত্তটিকে সংগঠিত করার মূলে কিন্তু আর একখানি কোমল তরুণ চিত্ত কার্য্য করিতেছে। সে আর কেহ নহে—ভবেশ।

দুই এক জন এ সম্বন্ধে প্রথমটায় ঈষৎ সংশয় প্রকাশ করিতে গেলে, সঙ্ঘের পক্ষ হইতে তীব্র প্রতিবাদ উঠিয়াছিল যে, "তাই যদি না হবে ত এতদিন এ সব হয় নি কেন?"

অপরপক্ষ ইহাতেও হটিয়া যায় নাই। উহারা বলিয়াছিল, "হয় ত ঠিক সময়েই তাঁহার মনটা এই দিকে চ'লে এসেছিল। ও না এলেও—হয় ত এ সব হতো।"

প্রতিবাদকরা হাসিল, "কাকতালীয় ন্যায়! কাকটা বসলো আর তালটাও পড়লো, কাকে ফেল্লে না আপনি পড়লো! না মশাই! যেটা প্রত্যক্ষ, সেইটেই বিশ্বাস করতে রাজী আছি, এত সূক্ষ্ম ভেবে 'হয় তা'কে বিশ্বাসের আসনে বসাতে পারছি নে।"

তবে এক বিষয়ে দেশের লোক অনেকটা একমত। ভবেশ লোকটী যে বিষম গর্ব্বিত,—এ সম্বন্ধে কাহারও ভিতর মতদ্বৈধ ছিল না।

সাধন-ভজন, আর পঠন-পাঠন ত অনেকেই করে, তাহা বলিয়া এতটাই প্রচার সবাই করে না। মোহান্তের যত্ন সেবা যাহা এতদিন তাঁহার চাকররাই করিত, অথবা তাহারাও ঠিক করিত না, এবং তিনিও তাহা লইতে চাহিতেন না, সে সমস্তই এখন প্রায় ভবেশ একচেটে করিয়া লইয়াছে। কেহ দেখা করিতে আসিলে, নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলে উত্তর দেয়, "এখন

আমার অমুক কাযটা করিতে বাকি, এখন আমি অমুক কায করিব।” কেন রে বাপু, এতটা খোসামোদ না হয় না-ই করিতিস্! ওগুলা যাহাদের হাতে ছিল, তাহাদেরই ফিরাইয়া দিয়া একটু লোকালয়ে মুখ বাহির কর্ না কেন? তাহা ত মতলব নহে, ও একটা ছুতা। আসল কথা তিনি নিজের রূপের, বয়সের এবং বিদ্যার গৌরবে কাহাকেও নিজের যোগ্য মনে করেন না, তা' মিশিবেন কাহার সঙ্গে? অথচ লোকটির মধ্যে এমনই একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যে, হাজার সে তুচ্ছ করুক, তথাপি একবার তাহাকে যে চোখে দেখিয়াছে, তাহাকে ঘুরিয়া ফিরিয়া মধ্যে মধ্যে পাঁচ সাত দিন পরে পরেও একবার অন্ততঃ শুধু চোখের দেখা দেখিতেও আসিতে হইবে! তা কথা যদি বা সে না-ও কহে।

মোহান্তর মধ্যে বাস্তবিকই একটা বড় রকম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল! তাঁহার মনে হইত, তাঁহার জীবনের এই যেন সকালবেলা। পূর্ব্বদিকটাকে এই সবেমাত্র কাঁচা সোনায় রঞ্জিত এবং উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া তরুণ অরুণ স্মিতপ্রফুল্লমুখে দেখা দিয়াছেন। রাত্রির অন্ধকার-তমোরাশি সেই সমুজ্জ্বল আলোক-সম্পাতে যেন নিজের হীনতার অভিমানে একবারে নিঃশেষে মরিয়া গিয়া সেই দারুণ লজ্জাকে ঢাকিতে পারিতেছে না,—সম্মুখে নবরবি-কিরণোজ্জ্বল দিন।

সেই যে দিনটা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, সেটা বাস্তবিকই দিনের বা গোধূলির রক্তরাগোজ্জ্বল অভিনব শ্রী—সেইটুকুই শুধু এই মুগ্ধ-লুব্ধ অকালবৃদ্ধের চোখে ধরা পড়ে নাই।

তবে একবারেই যে পড়ে নাই, তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। অনাস্বাদিত আনন্দে পরিপূর্ণ পাত্র হইতে সুধাস্বাদ করিতে করিতে কখন বা চকিতে মনে হইয়াছে—না জানি, সহসা কোন্ সময় তাঁহার এই চির-বঞ্চিত জীবন দুই দিনের সুখটুকুকে হারাইয়া ফেলিবে! মৃত্যুর কথা মনে

আসিলে আজকাল তাঁহার শুষ্কনেত্রে জল ভরিয়া উঠে। ভবেশকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, মনে পড়িলেই মরণকে যেন দুই হাতে ঠেলিয়া রাখিতে মন চাহে। দুর্ভিক্ষপীড়িত ভিক্ষুক যেমন অন্নসত্রের দ্বাররোধের আশঙ্কায় অস্থির হইতে থাকে, চিরবৈরাগী মহেশানন্দেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল।

কিন্তু এত করিয়াও মহেশানন্দ ভবেশের প্রকৃত স্বরূপকে যেন ভাল খুঁজিয়া পাইলেন না। সে যেন এত কাছাকাছি থাকিয়াও—বহু দূরে—বহু দূরেই থাকিয়া গেল। সে যে কে, কেন এই তরুণ বয়সে এত রূপ-গুণের সঞ্চয় লইয়া এমন করিয়া বিবাগী—ঘরছাড়া হইয়া বেড়াইতেছে, এইটুকু জানিবার জন্য আর সকলের মতই তাঁহারও মনের মধ্যে বড় কম কৌতূহল জাগ্রত ছিল না। কিন্তু সে যেটুকু বলে, তাহাতে ঠিক যেন মন ভরে না। সে শুধু এই বলে যে, তাহার বাপ-মা মারা গিয়াছেন, ভাই, বোন্, আত্মবন্ধু কেহ কোথাও বর্ত্তমান নাই; তাই সে সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া শূন্য ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে। ইহার বেশী পরিচয় তাহার নাই।

কিন্তু ইহার অপেক্ষা ঢের বেশী পরিচয় যে তাহার আছে, এই কথাটা মহেশানন্দের অনুভূতি তাঁহাকে জোর করিয়াই শুধু একবারমাত্র নয়, বার বারই বলিয়াছে। এই যে কয়টি কথার ক্ষুদ্র পরিচয়, এই একটুখানি জিনিষ—সীমার ভিতরকার জিনিষ, ইহাকে ত সহজেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় এবং সানন্দেই মানিয়া লওয়া চলে। বড় জোর ইহার উত্তরে মনের মধ্যে মনের ভাবটাকে চাপা দিয়া মুখে বলা যায়—"আহা!" ইহার বেশী ত ইহার মধ্যে কিছুই করিবার নাই। কিন্তু যেটা সীমার বাহিরের বস্তু, সেটাকে সীমা দিয়া মাপিতে গেলে তাহার ফাঁকিটা ধরা পড়িতে সময় লাগে না। ভবেশ ছেলেটির ঐ শান্ত, মৌন, সেবা-শুভ্র, জ্ঞান-পিপাসিত বুকের মধ্যে কিছু একটা লুকোনো আছে, সেটা তাহার অনাথ জীবনের বেদনার অপেক্ষা

আরও একটু কিছু বেশী, এটুকু মহেশানন্দ তাঁহার বোধের মধ্য দিয়া বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু সে যে কি, সেইটুকুই জানা গেল না এবং এই জানা এবং না-জানার মাঝপথটায় দাঁড়াইয়া মহেশানন্দের চুরি করিয়া পাওয়ার সমস্ত আনন্দটুকুই যেন কেমন একটা আশঙ্কার ছায়ায় বিবর্ণ হইয়া রহিল। অথচ আনন্দেরও যেন শেষ নাই। সেই আনন্দেই চিরদিনের নিশ্চেষ্ট জড়ীভূত জীবনটাকে স্রোতের টানে ভাসাইয়া লইয়াছিল।



৪

সারা মধ্যাহ্নটা বিবেকচূড়ামণির আনন্দময় কোষ লইয়া শিক্ষকে ছাত্রে কোথা দিয়া যে কাটাইয়া ফেলিয়াছেন, দুই জনেরই সেটুকু খোঁজ-খবর ছিল না। বেলাটা যে আর শেষ হইতে বাকি পড়িয়া নাই, সেইটুকু দুজনকারই একসঙ্গে হঠাৎ হুঁস্ হইল। পশ্চিমের দিক্ হইতে সামনের প্রকাণ্ড বারান্দাটা পার হইয়া আসিয়া, ঘরের মধ্যে সুখাসীন উভয়ের মুখের উপর সুপ্রসন্ন স্বর্ণোজ্জ্বল রৌদ্র হাসিমুখে চাহিয়া দেখামাত্র ভবেশ ঈষৎ কুণ্ঠিত মুখেই তাড়াতাড়ি আলোচনার মাঝখানে আলোচ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া গেল। কিন্তু মহেশানন্দ তখনও পূর্ব্বালোচিত বিষয়েরই অনুসরণে কহিতে লাগিলেন—

"এই যে শ্লোকটি, এটি অতি চমৎকার প্রয়োগ হয়েছে,—'কস্তাং পরানন্দরসানুভূতিং'।"

বই বন্ধ করিয়া ভবেশ বলিল, "আজ অনেকক্ষণ ধ'রে পড়া হয়ে গেছে। পাঁচটা বাজে, চলুন, এখন আমরা একটুখানি বাইরে যাই—"

মহেশানন্দ একবার চকিতনয়নে বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বেলা পড়িয়া গিয়াছে বটে, সূর্য্যের আলো আছে, তাহাতে তেজ নাই। সে

আলো শুধুই স্মিত-শুভ্র-নির্ম্মলতায় ভরা, দহন-বিহীন অগ্নির মত। পুনশ্চ দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া ভবেশের দিকে চাহিলেন,—

"কিন্তু শোন ভবেশ! যদিও—"

উঠিয়া পড়িয়া ভবেশ কহিল, "আজ আর নয়, একে আপনার শরীরটা তেমন সুস্থ নেই, তার পর প্রায় তিন ঘণ্টা এই সব নিয়ে বক্‌তে হয়েছে, আবার! আসুন, আমরা বাগানে একটু বেড়াই গে।"

উদ্যানে যেখানে ভবেশের উদ্যোগে একটি মর্ম্মর-বেদিকায় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, দুই জনে ধীরপদে পরিক্রমণ করিতে করিতে সেই দিকে গিয়া পড়িলেন। অদূরে শতরূপার নীরব নির্জ্জন তটভূমি, শ্যামল শষ্পাস্তীর্ণ তীররেখার প্রান্তে তাহার স্বচ্ছ নীলাভ জল-রেখা দেখা যাইতেছে।

শঙ্করমূর্ত্তির পাদপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া ক্লান্তস্বরে মহেশানন্দ বলিয়া উঠিলেন, "বাতের বেদনাটা একটু বেড়েছে দেখছি, ভবেশ! চল্‌বার ফির্‌বার আর বেশী ক্ষমতা নেই, বাবা!"

"তবে এইখানেই বসা যাক্, আসুন। আচ্ছা, তার চেয়ে যদি নদীতে একটু বোটখানা নিয়ে বেড়িয়ে আসা যায়, তা হ'লে কি রকম হয় বলুন দেখি? যাবেন?"

সূর্য্যের আলো আরও স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, মঠোদ্যানের গাছপালারা হাওয়ার তালে সেই সোনার আলোয় ক্রমাগতই ঝিল-মিল করিয়া উঠিতেছিল। পাখীর গানে মঠের সীমানার শেষে পলাশ ও পাকুড়-বন ও আমবাগান ঘন-মুখরিত। সন্ধ্যা-সমাগম-পূর্ব্বের একটি শান্তিস্নিগ্ধ পবিত্রতায় সমস্ত প্রকৃতি যেন বিনয়াবনত।

মনের মধ্যে যে ভাগটা নির্জ্জীব, সে দিক হইতে একটুখানি আপত্তির সুর উঠিলেও তাহার যে বড় অংশটা এই সুদর্শন এবং অনন্য-সেবাপরায়ণ

যুবকটি নিজের জোরে টানিয়া লইয়াছিল, তাহার দিক্‌কার নিরুপদ্রব বাধ্যতার আদেশই পালন করিতে বাধ্য করিল। বলিলেন, "এস, তাই যাই। কিন্তু ভবেশ! তোমার বেহালাখানা নিয়ে যাবে ত?"

ভবেশ তাহার কণ্ঠস্বরের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই এই যন্ত্রালাপটাও এত ভাল করিত যে, অন্ততঃ মহেশানন্দের মনে হইত, তাহার গানের মত তাহার বাজনা শুনিয়াও বুঝি পুরাকালের সেই শ্যামের বাঁশীর সুরে যমুনার মতই এই শতরূপাও উল্টা দিকে উজান বহিবে!

এক দৌড়ে বেহালাখানা টানিয়া ভবেশ লঘু-ক্ষিপ্র-চরণে পুনশ্চ বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া ফিরিয়া আসিল। মহেশানন্দ নির্নিমেষ-নেত্রে তাহার সেই ক্রীড়া-চঞ্চল হরিণ-শিশুর মতই চাঞ্চল্যময় লীলাগতি লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধচিত্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হাল্কা বাতাসে যে ছন্দের যে তালে তালে আমলকীগাছের পাতাগুলি সির্‌সির্ করিয়া কাঁপাইতেছিল, জীবন্ত স্কন্দপ্রতিম ভবেশের স্কন্ধচুম্বিত গভীর কালো ও ঘন কুঞ্চিত কেশের স্তরগুলি তাহার দ্রুত ধাবনের সঙ্গে সঙ্গে তেমনই করিয়া নাচিয়া নাচিয়া দুলিতেছিল। সূর্য্যের এই শেষ আলোর মতই তাহার সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল আশ্চর্য্য বর্ণচ্ছটা। ঐ প্রস্থিত মূর্ত্তিটি গভীরতর স্নেহের সহিত নিরীক্ষণ করিতে করিতে মহেশানন্দের সহসা গায়ের মধ্যে কাঁটা দিয়া উঠিল; তাঁহার হঠাৎ মনে হইল, এ যেন মানুষ নয়, এই অস্তাচলগমনোন্মুখ সূর্য্যেরই একটা রশ্মিমাত্র! মাথায় তাহার—নিবিড় বিপুল ঘন মেঘের স্তর, হাতে পায়ে গায়ে সূর্য্যরশ্মির সমুদায় বর্ণচ্ছটা ক্ষণে-ক্ষণে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। এক দিন এই সূর্য্যাস্তের মাঝখানেই সে তাঁহা হইতে এইখানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া গিয়াছে, আবার হয় ত—হয় ত আবার —সহসা কোন দিন এই পথহারা বাঁধন-ছেঁড়া সূর্য্যের আলোটুকু তাহার

আধারের সঙ্গে এই এমনই এক সূর্য্যকরোজ্জ্বল গোধূলির মধ্যেই মিলিয়া যাইবে!

এ কথা মনে হইতেই এই নিঃসম্বল বৃদ্ধের বুকের ভিতর থর্-থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল,—ওঃ, তবে সেই দিনই তাঁহারও শেষ সূর্য্যাস্ত! ওঃ ভবেশ! না না, তোমায় যেন আমি হারাই না।



নদীধারের সবুজ ক্ষেতে শেষবেলাকার যে রৌদ্র এতক্ষণ ঝল্‌মল্ করিতেছিল, তাহার স্থানাধিকার করিয়া বেশ একটি শান্ত স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার জাল পড়িয়া গিয়াছে। আকাশে খণ্ড লঘু শরতের মেঘ শিথিলিত অলস তনু স্বচ্ছ সুনীল মহাকাশে এলাইয়া দিয়া ইচ্ছাসুখে ভাসিয়া যাইতেছিল। আর নীচে নিস্তরঙ্গ নদীজলে ঠিক তেমনই ইচ্ছাসুখে ভাসিতেছিল মহেশানন্দের ক্ষুদ্র তরণী। বকশুভ্র ছোট তরীটি ভেলার মতই হাল্কা, স্তব্ধ নদীর বিশ্রামসুখে কিছুমাত্র সে ব্যাঘাতের কলরব তুলে নাই। দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে সে লোকাবাসের সীমানা ছাড়াইয়া একেবারে জনহীন প্রান্তরের মধ্যে আপনাকে ভাসাইয়া লইয়া আসিল। এইখানে আসিয়া দাঁড় টানা বন্ধ করিয়া দিয়া ভবেশ তাহার বেহালাখানা তুলিয়া লইল।

নদীর এক পাশে মুক্ত প্রান্তরের শেষ সীমা সুদূরাবস্থিত দিক্‌চক্রের গায়ে গিয়া মিশিয়া গিয়াছে, আর এক দিকে ঘনগাছের সারি জোনাকীপুঞ্জের আলো হাতে লইয়া রাত্রিচর প্রহরীর মতই স্তব্ধ, স্থির, দাঁড়াইয়া আছে। ওপারের মাঠে সবুজ হইয়া আমন ধান ফলিয়া রহিয়াছিল; তীরে একবারে জলের ধারের উপর সেই ঘন জমীর সবুজ শাড়ীর কলহংসবৎ সু-শুভ্র শাদা পাড়খানির মতই কাশের ফুল অজস্র ফুটিয়া আছে। বাতাস যেন হঠাৎ

পড়িয়া আসিল। আকাশের সেই খণ্ড মেঘগুলা পরস্পর যেন গায় গায় জড়াজড়ি, গলায় গলায় গলাগলি করিল। চাঁদ যে উঠিয়াছিল, এখন আর তাহার কোন চিহ্ন রহিল না। একখানা কালো মেঘ সুন্দরী বধূর মুখের নীলাম্বরী-অবগুণ্ঠনের মতই তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিল। আকাশের সেই নির্ম্মল নীলাভা একটা অস্বচ্ছ আবরণে যেন বাঁধা পড়িল। অন্ধকার যদিও সেই শুক্ল রাত্রিকে একবারেই গ্রাস করিতে পারিল না, তথাপি কেমন যেন একটা কোয়াসার ঝাপ্‌সার মত কিছুক্ষণের জন্য তাহার সেই সমুজ্জ্বল শ্রীটুকুকে আড়াল করিয়া রহিল। মহেশানন্দ প্রকৃতির এই সহসা নিরানন্দ পরিবর্ত্তনে মনের মধ্যে কি যেন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছিলেন। কিন্ত ভবেশ এ সবের কিছুই লক্ষ্য করে নাই। সে নিজের মনের ভিতরকার সমস্ত উপচিত আনন্দের রসে সরস করিয়া তুলিয়া নিজের অত্যন্ত সুমধুর-কণ্ঠের সহিত তেমনই শিক্ষিত হস্তের বেহালার ঝঙ্কার তুলিয়া চলিয়াছিল। বাগ্‌বাদিনীর বীণার তার হইতে বাহির হওয়া গানের মতই তাহা যেন সমস্ত আকাশকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। বোধ করি, যেন এই সুরের হাওয়ায় অভিভূত হইয়াই এই নির্জ্জন নদীতীর ও নদী-নীর, ওই ব্যথাভরা মুক্ত আকাশ—সকলেই বিস্ময়-স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল! নদী-নীর তাহার স্বাভাবিক আনন্দ-মধুর কলতান ভুলিয়া স্তম্ভিত—নির্ব্বাক্ হইয়া পড়িয়া আছে। অথচ এই সুরের আলোয় কত দিনই যে এখানকার বিশ্ব-প্রকৃতি আপনাকে আলোকিত পুলকিত করিয়া তুলিয়া এই গায়ককে অভিনন্দিত করিয়া লইয়াছে, এমন করিয়া রুদ্ধশ্বাস হইতে ত কোন দিনই দেখা যায় নাই!

ভবেশ আত্মহারা হইয়াই গাহিতেছিল,—

"সময় যেন হয় গো এবার, ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে নেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে, অমর হয়ে রব মরি।"

মহেশানন্দের গায়ের ভিতরে এই বায়ুহীন রাত্রি যেন একটা শীতের শিহরণ জাগাইয়া দিয়া গেল। "চুকিয়ে নেবার?"—"চুকিয়ে নেবার?" না না, চুকিবে কি? এ কি কখন চোকান যায়? এ কি গান! এ ভাল না। প্রাণটা তাঁহার কি যেন একটা অজ্ঞাত শঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

ভবেশ গাহিতে লাগিল—

"যে গান কাণে যায় না শোনা, সে গান যেথায় নিত্য বাজে,
আমার, প্রাণের বীণা লয়ে যাব, সেই অতলের সভার মাঝে;
চিরদিনের সুরটি সেধে, শেষ গানে তার কান্না কেঁদে,
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে, নীরব বীণা দিব ধরি।"

এ সব কি ভাল কথা! "অতলের সভায়" যাবার কথা এই বর্ষায় ভরা নদীবক্ষে বসিয়া কেন ও গাহিল? মহেশানন্দ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, ডাকিলেন—

"ভবেশ!"

"আজ্ঞে!"

"চল, বাড়ী ফিরি।"

"এর মধ্যে?"

"না, রাত অনেক হয়ে গেছে বই কি, তা ছাড়া আকাশটায় কেমন মেঘ মেঘ কর্‌ছে, দেখছো না?"

বাস্তবিকই ভবেশ তাহা দেখে নাই। চোখ তুলিয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিয়া সে বলিল, "ও কিছু না," বলিয়াই পুনশ্চ গানের দিকেই মন ফিরাইল,—

"ঘাটে ঘাটে ঘুরবো না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণতরী,
রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি, অরূপ-রতন আশা করি।"

"ভবেশ !"

"আজ্ঞে !"

"আমার আর এখানে ভাল লাগছে না, ভবেশ! বাড়ী ফিরি, এস।"

"আচ্ছা"—বলিয়া বেহালা নামাইয়া রাখিয়া ভবেশ এবার দাঁড় তুলিয়া লইল। সেই স্তব্ধ, নিঃশব্দ, নিস্তরঙ্গ নদীজলে ছপাৎ করিয়া দাঁড়পড়ার শব্দে মহেশানন্দ হঠাৎ ভয়ানকভাবে চমকাইয়া উঠিলেন—

"ভবেশ !"

"আজ্ঞে।"

"ওঃ, না, কিছু না।"—একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস মহেশানন্দের নাসাপথে বাহির হইয়া গেল। তিনি অন্যমনস্ক হইয়া একবার আকাশ ও একবার নদীবক্ষে চাহিয়া দেখিলেন। আকাশের জমা মেঘ খণ্ডিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে অতি গভীব নীল আকাশে নূতন-কাটা হীরার মতই সমুজ্জ্বলতর নক্ষত্রসমূহ দেখা যাইতেছে। কোন সময়ে চাঁদের উপরকার ঢাক্‌নাখানাও হঠাৎ খসিয়া পড়িতেছিল। বর্ষায় পরিপূর্ণ স্ফীতবক্ষ নদীর জলকে যেন জলের অপেক্ষা আর কিছু মনে হইতেছিল,—যেন তেলের নদী। নদীর ধারের সেই অশ্বত্থ, বট, পাকুড় ও নিমগাছের সারি এখনও তেমনই স্তব্ধ। মনে হইতেছিল, যেন উহারা কাহারও মৃত্যু-গৃহের দ্বারের কাছে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতেছে।

"ভবেশ! আজ যেন কিছু ভাল লাগল না, কেবলই মনে হচ্ছে যেন",— —মহেশানন্দ নীরব রহিলেন।—ঠিক যে কি তাঁহার মনে হইতেছিল—তাহা প্রকাশ করিয়া বলাও দুঃসাধ্য! যেহেতু, তেমন সুস্পষ্ট করিয়া কিছুই ত মনেও হয় নাই। এ যে একটা ভিত্তিহীন কারণ-নির্দ্দেশশূন্য অতি অস্পষ্ট ভয়! ইহার ত কোথাও কোন মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! অতি

শিশু যে ভয়ে অন্ধকার সহিতে পারে না, এই বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ বৃদ্ধেরও এ যে সেই একই প্রকারের অসহিষ্ণুতা।

ক্ষণকাল নীরবে গুরুর বাক্যসমাপ্তি প্রতীক্ষা করিয়া থাকিয়া শেষে তাঁহাকে একবারেই বাক্য-বিমুখ দেখিয়া অবশেষে তরণী বাহিতে বাহিতে ভবেশ মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কি মনে হচ্ছে বল্‌ছিলেন ?"

মেঘ তখন প্রায় কাটিয়া আসিয়াছে। নূতন-মাজা সোনার থালার মত চাঁদকে অতি উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে আবার দেখা গিয়াছে। চন্দ্রকরে নদীর সেই তৈলাক্ত-মলিনীকৃত কুশ্রীতা ঘুচিয়া আসিয়া এখন আবার তাহার স্বাভাবিক শ্রীটি প্রকাশ পাইয়াছে। রজতময় জ্যোৎস্নার জালে আবার সমস্ত ঘুমন্ত প্রকৃতি ধীরে ধীরে বাঁধা পড়িতেছেন।

সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া গুরু কহিলেন, "মনে হচ্ছে, আজ যেন কি একটা ঘটবে। কি যেন গভীর রহস্যময়, কোন কিছু!"

তাহার পর একটুখানি থামিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "কিন্তু ও ভাবটা এখন যেন ক'মে আস্‌ছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মনের কি নিবিড় যোগ দেখি দেখি! এতক্ষণ কেবলই মনে হচ্ছিল, আজ রাত্রিতে কি যেন আমার একটা খোয়া যাবে।"

পুনশ্চ হাসিয়া কহিলেন, "অথচ আমার আছেই বা কি ?"

ভবেশ চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া উৎফুল্ল স্মিতহাস্যে তাহার দ্বিতীয় চাঁদের মতই সুন্দর মুখখানাকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়া হাসিয়া কহিল, "আপনার এই অমূল্যনিধিই হয় ত হারাবেন, মনে হচ্ছিল!"

"ভবেশ! ভবেশ! ওঃ—" এমনই একটা যন্ত্রণার্ত্ত কাতরকণ্ঠে হঠাৎ মহেশানন্দ এই আর্ত্তরব করিয়া উঠিলেন; বোধ হইল, যেন ভবেশ কোন শব্দভেদী তীক্ষ্ণ শর তাঁহার বুকের উপরেই ছুড়িয়া মারিয়াছে। ভবেশের স্মিতমুখ এই শব্দে আশঙ্কাপীড়িত হইয়া উঠিল, সে ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া

বলিতে গেল, "কি হ'ল! ব্যথা ধরল কি? না বিছে-টিছে কামড়াল"—

কিন্তু এইটুকু বলিতে বলিতে সে যে একটানা স্রোতের বিপরীতে দাঁড় টানা ছাড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা ভুলিয়া যেমন ত্রস্তভাবে মহেশানন্দের দিকে অগ্রসর হইতে গেল, অমনই সহসা পাক-খাইয়া-ঘুরিয়া-পড়া নৌকায় দাঁড়াইয়া সে টাল সাম্‌লাইতে পারিল না। নৌকাখানাও এক পাশের ভারে হেলিয়া পড়ায় সে-ও সেই সঙ্গে ঝুপ করিয়া জলের মধ্যে পড়িয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বুক-ফাটিয়া-পড়া আর্ত্তনাদের সহিত বৃদ্ধ, অসুস্থ মহেশানন্দ হাহাকার শব্দে সেই নৈশ-নীরবতার ভরা প্রকৃতির সুপ্তবক্ষকে চিরিয়া দিয়া নিজেও নদীবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

৬

ভবেশকে পাওয়া গেল। সাঁতার না জানিলেও তাহার হাল্কা লঘুদেহ জলে পড়িয়া তলাইয়া যায় নাই এবং সন্তরণবিদ্যায় অসাধারণ শিক্ষিত মহেশানন্দের সাহায্য এত শীঘ্র পাইয়া, সে কোনমতে নিজেকে তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতে পারিয়াছিল। কিন্তু যেমনই তিনি তাহাকে "ভবেশ!" বলিয়া টানিয়া লইলেন, অমনই গভীর শ্রান্তি ও আসন্ন মরণের অনিবার্য্য নিষ্ঠুর আতঙ্ক তাহার শেষ চৈতন্যটুকুকে সম্পূর্ণরূপেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে মহেশানন্দের পিঠের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

জল সেখানে বেশী ছিল না। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য অন্য সময়ে নদীর এ যায়গাটা হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। বৃদ্ধ অশক্ত মহেশানন্দের শরীরে সে দিন কি আসুরিক শক্তির, অথবা দৈববলের সমাবেশ হইয়াছিল! ধীরে

ধীরে সাঁতার দিয়া অতি কষ্টে অবশেষে তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন। পিঠের উপর ভবেশের মূর্চ্ছিত দেহ।

যতক্ষণ জলের মধ্যে ছিলেন, যথেষ্ট কষ্টকর হইলেও ভবেশকে বহন করা মহেশানন্দের পক্ষে অসাধ্য ছিল না। কিন্তু এইবার তাহা অসম্ভব হইয়া উঠিল। নিজের এই শ্রম-শ্রান্ত আর্দ্র দেহটাকে টানিয়া তুলা ভার মনে হইতেছে, তাহার উপর এই মূর্চ্ছাবসন্ন নবীনকে এই পঞ্চাশোর্দ্ধ প্রবীণ বহন করিয়া তীর ভাঙ্গিয়া বাড়ী লইয়া যাইবে, সে একবারেই অসম্ভব! কোনমতে তাহাকে নদীতীরের উপর কাশবনের তলায় শোয়াইয়া দিয়া, নিজেও তিনি শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

প্রথমতঃ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মহেশানন্দ ভবেশের কোন চিহ্নই খুঁজিয়া পান নাই। বর্ষার নদীতে টানও বেশ বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার তখনকার সেই মনের অবস্থা সর্ব্বান্তর্যামী ভিন্ন অপর কেহই বুঝিতে পারিবে না। সে হয় ত সময়ের পরিমাপের হিসাবে বড় বেশী সময় নহে, কিন্তু সেই কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই মহেশানন্দের ভীত অন্তরাত্মা যে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করিল, তাহা অবর্ণনীয়। ভগবন্! এই জন্যই কি—প্রথম জীবনে যাহা হারাইয়া সুখহীন শান্তিহীন নিরানন্দচিত্তে সর্ব্বত্যাগী হইয়া পলাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহার সেই অনাস্বাদিত অতৃপ্ত সংসার-সুখের সকল আনন্দটুকুর একটি কণা ফিরাইয়া দিতে ইহাকে তাঁহার কাছে আনিয়া দিয়াছিলে? উঃ, এই সমস্ত জীবন ধরিয়া যে আগুনে দগ্ধ হইয়া সহসা এত দিনে প্রায়শ্চিত্তশেষের শান্তিজলের মতই যাহাকে পাইয়া একটুখানি শীতল হইয়াছিলেন, সেই তাহার সহস্র গুণ জ্বালা বাড়াইবার জন্য?

ও ভবেশ!—ও ভবেশ!—এই করিতে তুমি আসিয়াছিলে?

এই ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত কয়টির মধ্যে মহেশানন্দের সাত বৎসরের আয়ুক্ষয় হইয়া গেল। অবশেষে বহু চেষ্টায় ভবেশকে পাওয়া গেল। ধন্য ভগবান্!

তাঁহাকে তাহা হইলে তাঁহার একমাত্র প্রিয়তমের মৃত্যুর কারণ হইতে হয় নাই!

তীরে আসিয়া চেতন এবং অচেতন উভয়েই প্রায় সমাবস্থাপন্ন হইয়া পড়িল। আর ত শরীরে এতটুকু সামর্থ্য নাই, যাহার দ্বারা এই সবল সুস্থ তরুণের অচৈতন্য দেহ বহন করিয়া লইয়া যাওয়া যায়। কাহাকেও ডাকিয়া আনিবার জন্যও হাতে পায়ে কিছু বল থাকা চাই, তাহাও আর নাই। অগত্যা কিছুক্ষণের জন্য মহেশানন্দ সর্ব্বপ্রকার শরীর-মনের চেষ্টারহিত হইয়া পড়িলেন।

মনে হয়, সে-ও যেন একটা যুগ! কোন কিছু করিবার সামর্থ্যমাত্র নাই, অথচ সহসা মনে হইল, ভবেশ হয় ত এতক্ষণ আর বাঁচিয়া নাই! অমনই কোথা হইতে সেই অবসন্ন অসমর্থ শরীরে প্রবল শক্তি ফিরিয়া আসিল। অতি কষ্টে টানিয়া লইয়া কোনমতে তিনি তাহাকে নদীর উপরেই মঠের বাগানে তুলিয়া আনিলেন। তখন রাত্রি দেড় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। চরাচর সুপ্তি-মগ্ন, কেবল মনিবের প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় ঘাট-দেউড়ীর চৌকিদারটা ফটকের পাশের কুঠরীতে চারপাইয়ের উপর শুইয়া শুইয়া তুলসীদাস আবৃত্তি করিতেছিল,—

সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুবর রঘুরায়ী
রসনা রস নাম লেত, সন্তানকো দরশ দেত,—
ঈষৎ মুখচন্দ্র মন্দ্র সুন্দর সুখদায়ী”—

অর্দ্ধস্ফুট স্খলিত বাক্যে অদূর হইতে কে যেন ডাকিল, “মিশির!”

স্বর অনেকটা মহারাজ-জীর মত, তবে সম্পূর্ণ নহে। এত রাত্রিতে উঁহারা ভিন্ন আর কেই বা এখন ডাকিতে আসিবে? বিশেষ মহারাজ তো তাহাকে ডাকেন না, ফটক বন্ধ করিয়া আলো দেখাইবার জন্য ভবেশই তাহাকে আহ্বান করে, সে বলে, “মিশিরজী!”

কাজেই মিশ্র ঠাকুর তাহার ভজনগানেই মজিয়া রহিল, উত্তর দিল না ;

মতিয়ন্‌কে কণ্ঠমাল, তারাগণ অতি বিশাল,
হরষে নিরখ তুলসীদাস, চরণ-রজ-পায়ী।”

“মিশির—!”

নাঃ! আজ নিশ্চয়ই কিছু উল্টা রকম ঘটিয়াছে! এ কণ্ঠ তাহার মনিবেরই বটে। ভবেশের অসাড় অস্পন্দ দেহ মিশিরের সাহায্যে ঘরের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়া, মিশিরকে খানিকটা আগুন করিতে আদেশ দিয়া, মহেশানন্দ প্রথমেই ভবেশের ভিজা কাপড় জামা ছাড়াইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ঘরের পাশেই ভবেশের শয়নাগার। নিজেই তথা হইতে উহার একটা গেরুয়া আলখেল্লা লইয়া আসিয়া পরিহিতটাকে খুলিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতে করিতে দেখিলেন, ভবেশের এতক্ষণকার নিস্পন্দ শরীরে এইবার স্পন্দন ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার শীত-শীর্ণ ঠোঁট দু’খানি বাতাস-লাগা ফুলের পাপড়ীর মত মৃদু মৃদু কম্পিত হইতেছে। সে যেন সজোরে একটা নিশ্বাস ফেলিল। একটা গভীর আনন্দের উচ্ছ্বাস-লহরী মহেশানন্দের ভয়ার্ত্ত চিত্তপ্রাণকে একবারে প্লাবিত করিয়া দিয়া বহিয়া গেল। তিনি গভীর স্নেহে উন্মত্তের মতই সেই অর্দ্ধচেতন নরদেহ নিজের বুক দিয়া সবলে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। বিপুল সুখে তাঁহার মুখ দিয়া বহির্গত হইল,—

“ভবেশ! ভবেশ! আমার ভবেশানন্দ! আমার পুত্র! আমার শিষ্য! আমার সর্ব্বস্ব ধন!”

ভবেশের হৃতচৈতন্য প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। শীতে সে কাঁপিতেছিল। তাড়াতাড়ি আত্ম-সংবৃত হইয়া মহেশানন্দ তাহার গায়ের ভিজা কাপড়টা টানিয়া খুলিয়া দিলেন। শুষ্ক বস্ত্র প্রথমে সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া লইয়া তাহার পর সেটা ভাল করিয়া পরাইয়া দিতে গিয়া সহসা তিনি চমকিয়া উঠিলেন,—“মহাদেব!”—

অত্যন্ত আহত না হইলে মানুষের কণ্ঠে কখন এরূপ স্বর বাহির হয় না।

ক্ষণকাল বজ্রাহতবৎ স্তম্ভিত থাকিয়া, অতি কষ্টে নিজেকে মৃত্তিকার গ্রাস হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া, মহেশানন্দ প্রশস্ত ঘরটার শেষ পর্য্যন্ত একবার পরিক্রমণ করিয়া পুনশ্চ পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। "না, তাঁহার ভুল হয় নাই! তিনি পাগল হন নাই! ইহা স্বপ্নও নহে! এই সেই ভবেশ! তাঁহার ভবিষ্যৎ আশার ভবেশানন্দ! তাঁহার চক্ষুর সমক্ষেই এই-ই আজ জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। তিনিই ইহাকে নিজের প্রাণ-সংশয় করিয়া জলমধ্য হইতে টানিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু এ কি ?"

আবার তাঁহার কণ্ঠ চিরিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ের একটি ঝলক রক্তের মতই বাহির হইয়া আসিল,—

"মহাদেব!"

এ কি হইল ? তাঁহার সকল আশাই চূর্ণ হইয়া ধূলিধূসরিত হইয়া গেল! তাঁহার জীবনের সুখস্বপ্ন জন্মের মতই টুটিয়া গেল ? তাঁহার নূতন-গড়া এই ভাঙ্গা প্রাণকে পুনশ্চ দ্বিগুণ বলে চূরমার করিয়া দিয়া তাঁহার অন্তরের অ-নির্ব্বাণ আগুনের স্মৃতিকে শুধু উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিল! এ কে এ ?—এ কে এ ? কেন সে তাঁহার সঙ্গে অনর্থক এত বড় শত্রুতা করিতে আসিল ?

মহেশানন্দ অবশের মতই সেই প্রতিক্ষণে ফিরিয়া আসা নূতন জীবনের স্পন্দনে চঞ্চল, তাঁহারই প্রিয়—প্রিয়তর, প্রিয়তমের দেহের পাশেই বাণ-বিদ্ধ কুরঙ্গের মত লুটাইয়া পড়িলেন।

তাঁহার সেই বহু পুরাতন ভগ্ন মন্দিরের চূর্ণ করা দেবতার বিকৃত প্রতিমার আবার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, এই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পরে কে আজ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিল ? এ কায কেন করিল ? ওরে, কেন

করিল রে! এ যে বড় জ্বালার অসহ্য স্মৃতি! অনেক করিয়া ইহাকে একটুখানি মাত্র চাপা দেওয়া গিয়াছিল, আবার সেই নির্ব্বাপিত-প্রায় আগুনের কুণ্ডে ঘৃতাহুতি কেন দিল?

আবার অতি কষ্টে উঠিয়া বসিয়া মহেশানন্দ সম্মোহন-মন্ত্রবশীভূতের মতই সেই একদা পবিত্রতর প্রেমাস্পদতমের এবং পরে তাহারই অপবিত্রতর এবং ধিক্কারের সহিত পরিত্যক্তের সহিত ঠিক একই প্রকার মূর্ত্তি ধরিয়া যে আজ তাঁহারই শয্যাতলে লীন রহিয়াছে,—তাহারই দিকে আকৃষ্ট চোখে চাহিয়া রহিলেন। ওঃ, ওঃ—সেই সব! সেই সব! এত বড় দীর্ঘকালটা কি এর কাছেও ঘেঁষিতে পারে নাই?

ভবেশের শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রমেই স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছিল, এইবার সে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাশ ফিরিয়া শুইতে গেলে মহেশানন্দের বিস্ফারিত আর্ত্ত দৃষ্টির সহিত তাহার উৎসুক দৃষ্টি সম্মিলিত হইল। ইহাতে প্রথমটা ভবেশের ক্লান্তবিবর্ণ মুখ-চোখ একটা গূঢ় আনন্দের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে গেল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখস্থ দৃষ্টির সহিত পুনর্ম্মিলিতদৃষ্টি হইয়াই তাহার সেই—সেই সুখস্মিতমুখ একটা উৎকট সঙ্কোচে শুষ্ক ও ম্লান হইয়া পড়িল, তাহার লজ্জিত দৃষ্টি স্বতঃই আনত হইয়া আসিল। সে তখন কোনমতে নিজের গায়ের উপর কাপড় টানিয়া দিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। সেই মুহূর্ত্তেই সে-ও বুঝিয়াছিল যে, তাহার সব ফুরাইয়াছে! এই যে পাতরের মত কঠিন চোখ তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছে, ইহার পর আর কি কখন এই চোখে সে তাহার সেই পূর্ব্বকার মত স্নেহে-গলানো, মমতা-মাখানো গভীর বাৎসল্যের রসে ভরা কোমল-মধুর দৃষ্টি দেখিতে পাইবে! দুঃখে লজ্জায়, অভিমানে বুক তাহার বিদীর্ণ হইয়া গেল। ওঃ, আজ যদি সে আর—সেই তাহার সলিল-সমাধি হইতে না উঠিত!

মহেশানন্দ গভীর বলে আত্মস্থ হইয়া উঠিয়া বসিয়া ধীর কণ্ঠে কহিলেন,—

"ভিজে কাপড়গুলো ছেড়ে ফেল, মিশির আগুন আন্‌ছে, হাত-পাগুলো গরম ক'রে নাও।—কিছু খাবে কি ?"

ভবেশ শুধু মাথা নাড়িয়া তাহার আহারে অনিচ্ছার কথাটা জানাইয়া দিল। ইহারই মধ্যে মহেশানন্দের কণ্ঠে কি নির্লিপ্ত স্নেহহীনতার পরিচয় ফুটিয়া বাহির হইতেছিল! তাহার দুইটি চোখ ঠেলিয়া জলের উৎস উৎসারিত হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল।

মহেশানন্দ ধীরে ধীরে পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন—প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ঠাকুরবাড়ীর পেটা ঘড়ীতে এবং দরবার ঘরের বড় ঘড়ীতে যখন রাত বারোটার ঘোষণা চলিতেছিল, তখন মহেশানন্দ এ ঘরে আবার ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, মিশির অগ্নিকুণ্ড লইয়া চলিয়া গিয়াছে, ভবেশ তাহার দুই বৎসরের পরিচিত মূর্ত্তি লইয়াই তাঁহার বিছানার নীচের খালি জমীতে নতমুখে স্থির হইয়া বসিয়া আছে। ল্যাম্পের আলোয় তাহার সেই অস্বাভাবিক শ্বেতবর্ণ মুখে, অংসবিলম্বী কুঞ্চিত অলকে, রক্তহীন অধরোষ্ঠে, দুঃখার্ত্ত সলজ্জদৃষ্টিতে তাহার সেই কমনীয় রূপ যেন শতগুণে বৰ্দ্ধিত ও চিত্তহারী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই মহেশানন্দের বুকের ভিতরটা সবেগে দুলিয়া উঠিল, যত্নে বাঁধা হৃদয় একবারে গভীর বেগে বিচলিত হইয়া উঠিল।

উহার সম্মুখ হইতে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিয়া, আপনাকে কিছু কঠিন করিয়া লইয়া, তিনি একটুখানি পরে কথা কহিলেন। বলিলেন,—

"তুমি কিরণের মেয়ে, না ?"

ভবেশ মুখ তুলিয়া তড়িৎস্পৃষ্টের মতই চমকিয়া তাহার বিচারকের মুখের দিকে চাহিল,—

"আপনি আমায় কি ক'রে চিন্‌লেন ?"

মহেশানন্দ এ কথার আর উত্তর দিলেন না, তবে তাঁহার গলার কাছে কি যেন একটা ঠেলিয়া উঠিল মাত্র। তাহার পর আবার একটুখানি সময় গত হইলে পুনশ্চ কথা কহিলেন,—

"এমন ক'রে আসার মানে ?"

জিজ্ঞাসিতও এইবার দুই তিন বারের চেষ্টার পর হঠাৎ সাহস-ভরে বলিয়া ফেলিল,—

"এমন ক'রে না এলে কি আস্‌তে দিতেন ? অথচ না এলেও আমার ত আর দ্বিতীয় আশ্রয় ছিল না।"

মহেশানন্দ বলিলেন, "কেন,—তোমার মা ?"

মেয়েটি তাহার লজ্জাভরা দৃষ্টি আরও বেশী করিয়া নামাইয়া মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল,—

"মা ত বেঁচে নেই।"

"আঃ !"—বলিয়া মহেশানন্দ এমনই একটা তৃপ্তি প্রকাশ করিলেন, যাহাতে ঐ তরুণী অপরাধিনীটি হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল।

"কবে গেলেন ?"

তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন করেই আমি এখানে চ'লে এসেছিলেম।"

"ওঃ ! আমার পরিচয় পেলে কোথায় ? কেমন ক'রে জান্‌লে, আমি তোমার—আমি তোমার—"

মহেশানন্দ কথাটা শেষ না করিয়া থামিয়া গেলেও ঐ মেয়েটি তাঁহার ঐ অসমাপ্ত পদটির পূরণ সাগ্রহেই করিয়া দিল—আমার বাবা ? মা-ই আমায় এ কথা বলেছিলেন। তাঁহার জীবিতাবস্থাতেও কতবার আমাদের মধ্যে এ কথা হয়ে গেছলো। আমি আমার জ্ঞান হবার পর থেকেই এখানে চ'লে আস্‌তে চেয়েছি। মা'র শুধু ভরসা হয় নি, বলেছিলেন,

আমি এলে আপনি আমাকে ঢুকতে দেবেন না। তাই ভয়ে আসিনি। কিন্তু যখন আমার সবই গেল, আমার কোলের ছেলে কেড়ে নিয়ে আমার স্বামী জন্মের মতই আমায় বিদায় দিলেন, সেই শোক সইতে না পেরে মাও এক মাসের মধ্যে মারা গেলেন। আমার তিন মাসের শিশু মা-ছাড়া হয়ে দুরন্ত লিবারে ভুগে মরে গেল। সে খবর শুনে আমি আর থাক্‌তে পারলুম না। জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়লেম। শুধু তার মধ্যে এইটুকু হুঁষ আমার ছিল যে, আমি যা, তা আমার প্রকাশ করবার পথ নেই। তাই এই ছদ্মবেশ! এ কি একেবারেই আপনার ক্ষমার অযোগ্য?"

মহেশানন্দের কঠিন দৃষ্টি কখন্ কোন্ সময় কেমন করিয়া শীতল হইয়া আসিয়াছিল, অথচ তখনও সবটুকু উত্তাপ তাঁহার মন হইতে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। তিনি ঈষৎ রূঢ়কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "কিন্তু তুমি ত সেই বিশ্বাসঘাতিনী কিরণেরই মেয়ে—যাকে আমি নিজেব বুকের রক্তের চেয়েও বেশী ভালবাসতেম, আর যে আমার সেই বুকের রক্তকে তার তীব্র গরল দিয়ে বিষাক্ত ক'বে দিয়েছিল! আমার প্রথম জীবনের সুখস্বপ্নকে নির্দ্দয় আঘাতে চূর্ণ ক'রে দিয়ে আমায় যে ঘরছাড়া সর্ব্বহারা পথের ভিখারী করেছিল, তারই গর্ভে তোমার জন্ম, সে কি আমার ভুলে যাবার?"

এইবার এই তিরস্কৃতা মেয়েটি একবারে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—"তার জন্য কি আমি দায়ী? যেমন তাঁর, তেমনই আপনারও ত মেয়ে আমি। আমায় আপনারা দুজনেই ফেলে গেলেন, পাঁচ জনের দয়ায় বড় হয়ে রূপের জোরে বড়লোকের বাড়ীর বউ হয়েছিলুম, সেখানেও এই মায়ের কলঙ্ক আমায় আপনার মতই ঘরছাড়া সর্ব্বহারা ক'রে ঠেলে পথে বার ক'রে দিলে। মা মধ্যে মধ্যে খোঁজখবর নিতেন, খেতে না পেয়ে যাতে ম'রে না যাই, সেটাও দেখতেন, ভাল হোক মন্দ হোক, তবু ত সে মা,—সে-ও গেল! যদিও কোন দিনই তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করতে পারিনি, ভালও বড়

বাসিনি, নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য, দেখা হ'লে অভিশাপই দিয়েছি, তবুও তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছি বই কি! কিন্তু আপনি আমায় কি অপরাধে ত্যাগ করেছিলেন? আর আজও করতে চান? আমার মা'র পাপে কি আমি পাপী? আর তা হ'লে এখানেই বা আমি আস্‌বো কেন? বলতে চান, আপনার উপর আমার কোন দাবী নেই? আমি আপনার কেউ না?"

মেয়েটি সহসা মহেশানন্দের পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, কিছুতেই তাহার সে কান্না যেন শেষ হয় না।—"স্বামী না হয় পর, আমার দুঃখ তিনি বুঝলেন না, কিন্তু আপনি ত আমার বাপ—আমার সব চেয়ে এ পৃথিবীতে বেশী ভরসার, বেশি আপনার! আপনিই বলুন, আমি এখন কোথায় যাব? আমার এই ত রূপ। এই মোটে ছাব্বিশ বৎসর বয়স।—কে আমায় দেখবে? শেষকালে কি আমাকেও আমার মায়ের পথের পথিক কর্‌তে চান আপনি?"

মহেশানন্দের চোঁখের দৃষ্টি বিপর্য্যস্ত এবং ক্রমে অস্পষ্ট ও ঝাপ্‌সা হইয়া আসিতেছিল, এইবার তাহা হইতে বড় বড় দুইটি অশ্রুবিন্দু তাঁহার শুষ্ক গণ্ড দিয়া গড়াইয়া পড়িল,—"তোমার নামটা কি ছিল?—অর্চ্চনা না?"

"হ্যাঁ—"

"অর্চ্চনা!"

"বাবা!"—বলিয়া অর্চ্চনা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

মহেশানন্দ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন।

"তা হ'লে চল, আমরা দুজনে কাশী কি হরিদ্বার, না হয় ত হৃষীকেশের কোন একটা একান্ত স্থানে, না হয় আরও নির্জ্জনে গিয়ে বাস করি গে'। তোমায় নিয়ে এখানে থাকা ত আর যায় না।"

অর্চ্চনা নীরব রহিল। তাহার চোখের জল তখন ধারা-শেষে বিন্দুরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল।

মহেশানন্দের হয় ত তখনও ভবেশানন্দের শোক মন হইতে সম্পূর্ণরূপে অপগত হইয়া যাইতে পারে নাই। তিনি আবার আর একটা তেমনই দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন, তাহার পর ক্ষণকাল নীরব থাকার পর বলিলেন,—"কালই মহেশ্বরানন্দের অভিষেকের ব্যবস্থা ক'রে ফেল্‌তে হবে। কিন্তু ভবেশ! না, অর্চ্চনা! না, না, ভবেশই! তুমি আজ থেকে চিরদিন আমার ভবেশ হয়েই থাক্‌বে! কিরণের মেয়েকে আমি ভুলেই গেছি। অনেক কষ্ট পেয়ে শেষকালে সে সব আমার প্রায় চাপা পড়ে গেছে। আর কেন সে সব টেনে তোলা? ভবেশ! তোমায় আমি ভুল্‌তে পারবো না! তুমি আমার এই পোড়া বুকে একমাত্র শান্তির প্রলেপ। উঠে এস, মা! না, না, না, বাবা! তুমি আর অমন ক'রে থেকো না, এস,—উঠে আমার কাছে এস! আজ থেকে মৃত্যু-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তুমিই আমার ভবেশ! তোমার হাতেই আমি নিজেকে একেবারে নিঃশেষে সঁপে দিলুম।"—

উড়ো চিঠি

১

অমিয়বালা রায় ইন্দ্রনাথ রায়ের বড় মেয়ে—এবৎসর আই-এ পরীক্ষায় ইউনিভারসিটির মধ্যে প্রথম স্থানাধিকার করায় ছাত্রমহলে বেশ একটুখানি আন্দোলন চলিতেছিল। মেয়েটী কোন স্কুলের ছাত্রী নয়, প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়া দুই দুই বারই শত সহস্র ছাত্রদলকে পরাভব করিতে পারিয়াছে,—এজন্য কেহ কেহ তাহার বাহাদুরীকে তারিফ দিতেছিল, আবার অনেক অপমানিত-চিত্ত এই বলিয়া আত্মশ্লাঘা ও পরনিন্দা করিয়া মনস্তুষ্টি সাধন করিতেছিল যে, প্রাইভেট পড়ান হইলে তাহারাও অমন সাতবার করিয়া ফার্ষ্ট হইতে পারিত। স্কুলে কলেজে কি আর ভাল করিয়া পড়ান হয়? আর মেয়েরা যখন বিদ্যা শিক্ষা করে, তখন তাহারা পৃথিবীর সহিত সকল সম্পর্ককে ঘুচাইয়া ফেলে; ছেলেদের বেলায় তো আর সেটী হয় না! মায়ের 'সেড' মিলাইয়া উল কেনা, বাবার টেবিল ঝাড়িয়া রাখা, ছোট ভাইয়ের পেন্‌সিল কাটিয়া দেওয়া, এমন ধারা কত কাজই যে তাদের ঘাড়ে পড়ে! মেয়েদের কেহ কিছু বলুক দেখি! অম্‌নি তারা সাপের মতন ফোঁস করিয়া উঠিবে! কারণ তারা নতুন কিছু করিবে, পাশ দিবে—ছেলেদের মতন ত আর মেয়েদের পাশ দেওয়াটা পুরাতন হইয়া যায় নাই!

কিন্তু আসলে অমিয়ার পড়া-শোনা অত নির্ব্বিবাদে ঘটিতে পারে নাই। ইন্দ্রনাথ রায় পূর্ব্ববঙ্গের লোক। পূর্ব্ববঙ্গীয়েরা পশ্চিমবঙ্গীয়দিগের

অপেক্ষা অনেকখানি বেশি আধুনিক হইলেও ইন্দ্রনাথের মধ্যে একালত্বের গণ্ডী খুব বেশি শিথিল ছিল না। মেয়েরা গায়ে সেমিজ ব্লাউস পরিবে, কতকটা লেখা পড়া শিখিবে, আর হাড় ভাঙ্গিয়া ঘর-সংসারের সমস্ত কাজ-কর্ম্মই করিবে, এই রকমই তাঁর মতটা ছিল। লেখা পড়া যেটা শিখিবে, সেটার সবটুকু সুযোগই কিন্তু তার সংসারকে দেওয়া চাই। অর্থাৎ বাজারের, দুধের ও ধোপার হিসাবের জন্য অঙ্ক শেখা, ছোট ছেলে-মেয়েদের প্রাইভেট মাষ্টারের পয়সা বাঁচানোর জন্য পড়াশুনা। বই বা খবরের কাগজ বিশেষতঃ মাসিক পত্রিকা বুকে তুলিয়া চার-চিৎপাত হইয়া পড়িয়া থাকা তাঁর দুটী চক্ষের বিষ! স্ত্রী উমাশশীকে এজন্য অনেকবারই তিরস্কার সহ্য করিতে হইয়াছে। অবশেষে বাংলা সাপ্তাহিক মাসিক প্রভৃতির বাড়ীতে প্রবেশ নিষেধ করিয়া প্রকাশ্য কলহটা বন্ধ হইয়াছে, আর প্রতিবেশীর ঘর হইতে গোপনে গোপনে ওসব জিনিষের আমদানী একেবারেই ছিল না তা অবশ্য বলা যায় না।—তবে কথা এই যে, চোরাই মাল লোকে চুরি করিয়াই ব্যবহার করিয়া থাকে কি না।

মেয়ে যখন বড় হইতে লাগিল, মায়ের কাছেই তার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়। যোগ-বিয়োগ গুণ শিখিয়া মেয়ে ভাগ শিখিতে চাহিলে মা বলিলেন "ভাগ শিখে কি কর্‌বি? ও কোন কাজে লাগে না, আমি জানতুম ভুলে গেছি। তার চেয়ে এইবার শেলাই শেখ যে টেঁপি, মিনু, খুকি এদের ছেঁড়া-খোঁড়াগুলো জুড়ে-তেড়ে দিবি, ফ্রকগুলো সেমিজগুলো করতে পারবি—আমার একটু উপকার হবে।"

অমিয়া বলিল—"তা আমি শিখ্‌ছি, কিন্তু অঙ্ক আমায় আরও শেখাতে হবে। আমার বড্ড ভাল লাগে।"

মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"অঙ্ক ভাল লাগে! বলিস কি রে! ভ্যালা পড়া-পাগলা মেয়ে তুই বাবু!"

কর্ত্তাকে বলিলেন—"অমাই আরও বেশি পড়তে চায়, ওকে ইস্কুলে দাও না।"

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "ইস্কুল! ইস্কুলে দিলে মেয়েটীর কাঁচা মাথাটী যে কামড়িয়ে খাওয়া হয়ে যাবে, তার কি? ইস্কুলে দিয়েছ কি মেয়েটী তোমার গ্যাছে।"

উমাশশী কহিলেন—"কেন গা! এই যে রাজ্যি-শুদ্ধ লোকের মেয়ে ইস্কুলে যাচ্চে, এরা সবাই কি বিগড়ে গ্যাছে? না তোমারই মেয়ে এত মন্দ যে সে ইস্কুলে গেলে অম্নি খারাপ হয়ে যাবে!"

ইন্দ্রনাথ রায় পৃথিবীতে যে সকল বিষয়কে অসহ্য বলিয়া ভাবিয়া থাকেন, তাহার ভিতর প্রধানতম অসহনীয় ব্যাপার মেয়েমানুষের মুখের তর্ক! তিনি ঈষৎ বিরক্তির স্বরে উত্তর করিলন—"তার্কিক তো খুব হয়ে পড়েছ দেখছি! ওসব মেয়ে যে বেগ্‌ড়াবে না, নিজেদের কর্ত্তব্যে অবহেলা করে স্ফূর্ত্তির জীবনকে আদর্শ করবে না, সাফ্রিগেট হবে না—তার কিছু গ্যারান্টি পেয়েছ বলতে পার?"

বাস্তবিকই তো আর উমাশশী সে বিষয়ে কোন গ্যারান্টি পান নাই, কাজেই তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

কিন্তু যেটা ঘটিয়া উঠিবার সেটা যেমন করিয়াই হউক কোথা দিয়া না কোথা দিয়া ঘটিয়া উঠে।

ইন্দ্রনাথ ঘোড়া হইতে পড়িয়া পা ভাঙ্গিলেন ও সেই পায়ের খাতিরে পূরা ছয় মাসের ছুটী লইতে হইল। দিন রাত বিছানায় পড়িয়া সবারই সঙ্গে খিটিমিটি করিতে করিতে যখন তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল, সেই সময় একদিন অমিয়া বুকে সাহস বাঁধিয়া একখানা শ্লেট হাতে তাঁর সাম্‌নে বসিয়া পড়িয়া মিনতিভরা চোখে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—"বাবা! আমায় একটু অঙ্ক শেখাবেন?"

ইন্দ্রনাথ এই প্রশ্নে প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়াছিলেন, সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিলেন—"অঙ্ক শিখে কি করবি? তোদের মাথায় কি অঙ্ক ঢোকে যে অঙ্ক শিখবি!"

অমিয়া সবিনয়ে প্রশ্ন করিল—"কেন ঢোকে না বাবা? আমরা কি?"

ইন্দ্রনাথ গম্ভীর ঔদাস্যে উত্তর দিলেন—"তোরা যে মেয়ে মানুষ রে! মেয়ে মানুষদের যে ব্রেণ নেই!"

অমিয়া নিতান্ত হতাশ হইয়া কহিল—"একেবারেই নেই? কারুরই থাকে না? তবে যে কোন কোন মেয়ে বি-এ, এম-এ পাশ করেচে? তাদের?"

ইন্দ্রনাথ আরও গম্ভীর হইয়া জবাব দিলেন—"তারা হচ্চে মেয়েমানুষের ব্যতিক্রম! সে আর ক'জন? নে' আচ্ছা আয় দেখি—কি অঙ্ক শিখতে চাস্?"

মেয়েকে অঙ্ক কষাইতে বসিয়া ইন্দ্রনাথ দেখিলেন, মেয়েজাতির মস্তিষ্ক যতই ঘৃতশূন্য হউক না কেন, এ মেয়েটার বুদ্ধি বড় মন্দও নয়; অনায়াসেই তাহাকে অঙ্কটা শেখান গেল। নিজের মতের বিরুদ্ধ প্রমাণে মন কাহারও খুব খুসী হয় ত হয় না, ইন্দ্রনাথেরও হইল না, তথাপি একটু কৌতূহল জাগ্রত হইল। মেয়েকে বলিয়া দিলেন, "রোজ এই সময়ে আসিস—অঙ্ক শেখাবো।"

এম্‌নি করিয়া পা ভাঙ্গার শনি ঘাড়ে চাপিয়া অমিয়ার অঙ্ক শিক্ষা, তার সঙ্গে ইংরাজীটাও খানিকদূর অগ্রসর হইয়া গেল এবং মেয়ের বুদ্ধির ধার দেখিয়া বাবার ভোঁতা তর্ক পরাভব স্বীকার করিল। পায়ের বেদনা সারিয়া গিয়া চাকরীতে যোগ দিলেও ইন্দ্রনাথ আর অমিয়ার পড়ার ভার একেবারেই ঘাড় হইতে নামাইয়া ফেলিতে পারিলেন না, অবসর কালটুকুকে সে এমন করিয়া গণ্ডী দিয়া লইল, যে, ইচ্ছা না থাকিলেও সেটুকুকে আর কোন কাজে লাগাইয়া ফেলিবার যেন কোনই উপায় রহিল না।

এম্‌নি করিয়া নিজের প্রবল চেষ্টায় ও বাপের অল্প সাহায্যে সে পরীক্ষা দিয়া পাশও করিল এবং সকলকে বিস্মিত করিয়া সোনার মেডেল ও স্কলারশিপও আয়ত্ত করিল।

তা বলিয়া ঘর-সংসারের কাজের বোঝা ও ভাইবোনদের মাষ্টারী করার হাত হইতে সে এক দিনের জন্যও নিষ্কৃতি পায় নাই। ইন্দ্রনাথ বাছিয়া বাছিয়া উহাকে দিয়াই নিজের কাজগুলি করাইয়া লইতেন এবং সর্ব্বদা খবর রাখিতেন যে রান্না, বাটনাবাটা, শেলাই—এ সকল সে ফাঁকি দিবার চেষ্টায় আছে কি না ; অবসর মত নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও উপদেশ দিতে তিনি ত্রুটী করিতেন না।

২

পাশের বাড়ীতে যোগীন মল্লিক সপরিবারে বাস করিত। যোগীন এক সময় বড়-লোকের ছেলে ছিল, সেই ওজুহাতে সে লেখাপড়া বিশেষ শেখে নাই, কাজকর্ম্ম কিছুই করে না ; পরন্তু ধনী-সন্তানরূপে মর্ত্ত্যভূমিতে আগত হওয়ার দাবীতে ভাল খাওয়া, পরা, থাকা এবং ইচ্ছামত মদ্যপানের সর্ব্বপ্রকার প্রাচুর্য্যের অধিকারটাকে সে সর্ব্বতোভাবেই স্বীকার করিয়া থাকে এবং নিজের সেই স্বত্ব সকলের উপরেই সাব্যস্ত করিতে চায়। এই লইয়া তাদের পারিবারিক অশান্তির আর সীমা ছিল না। ভাইয়ে ভাইয়ে সর্ব্বদা কলহ চলিতেছিল। মা কখন এ-ছেলের সপক্ষে, কখনও ও-ছেলের বিপক্ষে দুর্ব্বল যুক্তি দেখাইতে গিয়া লাঞ্ছিত ও এমন কি প্রহৃতও হইতেন। আর সব চেয়ে দুঃখ ছিল সেই যোগীন মল্লিকের সুন্দরী ও তরুণী পত্নীর। মেয়েটী কোন ভাল ঘরেরই মেয়ে। দেখিতে ফুটফুটে—যেন ছবিখানি! যৌবনের জোয়ারে সর্ব্বদেহ তার ভরা নদীর মতন যেন টলটল করিতেছে।

মনে সাধ আশা আকাঙ্ক্ষা সকলই সেই সঙ্গে ভরপূর। কিন্তু কপালটিই শুধু শূন্য! স্বামী-রত্নটি কখনও মাথায় তুলিয়া নাচিতেছেন, আবার কখনও পা দিয়া মড় মড় করিয়া মাড়াইয়া ভাঙ্গিতেছেন! সোহাগ এবং নির্য্যাতন যেন একত্র হাত-ধরাধরি করিয়া তার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিতেছে। এই দেখ— শৈলবালা এলো খোঁপায় মল্লিকা ফুলের মালা জড়াইয়া শ্যাওলা রংয়ের শাড়ী পরিয়া স্বামীর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছে; তখনি শোন কাণের ইয়ারিং দুটী কাণ হইতে খুলিয়া দিতে বিশেষ আপত্তি করার দোষে পতিদেবতা তাহাকে নির্দ্দয় হস্তে প্রহার করিতেছেন ও সেও করুণ চীৎকারে প্রতিবেশীদেব অস্থির করিয়া তুলিতেছে। স্বামী যখন স্ত্রীকে প্রহার করে, সে সময়ে বাধা দিবার কোন অধিকারই তো আর অন্য প্রতিবেশীদিগের নাই। বরং জোর করিয়া বাড়ী ঢুকিতে গেলে ট্রেস্‌পাসের নালিশ চলে। কাজেই পাঁঠা-বলি দেখাব মত করিয়াই তাঁদের উহা সহ্য করিতে হয় এবং কালে ক্রমশঃ সহিয়াও আইসে।

অমিয়া মাকে বলিয়া বলিয়া কোন উপায় করিতে পারে নাই; সেদিন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়া বাপকে গিয়া বলিল—"রোজ রোজ মেয়েমানুষকে ওম্‌নি করে মারবে, আর আপনারা কোন কিছুই আপত্তি করবেন না?"

ইন্দ্রনাথ জবাব দিলেন—"ওর বউকে ও মারবে,—তোমার মা-মাসীকে ত আর মারতে আসেনি, যে, আমি তার বাড়ী চড়াও হয়ে আপত্তি করতে যাব? আর করলেই বা সে শুনবে কেন?"

"তার স্ত্রী বলে সে কি মানুষ নয়! বিপন্নকে রক্ষা করা তো সকল মানুষেরই কর্ত্তব্য।"

পিতা কহিলেন—"ও তো নিজেকে তত বিপন্ন বোধ কর্‌চে না, তুমি যত তাকে বিপন্ন বোধ করচো? মার তো সর্ব্বদাই খায়,—প্রতিকারের কোন্ চেষ্টা কবে করেছে?"

অমিয়া বাপের এই কড়া যুক্তিতে একটু থতমত খাইয়া গেল,—ভাবিয়া দেখিল, কথাটা খুব হাল্কাও নয়। বাস্তবিকই তো সে কই কোন দিন তার এই দুর্দ্দশা হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টাও করে নাই! আবার সময় সময় দুজনে বেশ হাসিখুসী করিতেও দেখা গিয়া থাকে!

এমন কি করিয়া হয়? এই নির্য্যাতন অপমান সহিয়া আবার সেই স্বামীরই সহিত হাসিতে, কথা কহিতে, ঘর করিতে কেমন করিয়া প্রবৃত্তি হয়? সে যেন এ কথাটা ধারণা করিয়াই উঠিতে পারিল না। তার পব তার যেটা মনে পড়িল, সেইটাই সে বলিয়া ফেলিল—"কিন্তু মার খেতে খেতে যদি ও মরে যায়? তাতে আমাদেরও তো পাপ হয়?"

ইন্দ্রনাথ রাগ করিয়া বলিলেন—"তাই বা কেন হতে গেল? ওব স্বামীর ওকে মারবার, কাটবার, সব করবার অধিকার আছে। ওর ঘরে ওর স্ত্রীকে ও মারবে, আমি আইনতঃ ওর বাড়ী গিয়ে তাতে বাধা দিতে পারি নে,—এর জন্য আমার পাপ হবে? আর তাই যদি হয় তো তাতে আর কি করচি বল'? মাঝে থেকে তুমি ওর মাথায় যেন তোমার ও-সব কুতর্ক ঢোকাতে যেও না। সংসারে এই রকমই হয়ে থাকে, স্বামী খেতেও দেয়, আবার মারেও দু'ঘা,—স্ত্রীরা চিরদিন এসব সহ্যও করে যায়, এ কিছুই বিচিত্র নয়। এই সব আদর্শ ছিল বলেই দেশটা ঠাণ্ডা ছিল। এখন এই তোমাদের মতন তার্কিক মেয়ে সব জন্মে, দেশের আদর্শটা নষ্ট করে ফেলচে। এই জন্তেই বেশি লেখাপড়া শেখাতে চাই নি। এখন যাও দেখি, এক গ্লাস খাবার জল আর গোটাকতক পান সেজে নিয়ে এস। আমার কাজ আছে—তোমার সঙ্গে বাজে কথা নিয়ে তর্ক করবার সময় নেই।"

অমিয়া বাপের হুকুম পালন করিতে চলিয়া গেল, কিন্তু তার মনের ভিতরটা বিদ্রোহী হইয়া রহিল। এর নাম আদর্শ স্ত্রীত্ব? মাতাল স্বামী

মারিয়া হাড় ভাঙ্গিয়া দিলেও পাড়া-প্রতিবেশীর বাধা দিবার অধিকাব নাই ; এবং স্ত্রীরও এমন ক্ষমতা নাই যে, এই অন্যায় অত্যাচারের হাত হইতে বাঁচে ? দাসত্ব-প্রথা আর এর চেয়ে বেশি কি কঠোর ছিল ? আইনে মাতাল কুচরিত্রদের বিবাহ বন্ধ করে না কেন ? বাপ-মায়েরা মেয়ে দেওয়ার সময় এই দিকটাকেই বা প্রধান ভাবে দেখে না কেন ? মেয়েরাই বা প্রথমাবধি মাতাল স্বামীর ঘর করিতে আপত্তি করে না কি জন্য ? যদি তারা স্বামীদের চরিত্র জানিতে পারামাত্রেই তাহাদের সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে পুরুষানুক্রমিক কুরোগের অত্যাচারের ও পাপের বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাসই হইতে থাকে। পাঁচটী সন্তান লইয়া জড়িত হইয়া পড়ার পর যখন ঐ অত্যাচারী ও মাতাল স্বামী তাহাকে নিঃস্ব করিয়া ফেলিয়া দিয়া হয় মরে, না হয় পলায়, আর না হয় ত জেল খাটিতে যায়, তখন দুর্দ্দশা যা' হইবার সে ত হইয়াই থাকে ! তবে আগে হইতে সাবধান হইলে সেটা অমন করিয়া চরমে গিয়া পৌঁছায় না।

অবশ্য এর জন্য মেয়েদেব শিক্ষা ও চরিত্র গঠন করার চেষ্টা মা-বাপেদেরও করা চাই। পশু-প্রকৃতির স্বামীর বাসনানলে ইন্ধন হওয়ার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া যার দৃঢ় বিশ্বাস মনের মধ্যে আছে, তাহাকে তাহার বাহিরে লইয়া যাইতে চাহিলেও সে তাহা চাহিবে না। কারণ সে জানে যে 'পতি পরম গুরু।' গরুর মতন ব্যবহার পাইলেও তার গুরুত্বের অপহ্নব হয় না।

অমিয়া এক দিন তার মাকে গিয়া চুপিচুপি বলিল, "মা, আমার বিয়ে দিও না।"

উমাশশী ছোট খুকির জন্য আলুই পাকাইতেছিলেন,—চমকিয়া মুখ তুলিয়া মেয়ের শুষ্ক মুখের দিকে চাহিলেন। আনমনে কি একটা আন্দাজ করিয়া লইয়া ঈষৎ হাসিচাপা সুরে জবাব দিলেন—"বিয়ে ত দিতেই হবে মা, বড়টী তো হয়েছ। ভাল তেমন পাচ্ছি না ত, পেলেই দোব।"

মায়ের কথার উদ্দেশ্য বুঝিয়া মেয়ে ঘোর রক্তবর্ণ মুখে—"ধেৎ, আমি তাই বল্‌ছি বুঝি ?" বলিয়া সবেগে বাধা দিল। তার পর পুনশ্চ শুষ্ককণ্ঠে মিনতি ভরিয়া কহিল—"সত্যি করে তোমায় বলছি মা, বিয়ে আমার তুমি দিও না, বিয়ে হলে আমি সুখী হ'তে পারবো না। যদি ঐ ওদের বাড়ীর ছেলেদের মতন হয়, তাহলে তক্ষনি আমি মরে যাব।" বলিতে বলিতে সে যেন সেই সম্ভাবনার ভয়েই সর্ব্বাঙ্গে শিহরিয়া উঠিল, "লক্ষ্মীটী মা! পায়ে পড়ি, আমার বিয়ে দিও না—"

উমাশশী মেয়ের গভীর মানসোদ্বেগ লক্ষ্য না করিয়াই মৃদু হাসিয়া সান্ত্বনার সহিত সস্নেহে কহিলেন—"ওদের বাড়ীর ছেলেদের মতনই বা হবে কেন? ওরকম সংসারে ক'জনই বা আছে। আর আমরা দেখে-শুনে দোব, ভালই হবে। মিথ্যে ওসব খারাপ ভাবনা ভাবতে নেই।"

মায়ের মুখের এই স্নেহ-সান্ত্বনায় অমিয়ার মনের ভিতরকার জমাট আতঙ্ক একটুখানি যেন সরল হইয়া আসিলেও তাহা একেবারে বিদূরিত হইল না। বয়স বাড়িতেছে, বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। সময় যতই ঘনাইয়া আসিতেছিল, তার মনের ভিতর ততই প্রবলবেগে একটা ভীষণ ঝটিকা বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিবাহের কথা মনে করিতে গেলেই, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, ঐ ছবিখানিই চোখের সাম্‌নে ভাসিতে থাকে। সুন্দর টুকটুকে পাতাকাটা রুজ-পাউডারমাখা মুখখানি, কাণে চুণির দুল, কপালে টায়রার মুক্তাগুলি দুল দুল করিয়া দুলিতেছে, মসৃণ ললাটে তাহা যেন শুক্তি-গর্ভশায়ী মুক্তার মতই শোভমান হইয়াছিল। বেনারসী শাড়ীর পাড়গুলি বিদ্যুতের আলোয় জ্বলজ্বল করিতেছে, হাতে গলায় মুক্তার কলার মুক্তার তলা। ভোজের বাড়ী যেন রূপের ও অলঙ্কার-বস্ত্রের প্রভায় ঝলসিয়া দিয়া এক দিন ঐ মেয়েটী সকলকার চোখের দৃষ্টিকে তারই পানে টানিয়া আনিয়াছিল। আর আজ? শীর্ণা, অকালবৃদ্ধা,

কুৎসিতব্যাধিক্লিষ্টা রূপলাবণ্যহীনা রুগ্ন ক্ষুধিত পাঁচসাতটী সন্তানে পরিবৃতা নারী নিজের শরীর মনের বেদনায় অধিক্লিষ্টা হইয়া লোক-লোচনের অন্তরালে আপনাকে লুকাইতে ব্যস্ত। হাতে তার গাছকতক কাঁচের চুড়ি ভিন্ন আর কিছুই নাই। তথাপি শাসনের শাস্তির আর শেষ হয় না।

উঃ! অমিয়ারও যদি ঐ রকমটা ভাগ্যে ঘটিয়া যায়? সে কোন মতেই এ অত্যাচারের তলায় মাথা নীচু করিবে না,—নিশ্চয়ই না।

কিন্তু কাজই বা কি এমন বিবাহে?—যার এমন কটু তিক্ত ফল ফলিলেও ফলিতে পারে?



অমিয়ার বাপ যদিও মল্লিক-বাড়ীর বধূদের আধুনিক তর্কশাস্ত্র শিক্ষা দিয়া উহাদের আদর্শ পত্নীত্ব খর্ব্ব করিয়া দিতে মেয়েকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং অমিয়াও যথাসাধ্য পিতৃআজ্ঞা পালন করিয়া চলিত, তথাপি, মধ্যে মধ্যে যেদিন মল্লিকবাড়ীর বাবুদের একটু ঠাণ্ডা মেজাজ বুঝা যাইত, সেদিন সে হয় সে বাড়ীতে গিয়া বধূদের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিত, না হয় ঐ বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ডাকাইয়া আনিয়া একটু আদর যত্ন করিতে চাহিত।

সেজ বধূ বিন্দুমতীর পাঁচটী ছেলেমেয়ে। তার মধ্যে দুটী নিতান্তই শিশু, একটী একটু বড় হইয়াছে, আর দুটী খুব কাছাকাছি, দেখিলে যমজ বলিয়াই মনে হয়। একটী ছয় ও একটী সাত বৎসরের। অমিয়া এদের দুটীকে আনিয়াই একটু আধটু বর্ণপরিচয় করাইত, গল্প বলিত, ছবিটা খাবারটাও না দিত তা নয়। এক দিন সে তাদের একটা গল্প বানাইয়া বলিল—তাহাতে একটী দুষ্ট ছেলে পরের গাছে উঠিয়া আম চুরি করিতে গিয়া ধরা

পড়ে এবং তাহাতে গাছের মালিক আসিয়া তাকে পুলিসে ধরাইয়া দেয়। ইত্যাদি বলিয়া চৌর্য্যের অপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিল।

গল্পটী খানিকটা শোনা হইতেই হিতেন্দ্র বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা পুলিস এসে যখন ধরলে, তখন তার সব আমগুলো খাওয়া হয়ে গেছলো, না খেতে বাকি ছিল—বল ত ?"

অমিয়া বলিল—"না, তখনও সব খাওয়া হয়ে উঠে নি, গোটাকত আম তার হাতে ছিল, সেই শুদ্ধ ধরা পড়লো।"

মেয়েটীর নাম অনুজা। অনুজা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "কাঁচা আম না পাকা আম সেগুলো ?"

তার পর নিজেই মীমাংসা করিয়া লইল যে, নিশ্চয়ই সেগুলা কাঁচা আমই ছিল, সেই জন্যই খাইয়া উঠিতে পারে নাই,—পাকা হইলে পুলিস আসিয়া ধরিতে না ধরিতে খাওয়া হইয়া যাইত।

হিতু সহানুভূতিসূচক চুক্ করিয়া একটা শব্দ করিয়া কহিয়া উঠিল—"আহারে! গাছে উঠ্‌লো, সব করলো, মাঝে থেকে খেতেই পেলে না! আমি হলে কিন্তু যেমন করেই হোক, খেয়ে নিতুম।"

অমিয়া কোপপ্রকাশ পূর্ব্বক ধমকাইয়া কহিল—"ছিঃ হিতু! পরের জিনিষ কি চুরি করে খেতে আছে ?"

হিতু বিজ্ঞজনোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিল—"কেন থাকবে না ? আমার বাবা বলে নির্ব্বোধের চাইতে চোরেরাও ভাল। তাদের বুদ্ধি খরচ করে খেতে হয়। বুদ্ধি থাকলেই লোকে সেটা খরচ করে থাকে, তা' সে হোক ভাল কাজে, হোক মন্দ কাজে।"

অনুজা ভাইয়ের কথার সমর্থন করিয়া বলিল—"শুধু তাই কেন ? বাবা তো এ কথাও বলে যে 'দেখছিস্ কাজ-কর্ম্ম কিছুই তো করি না, তবু তোদের কেমন ভাল খেতে পরতে দিচ্চি ? কি করে জানিস ? যুক্তি

খাটিয়ে। দেখে শেখ।' তা হিতু, তুই বড় হলে বাবার মতন টাকা ধার করবার ফন্দি করতে পারবি না?"

হিতু এই কথায় র্ধা করিয়া বোনের গালে একটা চড় কসাইয়া দিয়া মুখ খিঁচাইয়া জবাব দিল—"'পারবি না' কিরে? আমি বাবার চাইতে বেশিই তো পারবো। আমার বুদ্ধি কি বাবার চেয়ে কিছু কম না কি? সেদিন কেষ্টা মুদি টাকার তাগাদা কর্তে এলো, তুই তো আর একটু হলে বলেই ফেলেছিলি যে বাবা বাড়ী আছে, আমিই না তাকে বাবা বাড়ী নেই, চাকরীর চেষ্টায় বেরিয়েচে ব'লে বিদায় করি? বল্ ত কে বিদায় করেছিল? হুঁ হুঁ—আমায় তেম্নি বোকা পেয়েছিস কি না—হ্যাপলার মতন!"

অনুজা ভাইএর দত্ত মার সুদশুদ্ধ ফিরাইয়া দিয়া হাঁকিয়া উঠিল—"মুখপোড়া ছেলে এক্ষুনি মরুক! শুধু শুধু আমায় মারলি কেন?"

হিতেন্দ্র অনুজার চুল ধরিয়া টানিয়া গাছকতক ছিঁড়িয়া আনিল—"আমি কেন মরবো, তুই মর।"

অনুজার আক্রমণে এবার তার কাণ ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতেই অনুজা ফস করিয়া আঁচল ছিঁড়িয়া সেই আহত কাণের শোণিতপাত বন্ধ করিল, এবং অনুতপ্ত স্নেহভরে ভাইকে দুহাতে জড়াইয়া ধরিল—"আহা হা! রক্ত পড়ে গেল রে! না ভাই, আমার সঙ্গে আর মিথ্যে মিথ্যে লাগতে আসিস্ নি। চল একটু জল দিয়ে দিই।"

হিতেন্দ্র ক্রোধভরে বোনের হাতটা ঠেলিয়া দিল—"যা যা, আর আদর দেখাতে হবে না। পাজি ছুঁচো, ছোটলোকের মেয়ে!"

অনুজা গর্জ্জিয়া উঠিল—"কি! তুই আমায় ছোট লোকের মেয়ে বল্লি? তোর মরণ-বাড় হয়েছে দেখতে পাচ্চি!"

হিতেন্দ্রও ইহার উত্তর সমান তেজের সহিত প্রদান করিল—"বলেছি ত হয়েছে কি? বাবা যদি মাকে ছোট লোকের মেয়ে বলতে পারে—তাহলে

আমি তোকে বলতে পারি নে? তুই কি খড়দার মা গোঁসাই না কি?”

অমিয়া অবাক আড়ষ্ট থাকিয়া ইহাদের বিবাদ-বিতণ্ডা দেখিল এবং শুনিল। এতখানি বয়সের মধ্যে সে যে-সব কথা কখনও কাণেও শুনে নাই, ইহাদের সেই সকল কথা ব্যবহারে বিশেষ অভ্যস্ত দেখিয়া গভীর বিস্ময় অনুভব করিতে গিয়াও সহসা সে চকিত হইয়া স্মরণ করিল, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই বড় বর্ত্তমান নাই। নিজের বাড়ীতে মা বাপের মধ্যে যে ব্যবহার ইহারা লক্ষ্য করিতেছে তাহাই শিখিয়াছে মাত্র। নূতন করিয়া কোথাও হইতে বিচিত্র কিছুই তো শিখিয়া আইসে নাই! এই দুইটী সরল শিশু-জীবনকেও ইহারই ভিতবে এই যে গরল-মণ্ডিত করিয়া তৈরী করা হইতেছে, এর জন্য দায়ী ইহাদের মহাপাপিষ্ঠ দায়িত্ব-জ্ঞানশূন্য পিতা। এবং —এবং শুধুই পিতা কি? ইহাদের মাতাও কি এর জন্য অংশতঃ দায়ী নহে? অমিয়ার চিত্ত সেই নির্ব্বিরোধে ও নির্ব্বিচারে পাষণ্ড স্বামীর হস্তে আত্ম-সমর্পণ-কারিণী বঙ্গবধুর প্রতি ঘোর বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিল। এমনই কি সহিষ্ণুতা, যে ঐ দুরন্ত-প্রকৃতির স্বামীর সহিত লাঞ্ছিত জীবন বহন করিবার তুচ্ছ লোভটুকুও দমন করিতে পারে না? বৎসর বৎসর এই সকল অভাগা নীতিজ্ঞানহীন সন্তানের সৃষ্টি করিয়া সংসারে দারিদ্র্য ও পাপের বংশ বর্দ্ধিত করার চেয়ে এমন কি মরণকে বরণ করাও শ্লাঘনীয় ছিল না কি? নাঃ, অত্যাচারী স্বামীর ঘর করিতে স্ত্রীকে বাধ্য করার মত পাপ কিছুই নাই। ইহা ত শুধুই ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। সমস্ত সমাজের ভবিষ্যৎ যে এর উপর পূর্ণ ভাবে নির্ভর করিয়া আছে। মদ্যপ, ব্যাধিগ্রস্ত, কুচরিত্র এ সকল লোকের বিবাহে সামাজিক বাধা কেন থাকিবে না? অত্যাচারীর স্ত্রীকে সমাজ কেন রক্ষা করিবে না? এ করিতে সে বাধ্য! আর তাহা করাইবার ভার নারীকেই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি সকল মেয়েই এই পণ করে,

নিশ্চয়ই এই বিচারের প্রতিকার-চেষ্টা দেখা দেয়। সহ্য করিয়া করিয়া স্ত্রীরাই স্বামীদের এরূপ পিশাচে পরিণত করিতেছে।

অমিয়া মনে মনে দৃঢ় করিয়া বলিল—"আমার যদি কখন তেমন দুর্ভাগ্যও ঘটে, আমি কিছুতেই কিন্তু সহ্য করবো না। এর জন্য প্রাণ দিতে হয় তাও দোব, তবু মাতাল বা কুচরিত্রের সন্তান দিয়ে ভারতের ভার বৃদ্ধি হ'তে দেবো না। সাক্ষী থাক অন্তর্যামী ভগবান! আর তুমিই আমায় সে বিপদে রক্ষা কোরো।"

৪

সন্ধ্যা হইতে কিছু বিলম্ব ছিল; বর্ষার বর্ষণ-ক্লান্ত আকাশে বিদায়োন্মুখ সূর্য্যের শেষ রশ্মিচ্ছটা বিচিত্র বর্ণে ও বিবিধ আকারে নিজেদের গঠিত ও সজ্জিত করিতে ব্যস্ত ছিল। ইন্দ্রনাথ বাবুর বাড়ীর সাম্‌নে ছোট্ট একটুখানি বাগান; তাহাতে বাঁশের মাচায় তোলা জুঁইএর লতায় রাশি প্রমাণ ফুল ফুটিয়া বাস্তাশুদ্ধ যেন মাতাইয়া তুলিয়াছে। এক পাশে একটা কচি শ্যামল পাতা ও রাঙ্গা ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়ায় বোধ হইতেছিল, যেন আকাশের লালের খানিকটা আচমকা খসিয়া পড়িয়াছে!

অমিয়া কতকগুলি জিনিয়া ফুলের বীচি আনিয়া বৃষ্টি-আর্দ্র মাটীতে পুঁতিতেছিল। পাশের বাড়ী হইতে দেখিতে পাইয়া হিতেন্দ্র ও অনুজা তাহার নিকট ছুটিয়া আসিল। দুজনেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "আমায় চারটি বীচি দিন্ না—আমাদের বাড়ী আমরাও বাগান করবো।"

অমিয়া গোটা কয়েক বীজ তাহাদের হাতে দিয়া বলিল—"বাগান তো করবে, কিন্তু যা' তোমাদের বাড়ী ছাগল চরে,—ফটকটা ভেঙ্গে গেছে—গাছ কি থাকবে!"

অনুজা তৎক্ষণাৎ বীজ কয়টী হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল—"ঠিক কথা! যে আমাদের বাড়ীর দশা, বাগান করে কি হবে? নাঃ—করবো না বাগান।"

হিতেন্দ্র অমনি চট করিয়া বলিয়া উঠিল—"কেন করবি না? খুব করবি! বাবা তো আর অমর হয়ে জন্মায় নি,—বাবা মরে গেলে বাবার ভাগটা তো আমার হবে? আমি তখন ফটক মেরামত করবো কি না। যে মদ খাচ্চে, দেখ না, কোন দিন মরে পড়ে বলে।"

অনুজা তাড়াতাড়ি বীজ কুড়াইতে কুড়াইতে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল—"আহা, এমন দিন কি হবে! তা' হলে মাও বাঁচে, আমরাও বাঁচি,—মার খেতে হয় না আর।"

অমিয়া উহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আড়ষ্ট হইয়া গেল। তার হাত যেন আর চলিতে চাহিল না। একটা গভীর বিতৃষ্ণায় মনটা তার যেন অবসন্ন হইয়া আসিল। বীজ বপন ফেলিয়া রাখিয়া সে উঠিয়া তাড়াতাড়ি তার মার কাছে চলিয়া গেল। মা তখন রান্নাঘরের দালানে তোলা উনানে ছেলেদের জন্য খাবার করিতেছিলেন,—মেয়েকেই বোধ করি খুঁজিতেছিলেন, তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"দে তো মা লুচি ক'খানা বেলে। মেঘে মেঘে একেবারে সন্ধ্যে হয়ে গ্যাছে!"

অমিয়া লুচি বেলিতে বসিয়া খানকতক বেলিয়াই ডাকিল—"মা!"

মা গরম ঘিয়ে দুখানা করিয়া লুচি ফেলিয়া ত্রস্ত করে তাহাদের টানিয়া তুলিতে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন, তৎকার্য্যনিযুক্ত থাকিয়াই উত্তর দিলেন—"কি রে?"—তার পর বলিলেন—"উষা, বিভা, শচীন্, ওদের ডাক দে' দেখি, খেতে বসুক!"

"ডাকচি"—বলিয়া পুনশ্চ একটু ইতস্ততঃ করিয়া অমিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—"মা!—একটা কথা বলবো?"

মা ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত লুচি-ভাজা বন্ধ রাখিয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

"কি বলবি বল্ না?" পরে তাহাকে নীরব দেখিয়া পুনশ্চ কহিলেন— "তার অত ভূমিকা কর্‌ছিস্ কেন?"—বলিয়া পুনশ্চ এক এক করিয়া দুখানা বেলা লুচি ঘিয়ের মধ্যে ছাড়িয়া দিলেন। আধ মিনিটের অমনো-যোগে গরম ঘি অজস্র ধূমোদ্গীরণ আরম্ভ করিয়া জ্বল্‌নোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল তাড়াতাড়ি কড়াখানা নামাইয়া ফেলিতে হইল।

অমিয়া এই সময় ভয়ে ভয়ে বলিয়া ফেলিল—"তোমার পায়ে পড়ি, সত্যি মা, আমার বিয়ে দিও না।"

একে ছেলেদের খাবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—তারা খাইতে পায় নাই, তার উপর কড়ার ঘি ধরিয়া গিয়া লুচি দুখানার কালো জামের রং হইয়া গেল, মায়ের মন খুবই সুপ্রসন্ন থাকা সম্ভব নয়। তার উপর অত বড় মেয়ের যখন তখন এই অসঙ্গত আবদারে খুসী হইয়া উঠিবারই বা কতটুকু আছে। কড়ার ঘিয়েরই কাছাকাছি তাতিয়া উঠিয়া মা পরুষ কণ্ঠে বকিয়া উঠিলেন—"ফের সেই ভূতে ধরেছে! কি যে পাগলামী করিস! ভদ্র-লোকের ঘরের মেয়ে বিয়ে না করে কি নার্স হবি না কি? ভ্যালা তোকে পাশ দিইয়ে মাথা বিগড়ে দেওয়া গ্যাছে। নে'—এখন ওগুলোকে খেতে দিবি, না দিবি না, তাই বল্ তো দেখি?"

অমিয়া একটা উদ্যত দীর্ঘশ্বাস বুকের ভিতর চাপিয়া লইয়া বিষণ্ণ মুখে আদিষ্ট কর্ম্মে মনোযোগী হইল।

অমিয়া তার মনের সেই ভয় ভাবনা লইয়া সর্ব্বদা যেন ত্রস্ত হইয়া রহিল। মা বাপের মুখে যদি তার বিবাহের কোন কথাবার্ত্তা শুনিতে পায়, অমনি তাঁর বুকের মধ্যে ধড়-ফড় করিয়া উঠে। পৃথিবীর সকল পুরুষকেই যেন মল্লিক-বাড়ীর সেজ-বাবুর ছায়া বলিয়া একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠিয়া তার

মনকে তাদের উপর বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। বিবাহের কথা মনে হইলেই তার একটা তীব্র আতঙ্কের সহিত মনে হইত—যদিই দৈবাৎ তার স্বামী-রত্নটী ওই সেজ-বাবুর মতন তার প্রতি ব্যবহার করে, তার সন্তানগুলিও হিতু-অনুজের মতও তো হইতে পারে! অমনি পায়ের তলা হইতে আরম্ভ করিয়া মাথার চুলের গোড়াগুলো অবধি তার আতঙ্কে কাঁপিয়া স্থির হইয়া যাইত।

৫

কিন্তু চিরদিন ঠিক এক ভাবেই কাহারও দিন যায় না। পক্ষী-শাবক তার পুরাতন নীড়টীকেই প্রাণ দিয়া ভালবাসে বটে, তথাপি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুধু সেইটুকুকেই সে আর যথেষ্ট মনে করিতে পারে না। অমিয়ার বাপ যখন তার পড়াশুনা চুকাইয়া ফেলিতে আদেশ দিয়া তাহার বিবাহের জন্য ঘটক নিযুক্ত করিলেন এবং সেই ঘটক ঠাকুরও আজ একজন কাল একজনের খবর লইয়া আসা-যাওয়া আরম্ভ করিয়া দিলেন, তখন নিশ্চিত বিপদকে বরণ করিয়া লইতেই হইবে বুঝিয়া যেমনি অমিয়া নিজের মনকে কতকটা প্রস্তুত করিয়া লইল, অমনি সেই ফাঁকে ফাঁকে মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রেরণায় একটা কৌতূহল ও আগ্রহও যেন তার সেই বিবাহ-বিদ্বিষ্ট চিত্তকে ভিতরে ভিতরে পাইয়া বসিল। প্রথম প্রথম ঘটকের খবর আসিলেই সে মনে মনে রাগ করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া যাইত। তার পর ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া তার মনের মধ্যে ঐ বসন্ত-দূতের সংস্পর্শে আগত-প্রায় বসন্তের একটা সাড়া পাওয়া গেল। এখন লুকাইয়া চুরি করিয়া সে তার ভবিষ্য বরের কথা কাণ দিয়া শুনিয়া লয় ও মনে মনে বিচার করিয়া দেখে।

ইতিমধ্যে দু' জায়গা হইতে তাহাকে কনে দেখিয়া গিয়াছে। বরের অভিভাবক এত বড় বয়সের মেয়ে দেখিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া কোন মতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। অপর স্থলে মেয়ে পছন্দ হইয়াও দেনা-পাওনায় বাধা প্রাপ্ত হইল। বরের পিতা বলিয়া পাঠাইলেন যে, মেয়ে দুইটা পাশ করিয়াছে বলিয়া তো আর তাহাকে চাকরী করাইতে পারিবেন না। অতএব গহনাপত্র ও বিবাহের ব্যয়টা কোথা দিয়া আসিবে? ইত্যাদি, অতএব—

উমাশশী বলিলেন—"হ্যাঁগা! তবে যে মেয়েকে লেখাপড়া শেখালে বিয়েতে বেশি টাকা লাগে না?"

ইন্দ্রনাথ বিরক্তচিত্তে বলিলেন—"ও সব বাজে কথা,—টাকা মেয়ে জন্মালেই দণ্ড লাগে, তার উপর রূপগুণ, বিদ্যেবুদ্ধি—ওগুলো সবই ফাউ।"

অমিয়া তার পুঁথিপত্র জড় করিয়া পড়াশুনায় মন দিয়াছিল, কিন্তু মন সে আর ভাল করিয়া দিতে পারে নাই। বইএর খোলা পাতার পর পাতায় তার চোখের দৃষ্টি ভ্রমিয়া ফিরিলেও, মন তার আর সেদিক দিয়া পথ চলে না। কাজেই উহারা তার দৃষ্টি-সীমাতেই আবদ্ধ থাকে, মাথার ভিতর প্রবেশের কোন পথ পায় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া বইখানা কোলের উপর মেলিয়া রাখিয়া চুপ করিয়া সে বসিয়া থাকে। কল্পনা তার উড়ন্ত মনকে লইয়া তখন কতই না খেলা করিয়া বেড়ায়। কখন একটী অচেনা অজানা গৃহের মধ্যে গৃহকর্ত্রীরূপে নিজেকে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এক পুরুষের পাশে কার্য্যরতরূপে কল্পনা করে, কোলে কখন একটী ননীর পুতলী শিশু; আবার বিপরীত দৃশ্য দর্শনে কখনও বা শিহরিয়া তার স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া যায়।

এক দিন হেমন্তের হিমস্নাত প্রভাতে ভোরের বেলাই অমিয়া জাগিয়া উঠিয়া তার খোলা জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল। তার মনে হইল, সেদিনকার ভোরের পাখীর কণ্ঠে যেন কি এক নূতন স্থর

ধ্বনিত হইতেছিল। শিশিরে-ভেজা শেফালি ও কনকচাঁপার মিশ্র সুবাসেও যেন একটা নূতন গন্ধ পাওয়া যাইতেছিল। বাতাস আলো সবই যেন নূতন নূতন। দূরে আকাশের গায়ে ছবি আঁকিয়া যে সব চির-পরিচিত বাড়ীঘর সে আজন্মকাল ধরিয়াই দেখিয়া আসিতেছে, সেগুলা শুদ্ধ যেন তার আজ নূতন ঠেকিল। কিসের যেন একটা অজ্ঞাত পুলকে মনটা তার সহসা সেই নূতন হাওয়ায় পাল তুলিয়া দিয়া কোন্ নবীন আনন্দের সাগরে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িবার জন্য যেন উন্মুখ হইয়া উঠিল। অকারণে তার ঘুম ভাঙ্গিয়া সর্ব্বপ্রথম মনে হইল, আজ যেন তার জীবনে খুব বড়-রকমের একটা শুভ ঘটনা ঘটিবে।

নিজেকে আগতপ্রায় মঙ্গল লাভের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করিয়া লইয়া সে শয্যাত্যাগ করিল। যেদিক দিয়া গেল, চার দিকেই চাহিয়া দেখিল, তার বোধ হইল, সকলেই যেন তাহাকে সানন্দ পুলকে সুপ্রভাত জানাইয়া দিতেছে। মনের সে বিপুলতর উচ্ছ্বাস ও পরিপূর্ণতা লইয়া সে যেন আপনাকে গোপন রাখিতে পারিতেছিল না। তাড়াতাড়ি আসিয়া ছোট ভাইবোনগুলিকে কোলে তুলিয়া, বুকে টানিয়া আদরে চুম্বনে ভরাইয়া দিল। মা বসিয়া তরকারি কুটিতেছিলেন, বালিকার মত ছুটিয়া আসিয়া পিছন হইতে তাঁকে জড়াইয়া ধরিল।

মা রাগ দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"দিন দিন তুই খুকি হচ্চিস না কি অমিয়া? এক্ষনি দুজনেই যে কেটে মরতুম!"

অমিয়া মার পিঠের উপর মুখ ঘষিতে ঘষিতে হাসিমুখে কহিল—"না মা, কিচ্ছু হতো না মা! লক্ষ্মীটি, আমায় আজ বকো না।"

উমাশশী সস্মিতমুখে মেয়ের মাথায় হাত দিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন রে, আজ তোর কি?"

মেয়ে মায়ের সেই স্নেহস্পর্শটুকুর তলায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মেলিয়া দিয়া

সুখোৎফুল্ল মুখে স্নিগ্ধকণ্ঠে উত্তর করিল—"কি জানি মা, কি! কিন্তু আজকে আমার বড্ড ভাল লাগচে।"

সারা দিনটা যথাপূর্ব্বই কাটিয়া গেল। অমিয়া দিনের প্রথমাংশটা হাসিয়া লাফাইয়া ছোটদের সঙ্গে খেলিয়া মায়ের কাজের সাহায্য করিয়া কাটাইয়া দিল। ভাইবোনদের স্নানের সময় ভাল করিয়া সাবান দিয়া স্নান করাইল, তাদের পোষাক পরানো, চুল আঁচড়ানো, ভাত খাওয়ানো, পড়া বলা সব কাজেই আজ সে তার যথাসাধ্য যত্ন লইয়া সমস্তই সুসম্পন্ন করিয়া তুলিল। তার পর যে যাহার কাজে স্কুলে কাছারীতে সবাই বাহির হইয়া গেলে, সেও আহারাদি সারিয়া একলা ঘরে বই খাতা লইয়া বসিয়া পড়িল।

অমিয়ার একখানি ছোট নীল-মলাট-দেওয়া নোটবুক ছিল। মধ্যে মধ্যে সে এইখানিতে গোপনে কবিতা লিখিত। আজ সেখানা খুলিয়া বসিয়া লিখিল—

আজিকে কি দিবে দেখা হে প্রিয় আমার!
এই যে আনন্দ ধ্বনি, এ কি তব আগমনী?
তুমিই কি দে'ছ খুলে এ শোভা-ভাণ্ডার?
পুলকে কম্পিত হিয়া, আছি পথে দাঁড়াইয়া,
সঁপিতে চরণে তব, হৃদি ফুলহার,—
আজিকে কি পাব দেখা হে প্রিয় আমার!

কবিতা লেখা শেষ হইল না,—চাকর আসিয়া খবর দিল, বাহিরে একটী ভদ্রলোক আসিয়া বাবুকে খুঁজিতেছিলেন,—বলিলেন, বাড়ীর ভিতর হইতে খবর লইয়া এস, ক'টার সময় তিনি বাড়ী ফিরিবেন। বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য আছে।

অমিয়া বিস্মিত হইল। এমন সময়ে কে তার পিতাকে খুঁজিতে আসিল! নিশ্চয়ই কোন অজানা লোক হইবে। সে চাকরের মুখে উত্তর

পাঠাইয়া দিয়া, নিজে উঠিয়া জানালার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। এখান হইতে বাড়ীর সাম্‌নেটা দেখা যায়। দাঁড়াইবামাত্র তার চোখে পড়িয়া গেল, —সদর দরজার কবাট ধরিয়া একটী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া উৎসুক নেত্রে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতেছেন। সে দাঁড়াইবামাত্র তাঁহার উর্দ্ধোত্থিত ব্যগ্র দৃষ্টির সহিত তাহার সকৌতুক দৃষ্টি সম্মিলিত হইয়া গেল। অমনি লজ্জারক্ত মুখে সে ত্রস্তপদে সরিয়া আসিল।

সরিয়া আসিল বটে, কিন্তু চলিয়া গেল না। কি জানি কিসের ঝোঁকে সে তার স্বভাব-বহির্ভূত কার্য্য করিল। জানালার কবাট বন্ধ করিয়া দিয়া উহারই ফাঁকের ভিতর হইতে সে সেই অপরিচিত আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল ; এবং দেখিতে গিয়াই তার মনে হইল—এমন রূপ সে পুরুষের মধ্যে আর কখন দেখে নাই !

বাস্তবিকই কি সেই অপরিচিত পুরুষ এতই সুরূপ ? কিন্তু কোন্ মুহূর্ত্ত যে কাহার জন্য দেখা দেয়, এবং কোন্ অজ্ঞাত কুহকী তার মোহনীয় কুহকের সম্মোহন-শক্তি প্রয়োগ করিয়া বইসে, কেহই জানে না। সেইক্ষণে সমীপাগত যে কোন রূপকেই অপরূপ ও যে কোন সুদূরাবস্থিতকে নিকটতম আত্মীয়তম বলিয়া মনে হয়। সেই মোহের কাজল চোখে লাগান ছিল বলিয়াই সহসা ঐ অজ্ঞাত পুরুষকে দেখিয়াই অমিয়ার বোধ হইল, ঐ যে তাদের দ্বারে আসিয়া আজ ঐ অচেনা অতিথি দাঁড়াইয়াছে,—এ যেন কোন্ দূরদূরান্তর হইতে ছুটিয়া তাহারই সন্ধানে আসিয়াছে,—এ যেন শত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া তাহারই প্রতীক্ষাকারী,—একমাত্র তাহারই। এই কথা মনে হইবামাত্র তার সমস্ত দেহ-মন যেন সেই ভোরের বেলার পুলক-স্মৃতিতে পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তার সমস্ত দেহ যেন সুখাবেশে শিথিল হইয়া আসিল। সে নিজেরও অজ্ঞাতে সেই অজানা অতিথির উদ্দেশে যুক্তকরে মনে মনে প্রণাম-নিবেদন জানাইল। মনে মনে বলিল—নিশ্চয়—

নিশ্চয়ই তুমি আমার প্রতি দেবতার দান! আমি যে তাঁকে প্রাণপণে ডেকেছিলেম, তাই তিনি হয় ত আমার জন্য তোমায় বেছে দিয়েছেন!

৬

আফিষ হইতে ফিরিয়াই, সেই আফিষের পোষাকেই ইন্দ্রনাথবাবু প্রায় ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া ডাকিলেন—"ছোট-বৌ! বলি শুন্‌চো?"

শ্বশুরবাড়ীতে উমাশশী ছোটবৌ হইয়াই প্রবেশ করিয়াছিল। বড় মেজ জায়েরা স্বতন্ত্র থাকিলেও তার ছোট-বৌ পদটা ঠিকই আছে।

উমাশশী রান্নাঘর হইতে সাড়া দিয়া বলিলেন—"এই যে আমি এখানে, কি বলচো?"

ইন্দ্রনাথ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন—"যতীন এসে যে সারাদিন বাইরের ঘরে বসে রয়েছে, সে অমিয়াকে বিয়ে করতে চায়, নিজেই কনে দেখবে। শীগ্‌গির উঠে এসে মেয়ে সাজিয়ে দাও দেখি।—"

এই খবর শুনিয়াই ময়দা-মাথায় নিযুক্তা অমিয়ার মুখ একেবারে জবাফুলের মতন টক্‌টকে লাল হইয়া উঠিল। বুকের ভিতরটা তার যেন কি একটা বিপুল উল্লাসের তরঙ্গে তালে তালে দোল খাইতে লাগিল। তবে তো তার ধারণায় ভ্রান্তি নাই! নিশ্চয়ই সে দেবতার দান!

উমাশশী কিন্তু এ সম্বাদে প্রমাদ গণিলেন। একে এখন কাজকর্ম্মের সময়—তার উপর মেয়েও বড় সোজা নয়। কনে দেখা দিবার জন্য কতই না তাকে ভালকথা মন্দকথা কহিয়া দেড় দুঘণ্টা বুঝাইয়া সমজাইয়া তবে তো রাজী করিতে হইবে! সে কি অল্পে বশ হয়! কাঁদিয়া কাটিয়া মুখ চোখ ফুলাইয়া গম্ভীর বিরক্ত মুখে কনে-দেখা দিতে গেলে, কেহ কি

কোন জন্মে কনে পছন্দ করিতে পারে? এই জন্যই তো দেখিতে ভাল হইলেও তাকে কোন দিনই কেহ পছন্দ করিতে পারিবে না। মেয়ে বলে 'আমি কি শাক না মাছ, যে, আমায় যে-সে এসে নেড়ে-চেড়ে দেখে যাবে!' আরে বাপু, তুই এটা বুঝিস্ না যে, শাকমাছের চেয়েও তুই অধম,—তুই মেয়েমানুষ। মাছটা পচা হ'লে পয়সা ক'টাই জলে যায়, আবার একটা কেনা চলে; কিন্তু তোকে বদলাইয়া আর একটা কিনিতে গেলে তো একটু হাঙ্গামা পোহাইতে হইবে। আজকালের বাজারে আর আগের দিনের মতন সহজে সেটা হইবে না।

কিন্তু উমাশশীর বিস্ময় আজ সীমা অতিক্রম করিল। একবার মাত্র ডাক দিতেই নেহাৎ ভালমানুষটীর মতন অমিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিল; এবং মা যেমন ইচ্ছা সাজাইয়া দিলেও সে এতটুকু প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিল না। শুধু মা যখন জমকালো দেখিয়া নিজের একটী বেনারসী স্যুট বাহির করিয়া পরিতে বলিলেন, তখন সে নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে মৃদুকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, 'ওটাতে বড্ড বড় দেখায় না মা! তার চেয়ে আমার বাসন্তী রংয়ের পাতলা মাদ্রাজীটা পরবো?"

মা ঈষৎ বিস্মিত আনন্দে মেয়ের মুখের দিকে চাহিতেই, সে লজ্জায় আরক্ত হইয়া মুখ নত করিল। মা বলিলেন, "তা বটে! আচ্ছা, তা'হলে তাই পর।"

যতীন বলিয়া ইন্দ্রনাথ যাহার পরিচয় দিয়াছিলেন, সেটী ইন্দ্রনাথের বহুদিনের পাঞ্জাব-প্রবাসী বাল্যবন্ধু যোগীন্দ্রনাথের ছেলে। ইহারা সে দেশেরই বাসিন্দা হইয়া গিয়াছে। কথাবার্ত্তা কয়, তাহাতেও কিছু পাঞ্জাবী টান বোঝা যায়। ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি সেইখানেই সব। শুধু বিবাহটাই বাংলার সহিত সম্বন্ধটাকে বজায় রাখিয়াছে। বাঙ্গালী এইটুকুই কেবল ছাড়িতে পারে না। যতীন বাপের মৃত্যুর পর তাঁর কাঠের গোলা

চালাইতেছে। কণ্ট্রাক্টারীও সে করে, রোজগার মন্দ হয় না! বিষয়-আশয় বেশ আছে। বয়স তার আনুমানিক বছর ত্রিশ-বত্রিশ—এম্‌নি হইবে। চেহারা বেশ জঙ্গী জোয়ানের মত। পাঞ্জাবী ধরণ কতকটা। গায়ের রং বেশ ফরসা, মুখের রং রোদে ঘোরার জন্য কতকটা তামাটে হইয়া আসিলেও ফরসা বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

কলিকাতার এক জায়গায় বিবাহের দিন স্থির পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছিল। পরের দ্বারায় কথাবার্ত্তা হয়। বিবাহ করিতে আসিয়া দেখা গেল—মেয়ে নিতান্ত ছোট,—বড় জোর এগার বৎসর বয়স—তার চেয়ে অন্ততঃ কুড়ি বৎসরের ছোট। রাগ করিয়া বিয়ে ভাঙ্গিয়া এবার নিজেই সে কনে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। দৈবক্রমে অমিয়ার সন্ধান পায় ও তৎক্ষণাৎ একাই এ বাড়ীতে চলিয়া আইসে। বাপের পুরাতন চিঠি-পত্রের ফাইলে ইন্দ্রনাথের চিঠি ও বাড়ীর ঠিকানা তার চোখে পড়িয়াছিল এবং মনেও ছিল,—ছেলেটির স্মরণশক্তি বেশ তীক্ষ্ণ, পড়াশুনাও মন্দ ছিল না। বি-এ অবধি পড়িয়াছিল,—কিজন্য জানা নাই. পরীক্ষা না দিয়াই পড়া ছাড়িয়া দেয় এবং বাপের কারবারে ঢুকিয়া পড়ে।

কনে দেখা হইয়া গেল। কনে অপছন্দের মতন নয়, অপছন্দ হইলও না। দু'একটা কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াই যতীন ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া বলিল—"ওঁকে ভেতরে যেতে বলুন,—এইবারে আপনাকে দু' একটা কথা বলে আমি আজকের মতন উঠবো।"

অমিয়া এই অবসরে একবার চুরি করিয়া চকিত চক্ষে তাহার দ্রষ্টাকে দর্শন করিয়া লইল এবং আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া গেল। অন্তরালে মা দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেইখানে আসিয়া মার বাহুতে মুখ লুকাইল। মনটা তার আনন্দে, লজ্জায় এমনি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, মায়ের সামনে সহজ ভাবে দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। মা কিন্তু তার এই মুখ লুকানোর

সত্য অর্থটাকে না বুঝিয়া বরং বিপরীতই অনুমান করিয়াছিলেন। ঈষৎ বিরক্তি-মিশ্রিত কণ্ঠে অথচ অন্যের অশ্রাব্য চাপা সুরে তিনি কহিয়া উঠিলেন—"অমন করে রৈলি যে! কেন—খাসা দেখতে তো, তোর কি মনে ধরলো না না কি? কি চাস্ তুই?"

অমিয়া লজ্জায় জড়াইয়া মায়ের গায়ের মধ্যে আরও ঠেসিয়া গিয়া মৃদুতর কণ্ঠে কোনমতে জবাব দিল—"কে বলছে মন্দ?"

"তবে আবার কি? দেখতে ভাল, পয়সা আছে, বয়সও তেমন কিছু বেশি নয়। দেখ, মিথ্যে কোন মতবাদ তুলে বসো না যেন! যদি ও তোমায় পছন্দ করে থাকে, তুমি তাই যথেষ্ট মনে করো।"

অমিয়া মার মুখের দিকে বারেক চাহিয়াই নত চক্ষে ত্বরিৎস্বরে কহিয়া উঠিল—"আমি কি বলেছি—আমার পছন্দ হয়নি। তুমি আমাকে কি যে মনে কর!"

বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি পলাইয়া গেল। উমাশশীর মুখ এই কথায় প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে একটুখানি সকৌতুক হাসি হাসিলেন,—এই না মেয়ে বলতেন যে, বিয়ে করবেন না! যাক্—বাঁচা গেল!

৭

অমিয়ার বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গেল। বর যতীন জানাইল যে, বিবাহ করিয়াই সে তার স্ত্রীকে লইয়া রাওলপিণ্ডিতে চলিয়া যাইবে। এই প্রস্তাবটাতে ইন্দ্রনাথ বাবুর মনটা কিছু দমিয়া গিয়াছিল। তাঁর মনে হইল—হয়ত উমাশশী এবং অমিয়া নিজেও এটা পছন্দ করিবে না। এত শীঘ্র বহুদিনের জন্য বহুদূরে আত্মীয় স্বজনকে ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া

বাঙ্গালীর মেয়ের পক্ষে সুকঠিন,—তা যতই কেন সে বড় হোক না, আর লেখা পড়াই শিখুক।

কিন্তু অমিয়াকে যখন তিনি নিজে অনেক করিয়া বুঝাইয়া আস্তে আস্তে খবরটা দিলেন, তখন সে চুপ করিয়া রহিল, ভালমন্দ কোন জবাব করিল না। ইহা দেখিয়া ইন্দ্রনাথ বাবু ঈষৎ আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার এতে কোন আপত্তি আছে?"

তখন ক্ষণকাল মাত্র নীরব থাকিয়া অমিয়া আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেও খুসী হইলেন। উমাশশী অসন্তুষ্ট না হইলেও অন্তরের মধ্যে হয়ত একটুখানি আহত হইলেন, এবং বলিলেন—"মেয়ে পরের জন্যেই হয় যে বলে, তা' ঠিক!"

বাড়ীতে বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল। সময় খুব কম—একমাসও নয়। ইহার ভিতর সবই তো করিতে হইবে। সেমিজ, পেটিকোট, ব্লাউস, জ্যাকেট, বডি—সবই মায়ে ও মেয়েতে দিন রাত কল চালাইয়া তৈরি করিতে লাগিয়া গেল। বর নগদ ও দান-সামগ্রী কিছুই লইবে না—শুধু সামান্য বরাভরণ ও মেয়ের যা কিছু। উমাশশী তাই মেয়ের জন্য কাপড় জামাটাই বেশি কবিয়া করিতে লাগিলেন। গহনা পাঁচসাতখানি একটু কায়েমী দেখিয়া গড়াইতে দেওয়া হইল। যতীন নিজে যাহা দিবে, তাহার একটী ফর্দ্দ দিয়াছিল। দেখা গেল, তাহাতে কাণ রতনচুর পর্য্যন্ত সীঁথিপাটী ফুলঝুমকা সবই মজুদ আছে। সেগুলি তার মায়ের গায়ের গহনা। যতীন মায়ের এক সন্তান, তাই সবই তিনি যতীনের বউকে দিয়া গিয়াছেন।

মা বলিলেন—"গহনার তো গাদা আছে দেখছি। তবে ও-সব সেকেলে হয়ে গ্যাছে, কেউ আর পরে না। তা' এর পর সব নূতন করে গড়িয়ে নিস।"

পাকা-দেখায় যতীন কনেকে একটী মুক্তার মালা পাঠাইয়া দিল। প্রতিবেশিনীরা জিনিষ যাচাই করিয়া মন্তব্য করিলেন—"হঁ্যা, পছন্দ ভাল! তা' জিনিষটারও দাম আছে। হাজার দুইএর কমে আর হয়নি।"

কেহ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"অত হবে না, হাজারখানেক হয় ত ঢের!"

উমাশশী এক দিন স্বামীকে বলিলেন—"দেখ, অমিয়া একটা কথা বলছিল,—সে বলে, অত দূরের লোক, এত বয়স অবধি বিয়ে করেনি, *স্বভাবচরিত্র ভাল তো? ভাল করে একটু খবর নিলে হতো না।"

ইন্দ্রনাথ হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে জবাব দিলেন—"বিদুষী হয়ে মেয়ে বাপের ভুলগুলো তবু ধরে দিচ্চে! ওরে বাপু, তা কি আর আমি নিই নি? কলকাতায় যেখানে ও আছে, তার কাছেই নগেন ঘোষের বাড়ী। তিনি রাওলপিণ্ডিতে তিনবচ্ছর ছিলেন, ওদের খুব ভাল করেই জানেন। .তিনি বল্লেন—মেয়ের ভাগ্যে থাকলেই এমন বরে পড়বে।"

উমাশশী নিজে নিশ্চিন্ত হইয়া মেয়েকেও খবরটা দিলেন, ইহা শুনিয়া অমিয়ার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইল। বাবা মা তাকে কি বেহায়াই না ভাবিলেন? দেবতার দানকে, সে এম্‌নি অবিশ্বাসী যে, এত করিয়া যাচাই করিতেছে! নাঃ, এ লোক কখনই মন্দ হইতে পারে না। ভগবান নিজেই যে আগে হইতে জানাইয়া ইহাকে তার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন।

বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহ-রাত্রে বর, পুরোহিত, নাপিত এবং পূর্ব্বপরিচিত নগেন ঘোষের বাড়ীর লোকেরা বরযাত্র আসিয়াছিল। বিবাহে সকল রকমেই খরচপত্র কম করিতে হওয়ায়, ইন্দ্রনাথ তাঁর নব জামাতার উপরে অত্যধিক পরিমাণেই সন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। একে ত নিজে যাচিয়া আসিয়া বিবাহ করিল,—তার উপর

খরচপত্রও বেশী করিতে হইল না,—আবার বরযাত্রীর উপদ্রবও সহ্য করিতে হইল না! নাঃ—নমিতা ও সমিতাকেও দু'একটা পাশ করাইয়া রাখিতে হইবে।

বিবাহরাত্রেই কুশণ্ডিকা শেষ করিয়া বর-কনে বাসর ঘরে গেল। বর বধূকে যে লজ্জাবস্ত্র প্রদান করিলেন, সেখানা দেখিয়া বাসরঘরে অনেক মেয়েই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। আইবুড় ভাতে একখানা সোনার তারের শাড়ী—তা যেন না হয় পাইল। কিন্তু লজ্জাবস্ত্র আবার রূপার তারের শাড়ী-জ্যাকেট দিয়া কে দেয়? নাঃ—জামাইএর হাতটা আছে! তা' হবে না কেন? কণ্ট্রাক্টরের আমাপা পয়সা!

অমিয়ার হাত যখন তার বাপ যতীনের হাতে তুলিয়া দিলেন, তখন গভীর সুখে তার সারা দেহ যেন শিথিল হইয়া আসিল।

বাসরঘরে যতীনকে অনেকেই গান গাহিতে বলিলে, যতীন একজনের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাদের বিদুষী কনে নিশ্চয়ই গাইতে পারেন,—তিনিই একটা গেয়ে শোনান্ না অনুগ্রহ করে।"

জিজ্ঞাসিতা এবং তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া আরও জনকয়েক মহিলা হাসিয়া উঠিয়া জবাব দিলেন—"সে ভাই তুমি নিজেই বলে-কয়ে শুনে নিও, আমরা তো ওর গলা থেকে এতটুকু হুঁহুঁ পর্য্যন্ত কোন দিনই শুনতে পাই নি। এখন তুমি নিজেই একটা গাও দেখি।"

যতীন বিস্তর আপত্তি করিল বটে, কিন্তু শেষটায় একটা গজল গাহিল। গানটা যদিচ কাহারও বোধগম্য হইল না, এবং গায়কের মুখভঙ্গী ও হাত পা নাড়ার ধরণে মেয়ে-মহলে একটা হাস্যরসের উদ্রেকও করিল, তবু অমিয়ার মনে হইল—কেন, মন্দটা কি? বেশ ত ওস্তাদী গান।

অমিয়ার সখীদের মধ্যে দু'একজন ঠাট্টা করিয়া বলিল—"মা গো!

যেমন কাটখোট্টাদের দেশের মানুষ—তেম্নি কি বিতিকিচ্ছি গান শিখেছ! যেন ড্রিল-মাষ্টারের ড্রিল করান—গান গাওয়া ত নয়।”

অমিয়া মনে মনে সখীর উপর একটু বিরক্তি বোধ করিল। মা গো! মুখের উপর কি অমন করিয়াই নিন্দা করিতে হয়? ওঁর বর তো তবু একেবারেই আনাড়ী!—

বিবাহের পরদিন পাঞ্জাব মেলে বর-কনে রাওলপিণ্ডি যাত্রা করিবে। এইবার অমিয়ায় বিবাহের প্রচুর আনন্দ বিচ্ছেদের গভীরতর বেদনায় কোথায় যেন ঢাকা পড়িয়া আসিতেছিল। সকালে উঠিয়াই সে মায়ের কোলের উপর পড়িয়া খুব খানিক ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল। ছোট ভাই-বোনগুলিও তাহাকে ঘেরিয়া যত কাঁদে, সেও তাদের কোলে করিয়া বুকে টানিয়া ততই কাঁদিয়া ভাসায়। বাপ-মা, প্রতিবেশী বুঝাইয়া কান্না থামাইতে পারে না।

বিকালের ডাকে অমিয়ার নামে একখানা চিঠি আসিল। সে সময় সে তার স্বামীর সহিত যাত্রা করিবার জন্য কন্যাসজ্জা করিতেছিল। বরের ইচ্ছানুসারে তাহাকে বিবাহের দামী বেনারসীর বদলে একখানি হাল্কা দেখিয়া লাল শাড়ী পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। গহনা গায়ে সামান্যই দেওয়া হইয়াছিল। কনের চিহ্নের মধ্যে লাল ওড়নার সঙ্গে বাঁধা বরের চাদরখানা গায়ে জড়ানো রহিল, আর কপালে চন্দন না পরাইয়া মায়ের মন সরিল না। বর সাদাসিদা পোষাক—এমন কি, সাহেবী পোষাক পরিয়া প্রস্তুত হইল। ইহাতে উমাশশীর মনটা একটু ক্ষুণ্ণ হইলেও মুখে তিনি কোন আপত্তি তুলিলেন না। আর পাঁচজনে একটু নিন্দা করিল এবং বলিল—“কনেকেই বা আর আলতা দেওয়া কেন, পায়ে মোজা জুতো দিলেই হতো!”

সাজ শেষ করিতেই কন্যা-বিদায়ের পালা পড়িল। ইহারই ভিতরে অমিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিল এবং পড়িতে আরম্ভ করিল। চিঠিখানার খানিকটা পড়িয়াই তার মুখখানা হঠাৎ সাদা ফ্যাকাসে

হইয়া গেল ; এবং সে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ব্যগ্র-আগ্রহে সেখানা শেষ করিয়াই, সেটা রুমালে বাঁধিয়া জ্যাকেটের বুকের মধ্যে ফেলিয়া রাখিল। সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে বলিয়া তখন তাহাকে সকলেই ব্যস্ত হইয়া ডাকাডাকি বাধাইয়া দিয়াছে।

মা বাপ চোখের জলে ভাসিয়া বরের হাতে মেয়ে সঁপিয়া দিলেন। উমাশশীর চোখের জলে দুজনের হাত ভিজিয়া গেল, কিন্তু অমিয়ার চোখে একফোঁটা জলও আর দেখা দিল না। সে শুষ্কনেত্রে মা-বাপের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া যন্ত্রচালিতের মত নিঃশব্দে আসিয়া গাড়িতে বরের পাশে উঠিয়া বসিল। ভাই-বোনগুলি কাছে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল,—সে তাদের দিকে একবার চাহিয়া পর্য্যন্ত দেখিল না। যেন এই কোথায় একটুখানি বেড়াইয়াই আবার এক্ষনি সে ফিরিয়া আসিবে—তার ভাব দেখিয়া এই রকমই মনে হইতে লাগিল।

অনেকেই মনে করিল—যেমন ধেড়ে মেয়ে করে ঘরে রাখা,—বর পেয়ে বর্ত্তে গেছে। মা গো! কত দিনের মত অত দূরে চল্লো—তার মনে এতটুকু কষ্টও কি নেই! খুব মেয়ে দেখলুম বাবু,—অমিয়া!”

গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিতেই যতীন একটা শ্বাসগ্রহণ পূর্ব্বক আপন মনেই বলিয়া উঠিল—“যাক বাঁচা গেল!”

অমনি অমিয়া চমকিত হইয়া তার দিকে সভয়ে চাহিয়া দেখিল। হঠাৎ তার মনে হইল, এই লোককে তার অত সুন্দর মনে হইয়াছিল কেমন করিয়া? সৌন্দর্য্য এর কোন্‌খানটায় আছে? ষণ্ডামার্কর মতন চেহারা, গম্ভীর মুখ, আর এই যে কথাটা সে বলিল, এর মানে এই যে, নির্ব্বিঘ্নে এ বিবাহ হইয়া উঠিবে, এ রকম আশাও হয় ত তার মনে ছিল না!

অমিয়ার বুক ঠেলিয়া একটা আর্ত্ত চীৎকার যেন সবেগে তার গলা চিরিয়া বাহির হইবার জন্য তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল। প্রাণপণে

সেটাকে দমন করিতে করিতে সে ক্ষণপূর্ব্বের বৃষ্টি দ্বারা কর্দ্দমাক্ত রাজপথের উপরে তার চোখ দুইটাকে নিবদ্ধ করিয়া রাখিল। যে তাহাকে প্রবল প্রবঞ্চনা দ্বারা জন্মের মতই মারিয়া ফেলিয়াছে, তাহার কাপড়ের অংশটুকু পর্য্যন্ত সে যেন দেখিতে পারিতেছিল না।

ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ি থামিতেই টক্ করিয়া যতীন নামিয়া দাঁড়াইয়া স্ত্রীর দিকে হাত বাড়াইয়া দিল,—এবং সম্ভাষণ করিল—"এস অমি—নেমে এস—"

অমিয়ার শরীরের মধ্যে যেন একটা প্রবল বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটিয়া গেল। সে সেইখানে আবদ্ধ হইয়া থাকিয়া শুধু দৃঢ় স্বরে কহিল—"বড্ড ভিড় যে!"

যতীন কহিল—"তবে তুমি বসো, আমি লাগেজগুলো রেখে আসি, আর দেখে আসি রিজার্ভ দিয়েছে কি না।" এই বলিয়া সে কুলির সাহায্যে মালপত্র লইয়া প্লাটফর্ম্মের ভিতর দিকে চলিয়া গেল।

পাঞ্জাব মেল দাঁড়াইয়া আছে, সেকেণ্ডক্লাশ কামরায় দুখানা বার্থ রিজার্ভ দেওয়া রহিয়াছে। যতীন তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া ডাক দিল—"এস অমিয়া!"

গাড়ির ভিতর কেহই নাই! শুধু সেই গাঁটছড়া বাঁধা চাদরটা, আর কোচম্যান ভাড়ার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যতীন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কই? মাইজী কাঁহা?"

কোচম্যান উত্তর দিল—"মাইজী তো আপকা পিছাড়ি চলা গিয়া বাবু সাব্।"

যতীন মনে করিল, একলা থাকিতে ভয় পাইয়া অমিয়া তাহার সঙ্গেই গিয়াছিল,—ভিড়ের মধ্যে সে অত লক্ষ্য করে নাই। গাড়িওয়ালার ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল, এমন কি, সেই বার্থ-রিজার্ভ-করা কামরার মধ্যে ঢুকিয়া পর্য্যন্ত খুঁজিয়া আসিল; কিন্তু অমিয়ার কোন অস্তিত্বই কোথাও সে খুঁজিয়া পাইল না। বিস্মিত যতীন হতবুদ্ধি হইয়া

গেলেও, তৎক্ষণাৎ চারিদিকে ছুটিয়া তার হারানো জিনিষ খুঁজিতে আরম্ভ করিল। পাঞ্জাব মেল ছাড়িবার আর বেশি দেরি নাই।

লম্বা গাড়িখানার প্রত্যেক কামরায় উঁকি ঝুঁকি মারিয়া সমস্ত প্লাটফর্ম্ম তন্ন তন্ন করিয়া কোথায়ও যখন অমিয়াকে পাওয়া গেল না, তখন ঘোর দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া যতীন গাড়ি হইতে তাদের মাল পত্র নামাইয়া লইল এবং পুলিসের সাহায্য গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। তার বিশ্বাস হইল, কোন দুর্ব্বৃত্ত লোক নিশ্চয়ই তাহাকে কোনরূপে সরাইয়া ফেলিয়াছে।

একটী কুলি হঠাৎ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম মেয়েমানুষকে আপনি খুঁজছেন বলুন দেখি? একটী রাঙ্গা-শাড়ী-পরা কনে-বউ একটা ভাড়াটে গাড়িতে উঠে হুগলী যেতে বলে দিলে আমি দেখেছি।"

প্রশ্ন করিয়া যতীন বুঝিল, সেই কনে-বউটীই তার স্ত্রী অমিয়া। কিন্তু এ কি প্রহেলিকা! হঠাৎ অমিয়া এমন অদ্ভুত ভাবে তাহাকে ছাড়িয়া লুকাইয়া পলাইয়াই বা যাইবে কেন? ইহার কারণ কি? হয়ত বাড়ীর লোকদের ছাড়িয়া আসিয়া তাদের জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া তাহাকে এই দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে! মনে মনে যৎপরোনাস্তি বিরক্তি বোধ করিতে থাকিলেও যতীনের সেই সদ্যনীড়ভ্রষ্টা বিরহ-বিধুরা কিশোরীর প্রতি একটু করুণাও যে মনের মধ্যে না জাগিল, তাহা নহে। সে মনে মনে বলিল, হয়ত ওঁরা ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করেই পাঠাচ্ছিলেন, তা না করে আমায় স্পষ্ট বল্লেই হতো। তবে আমি তো এ কথা আগেই বলেছিলুম! অনর্থক হায়রানি, কতকগুলো টাকারও শ্রাদ্ধ! আচ্ছা! হয়ত!—তাও হ'তে পারে।

হুগলী যাওয়ার কথা শুনিলেও সে সেটা খেয়াল না করিয়া চুঁচুড়ায় নিজের পিত্রালয়েই অমিয়ার ফিরিয়া যাওয়া সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় করিয়া সেইখানেই প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

৮

বর-কনে বিদায়ের পরই আত্মীয়-কুটুম্বগণ প্রায় সকলেই যে যার ঘরে ফিরিয়া গিয়াছেন। কেবল উমাশশীর বড় ভাজ ও ইন্দ্রনাথের ভগিনী উমাশশীর কান্নায় গলিয়া বাড়ীর বাহির হইতে পারেন নাই। মেয়ে পাঠাইয়া দিয়া উমাশশী বড় বেশি রকমই কাঁদাকাটা করিতেছিলেন।

ইন্দ্রনাথেরও মনটা ভাল ছিল না,—বাহিরের ঘরে চুপটী করিয়া বসিয়া থাকা ভাল লাগিতেছিল না,—উপরে যাইবেন বলিয়া উঠিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় একখানা গাড়ি দাঁড়াইবার শব্দ হইল ও একটু ক্ষণমাত্র পরেই ঘরে আসিয়া ঢুকিল যতীন্দ্র।

"এ কি!—তুমি! ফিরে এলে যে?"—বলিয়াই ইন্দ্রনাথ কিছু ভীত বিস্মিত চমকিত ভাবে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিলেন—অমিয়ার কি কোন অসুখ করিল না কি?

যতীন জিজ্ঞাসা করিল—"অমিয়া এখানে ফিরে এসেছে?"

ইন্দ্রনাথের মুখ সাদা হইয়া গেল—"অমিয়া এখানে ফিরে আসবে? এ কথার মানে কি যতীন?"

যতীনকে এইবার একটু বিপন্ন দেখাইল। সে উত্তর করিল—"যদি সে এখানে না এসে থাকে, তাহলে এর মানে যে কি, তা আমি নিজেও তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

ইন্দ্রনাথবাবুকে ভূতাহতের মতই দেখাইল। তিনি থরথর করিয়া কাঁপিয়া একখানা চেয়ারের উপর ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া আর্ত্তভাবে কহিয়া উঠিলেন—"কি হলো কি! কেন তুমি তাকে একলা ফেলে চলে এলে? কোথায় গেল সে? ও যতীন! কি করলে তুমি তাকে?"

যতীন যতটুকু জানিত, সেইটুকুই সে বলিল। শুনিয়া ইন্দ্রনাথবাবু যেন ঝড়ে-ভাঙ্গা গাছের মতই হেলিয়া পড়িলেন।

"তাহলে কি হবে! কি করি এখন?"

যতীন শ্বশুরের মত অধীরতা দেখাইল না, সে স্থিরভাবে কহিল—"আপনি একবার ওঁকে ডাকুন দিকি, মা হয়ত এর কোন কারণ খুঁজে পেতে পারেন।"

তাহাই হইল। কিন্তু উমাশশী ব্যাপার শুনিয়া যেরূপ অধীর হইয়া পড়িলেন, তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া দায় হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"হয়ত তাকে চোরে ডাকাতে মন্দ লোকে ধরে নিয়ে গিয়ে এতক্ষণে মেরেই ফেল্লে! কি বলে তুমি তাকে অমন করে একলা ছেড়ে চলে গ্যালে! কেন মরতে আমি সঙ্গে লোক দিলুম না!"

স্বামীকে বলিলেন—"তোমারই বা কি আক্কেল যে বিয়ের কনে নিয়ে যাচ্ছে, তুলে দিতে সঙ্গে গেলে না বা একটা চাকর পাঠালে না!—হ্যাঁগা, সে ওয়েটিংরুমে বসে নেই ত?"

যতীন ঘাড় নাড়িল। তার পর বলিল—"না—সে আমি সব দেখেছি। তাছাড়া কুলি যে তাকে গাড়ি ভাড়া করে হুগলীর দিকে আসতে দেখেছে।"

উমাশশী কাঁদিয়া বলিলেন—"ঐ কুলিই যে ডাকাতদের কেউ নয়, তাই বা তোমায় কে বল্লে? সে কি না সেই মেয়ে যে নিজে গাড়ি ভাড়া করে চুপি চুপি পালিয়ে আসবে।"

ইন্দ্রনাথবাবু চিন্তাগম্ভীর মুখে মন্তব্য করিলেন—"তাও অসম্ভব নয়। আজকাল তো কত রকমই শোনা যায়।"

উমাশশী কাঁদিতে কাঁদিতে জামাইকে প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা সেই কুলিটা কি মুসলমান? ওরে অমিয়া মা রে! ওরে তোর কি দুর্দ্দশা

হলো রে মা—” বলিয়া তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই, ইন্দ্রনাথবাবু তাঁহাকে একটা ধমক দিয়া উঠিলেন,—“করচো কি ? এক্ষনি লোক জড় হয়ে যাবে যে !—”

এই সময়ে যতীন কিছু কুণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—“আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনারা কি তাকে তার অমতে জোর করে বিয়ে দিয়েছিলেন ? আমায় কি তার পছন্দ হয় নি ?”

ইন্দ্রনাথ কি উত্তর দিতে গেলেন, তাহার পূর্ব্বেই উমাশশী কান্না থামাইয়া সবেগে বলিয়া উঠিলেন—“এ কথা তুমি কেন মনে করচো যতীন ! তোমায় সে খুব খুসী হয়েই বিয়ে করেছিল। বরং অনেক দূরে নিয়ে যাবে বলে আমরা ইতস্ততঃ করেছিলুম,—তোমার শ্বশুর নিজেই ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ‘তোমার কি কোন আপত্তি আছে ?’ তাতে দিব্যি হাসিমুখেই ও জবাব দেয় যে, ‘না’ ‘না’ ‘না’ সে তুমি ভেবো না, তোমায় ওর খুবই পছন্দ হয়েছিল। আহা, মায়ের আমার মুখে আনন্দ যেন খেলা করে বেড়াচ্ছিল। তোমায় দেখবার আগে বরং যত সম্বন্ধ এসেছে, বিয়ে করবো না বলে হাঙ্গামা করতো।”

যতীন এতক্ষণের পর এইবার একটু অধীরতা প্রকাশ করিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—“তাহলে, ব্যাপারটা যে কি ঘটলো, আমি যদি এর একটুও কিছু বুঝতে পারচি ! হয়ত এর মাঝখানে আর কেউ—আর কোন লোক—”

ইন্দ্রনাথবাবু রোষ-গম্ভীর স্বরে বাধা দিলেন—“আমার ফুলের মতন পবিত্র মেয়ের সম্বন্ধে ও ভাবে কথা বলো না যতীন ! সে আমার দেবতার মতন শুদ্ধ,—”

উমাশশী অস্ফুটস্বরে পুনশ্চ কাঁদিয়া উঠিলেন—“ওরে মা আমার ! কেন তোকে আমি বিয়ে দিলুম ! কোথায় গেলি আমার মা ?”

যতীন্দ্রনাথ ফাঁপরে পড়িয়া নত-মস্তকে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া তার এক দিনের সম্পর্কে সম্পর্কিত শ্বশুর-শাশুড়ীর রাগ দুঃখ নীরবে সহ্য করিতে লাগিল। ব্যাপারটা যা দাঁড়াইয়াছে,—তাহাতে নিরপরাধেও তাহাকেই যেন অপরাধী হইতে হইয়াছিল।

এই সময় বাহিরে বাইসিকেলের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, ও টেলিগ্রাফ পিয়ন ডাকিয়া বলিল—"তার হ্যায়।"

ঘরের মধ্যেকার কয়জনেই চমকিয়া উঠিলেন ও যতীনই প্রথম সচেতন হইয়া উঠিয়া দ্রুতপদে বাহিরে গিয়া সই দিয়া টেলিগ্রামটা লইয়া আসিল। ইন্দ্রনাথবাবুর নামেই সেটা আসিয়াছিল। সে তাঁহার হাতেই উহা প্রদান করিল।

ইন্দ্রনাথবাবু কম্পিত হস্তে খাম ছিঁড়িয়া সেটা পাঠ করিলেন। উমাশশী চোখ মুছিতে মুছিতে অধীর কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন—"কোথাকার তার? কে কি লিখেছে? অমিয়ার কোন খবর এলো কি? কোথায় আছে সে? পড়ো না কি লিখলে?"

"তুমি একটু থামলে তবে তো পড়বো"—বলিয়া ক্রোধভরে ইন্দ্রনাথবাবু ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বিরক্তি-কঠিন স্বরে পড়িতে লাগিলেন—

"Have received information about J's character and past life. I am upset. Don't be anxious about me."

যতীন্দ্রনাথ সবেগে বলিয়া উঠিল—"আমার চরিত্র ও গত জীবন সম্বন্ধে সংবাদ পেয়ে! কেন? আমার চরিত্রের কি অপরাধটা হলো? কি আমি করলুম?"

উমাশশী কহিয়া উঠিলেন—"নিশ্চয়ই সে পাগল হয়ে গ্যাছে!"

ইন্দ্রনাথবাবু টেলিগ্রামখানা চার-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া, টুকরাগুলাকে পাকাইয়া ফেলিয়া দিয়া, ঘরটার এদিক হইতে ওদিক পর্য্যন্ত পাইচারী

করিয়া আসিলেন ও তার পর স্ত্রীর সামনে আসিয়া মুখ খিঁচাইয়া—"কেমন! মেয়েদের আর লেখাপড়া শেখাবে?—পাশ করাবে না?—" ভীষণ স্বরে এই কথাটা বলিয়াই আবার ঘরটার আর এক মুড়ায় চলিয়া গেলেন। এর চেয়ে বেশি কোন কথা বলিবার মত শক্তি তাঁর মধ্যে তখন ছিল না।

উমাশশী বলিলেন—"তারটা কোথা থেকে করেছে? নৈহাটী থেকে? তাহলে যতীন! এক্ষনি তুমি একবার বাবা! নৈহাটীতেই না হয় চলে যাও,—সেখানে গেলে নিশ্চয়ই একটা কোন সন্ধান টন্ধান পাওয়া যেতে পারবে,—আর তাহলে—"

ক্রোধে ক্ষোভে ও বিরক্তিতে অধীর-প্রায় হইয়া উঠিয়া জামাতা যতীন শাশুড়ীর এই সংযুক্তির বিরুদ্ধে নিতান্ত রূঢ়বাক্যেই প্রতিবাদ করিয়া উঠিল —"আমি যাব না, আমি আপনাদের মেয়ের সম্বন্ধে কোন কথাতেই আর থাকতে চাই নে,—তাকে বিয়ে করে আমার যথেষ্ট সুনাম বেরিয়েছে,—আমি চল্লুম!"

জামাইএর মুখ হইতে এই কথা শুনিবামাত্রে উমাশশীর সমস্ত দুঃখ চিন্তা ও ভয় অন্য আর একটা আকার প্রাপ্ত হইয়া প্রচুরতর আশঙ্কা ও লজ্জার সহিত মিশ্রিত হইয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তিনি তৎক্ষণাৎ কাতর মিনতির সহিত সাতঙ্কে কহিয়া উঠিলেন—"অমন কথা বলো না যতীন! সে তোমায় প্রথম দেখেই মনে মনে তোমায় পছন্দ করেছিল। তুমিও তাকে দেখে শুনেই বিয়ে করেছ। নিশ্চয়ই কোন মন্দ লোক এর ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে,—হয়ত তোমাদের বেরুবার আগের সেই চিঠিখানাতেই এই খবর সে পেয়েছে! নিশ্চয়ই তাই! সেই জন্যেই যাবার সময় সে যেন কেমন একরকম হয়ে গেছলো! তার চোখে এক ফোঁটা জল ছিল না। এখন আমি বুঝতে পারছি—সেই চিঠিই এই কাজ তাকে করিয়েছে।"

এই বলিয়া স্বামীর দিকে ফিরিলেন—"হ্যাঁ গা, তুমি তো জানো, মন্দ স্বভাবের উপর তার কি বিষম ঘৃণা! বিয়ের আগে সে আমাদের কতবার করেই এই কথা বলেছিল।"

ইন্দ্রনাথবাবুর মনের মধ্যে তখন ক্রোধ লজ্জায় বিমিশ্র যে বিচিত্র ভাব বর্ত্তমান, স্ত্রীর এই সাক্ষী মানাতে তাহাতে যেন স্ফুলিঙ্গ সংযুক্ত হইল! তিনি বারুদের স্তূপের মতই ফাটিয়া পড়ার ভাবে তাহার দিকে ফিরিলেন—"গোল্লায় যাও তুমি! আর গোল্লায় যাক্ তোমার সেই পিউরিটানীক মেয়ে! বেটী লেখাপড়া শিখে লায়েক হয়ে উঠেছেন! সত্যপীর ঠাকুরের বেটী!"

উমাশশী স্বামীর মূর্ত্তি দেখিয়া ও সম্ভাষণ শুনিয়া একেবারে আকাট্ হইয়া রহিলেন। মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও কি জন্যে যে "গোল্লায়" যাইতে বাধ্য হইলেন,—এই প্রশ্নটা তাঁর মনে জাগিলেও মুখের দিক দিয়াও আসিল না। চোখে শুধু খানিকটা জলই আসিল।

৯

অমিয়ার বিবাহের পরদিন,—রাত্রি তখন প্রায় দশটা বাজে,—অমিয়ার ছোট মাসি পূর্ণিমাদেবী তখনও তাঁর জপের মালা হাতে লইয়া পূজার ঘরের জানালাটীর কাছে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। জপ সমাধা হইয়া গিয়াছিল, উঠি উঠি করিয়া তখনও উঠিয়া পড়া ঘটিয়া উঠে নাই।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। বৃষ্টির সহিত একটু জোর বাতাসও থাকাতে পূর্ণিমার ছোট্ট বাগানটীর গাছপালাগুলি একটু এলোমেলো হইয়া পড়িয়াছে। মালতি-লতাটা ফটকের মাথা ছাড়িয়া তার আসে পাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। নেবুগাছের কতকগুলি

পাকা নেবু—ছিঁড়িয়া পড়িয়া মাটী-মাখা হইয়া রহিয়াছে। আর তুলসী-কুঞ্জটীরও কতকটা দুর্দ্দশা ঘটাইয়া দিয়াছিল। পূর্ণিমা জানালার ভিতর দিয়া সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছিলেন,—সকালবেলা পূজা পাঠ শেষ করিয়াই এইগুলিকে ঠিক করিয়া ফেলিতে হইবে।

এমন সময় একখানা ট্যাক্সিগাড়ি আসিয়া তাঁর ফটকের সাম্‌নে দাঁড়াইল।

এমন সময় কে আসিল, বুঝিতে না পারিয়া তিনি তখন তাড়াতাড়ি মালা তুলিয়া রাখিয়া বাহিরে আসিলেন! বাড়ীতে বেশি লোকজন তো নাই। বিধবা পূর্ণিমাদেবী স্বামীর স্মৃতিভরা গৃহটীর মায়া ছাড়িতে না পারিয়া তাঁহার মৃত্যুর পরও এইখানেই বাস করিতেছেন। কাছে থাকে তাঁর একটী ভাসুর-পো। ছেলেটী বি-এস্‌সি পড়ে। রাত্রি অধিক হওয়ায় সে এখন উপরের ঘরে নিদ্রা যাইতেছে। যে ঝি আছে, সেও ঘুমাইতেছে। শুধু পূর্ণিমাদেবীই একা সন্ধ্যা পূজা জপ পাঠ লইয়া জাগিয়া থাকেন,—আজও আছেন। নিদ্রাহীন শয্যাতলে পড়িয়া কেবল দুশ্চিন্তায় কাতর হওয়ার চেয়ে মনস্থির রাখিবার একান্ত উপায়রূপেই তিনি এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

দরজা খুলিয়া দিতেই ছুটিয়া আসিয়া একটী মেয়ে তাঁহাকে দুহাতে সবলে জড়াইয়া ধরিল। অমনি বিস্মিতা পূর্ণিমা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"এ কি! এ কি! অমিয়া তুই! তুই আজ এখানে কেন?" তাঁহার যেন শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল..."কি হয়েছে? কি হলো রে অমিয়া! তুই কেন এমন করে এখানে চলে এলি!"

অমিয়া মাসীকে ছাড়িয়া দিয়া সহজভাবেই জবাব দিল—"কিছুই হয়নি মাসিমা! সমস্ত পৃথিবীর আক্রমণ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখবার একটুখানি জায়গার দরকার হয়েছিল, তাই সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক-

ত্যাগী তোমার কথাই মনে পড়ে গেল,—আমায় থাকতে দেবে মাসিমা ?”

আকস্মিক এই অভাবনীয় সাক্ষাতের একান্ত দুশ্চিন্তা-জড়িত বিস্ময়ের আঘাত হইতে পূর্ণিমা দেবী তখনও নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া লইতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার বুকের মধ্যে একটা তীব্র আলোড়ন চলিতেছিল, তাহার প্রভাবে তাঁহার গলা কথা কহিতে গিয়া স্পষ্টই কাঁপিয়া উঠিল। তথাপি যথাসাধ্য সংযমের চেষ্টা করিয়া তিনি কহিলেন “থাকো না মা! কিন্তু তোমার যে কাল বিয়ের দিন ছিল অমিয়া! কি হলো? বিয়ে কি হয়েছে? ওই না—সিঁথিতে তোমার সিঁদূর লেপা! তবে, এ কি ?”

“তবে এস মাসিমা! সব কথা না শুনলে তুমি কিছুতেই স্থির হতে পারবে না। চল, একটা ঘরে চল। আমিও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারচি না, একটু শুয়ে পড়বো।”

স্তব্ধ নির্জ্জন ঘুমন্ত পুরীর মধ্য দিয়া উভয়ে একটা জনহীন কক্ষের মধ্যে আসিয়া বসিল। সে ঘরে একখানা তক্তাপোষের উপর একটা বিছানা পাতা ছিল। অমিয়া আসিয়া তার উপর হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। পূর্ণিমা দেবী উৎসুক ও উদ্বিগ্নচিত্তে তার মাথার কাছে বসিয়া পড়িয়া গভীর ভাবে একটা শ্বাস টানিয়া লইলেন,—এ মেয়ের ভাব-ভক্তি দেখিয়া তাঁর যেন প্রাণ উড়িয়া যাইতেছিল। তিনি মনে মনে বলিলেন—“হরি! আমোদ আহ্লাদে যোগ দিতে ভাল লাগে না বলে যে ওর বিয়েতে আমি যাই নি, এ কি তারই শোধ আমায় দিতে ওকে এমন অদ্ভুত ভাবে আমার কাছে এনে দিলে!...”

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া তিনি আর ধৈর্য্য রাখিতে না পারিয়া তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে ডাকিলেন—“অমিয়া!”

“এই যে মাসিমা! এই দেখ্—এই চিঠিখানা পড়ে দেখ,—দেখে তার

পর আমার বিচার করো। এই চিঠি আমি বাড়ী থেকে বেরুবার সময় পাই। পেয়ে সারাপথ ধরে কেবল ভেবেছি,—এই রাক্ষসের হাত থেকে কেমন করে মুক্ত হবো! মাকে কিছু বলিনি,—জানতুম, বলে কোনই ফল নেই। মা জানেন, মেয়েরা পুরুষের পদসেবার অধিকার মাত্র নিয়ে এ পৃথিবীতে জন্মাতে এসেছে। তাদের ছাগল তারা যদি ল্যাজের দিক দিয়েই কাটে, আপত্তি কর্‌বার তাতে কি আছে? কিন্তু না, আমি তা' সইতে পারবো না। কুচরিত্র মাতাল স্বামীর স্ত্রী হয়ে চিরকাল ধরে জ্বলে মর্‌বার সাধ আমার মোটেই নেই। তার চেয়ে আমি একবার মাত্র মর্‌তে রাজী আছি। মরবোই ভেবেছিলুম, হঠাৎ বাঁচতে সাধ গেল,...আর তোমার কথা মনে পড়লো।...তাই চলে এলুম..."

পূর্ণিমাদেবী চমকিয়া সভয়ে অমিয়ার মাথায় হাত দিয়া "হরি দীনবন্ধু!" উচ্চারণ পূর্ব্বক, সস্নেহে উত্তর করিলেন—"সে বেশ করেছিস মা!...কিন্তু এমন না করে তুই..."

অমিয়া তাঁহাকে মাঝখানেই বাধা দিল—"না মাসিমা! তা বলো না, এ ছাড়া আমার পথ ছিল না। সেই চরিত্রহীন লোকের সঙ্গে সুদূর রাজ্যে চলে গিয়ে আর আমার মরণ ভিন্ন মুক্তির কি উপায় ছিল?"

এ যুক্তি অকাট্য! পূর্ণিমা চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন—"কিন্তু মা! হিন্দুর ঘরের মেয়ে তুমি, স্বামীর পূর্ব্ব চরিত্রের খুঁৎ নিয়ে যদি জন্মের মতন স্বামীর সঙ্গে কাটা-ছেঁড়া করে ফেলো, তাহলে তোমার এ জন্মটাই যে নষ্ট হয়ে যাবে! লোকে এতে তোমাকেই নিন্দে করবে। ছেলে মানুষ এখন বুঝতে পারচো না,—মনের ঝোঁকে এত-বড় একটা অন্যায় কাজ করে ফেলে চিরজীবন ধরেই হয় ত অনুতাপ করে খুন হবে।"

এ কথা শুনিয়া অমিয়া উঠিয়া বসিল। তার সমস্ত অবসাদ যেন এক মুহূর্ত্তে চলিয়া গেল। সে সবেগে বলিয়া উঠিল—"আর যা বলো তা বলো

মাসিমা,—অন্যায় কাজ এটাকে তুমি বলো না! তুমি কি নিজে জানো না যে, আমি কিছু অন্যায় করি নি? আমাদের দেশের সতী-স্ত্রীরা আমারও খুব শ্রদ্ধার পাত্রী, কিন্তু তাঁরা নিজেরা খুব বড় হলেও তাঁদের স্বামীদের তাঁরা নেহাৎ যে ছোট করে রাখেন, সে পাপ তাঁদের নিশ্চয়ই বিধাতার দরবারে ক্ষমার্হ হয় না। তা যদি হতো, তাহলে পরলোকে লুকিয়ে-চুরিয়ে নয়, ইহলোকেই একটু প্রকাশ্যভাবে তাঁরা তাঁদের অতবড় মহত্ত্বের একটুখানি ফল লাভ করতে পারতেন। তা' না হয়ে চিরদিন ধরে দুর্ব্বৃত্ত স্বামীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দান করে লাথি জুতো ভিন্ন তাঁদের আর কি জুটেছে? কতকগুলি রোগগ্রস্ত নীতিজ্ঞানশূন্য সন্তান নিয়ে দুঃখকষ্টে অত্যাচারে অবিচারে জর্জ্জরিত হয়ে পলে পলেই মরার বাড়া হয়ে তাঁদের সহিষ্ণুতার পুরস্কার তাঁদের লাভ করে যেতে হয়। এই পাপের অত্যাচারের প্রশ্রয় দানই যদি সতীধর্ম্ম হতো, তাহলে এরকমটা ঘটতো কি? তার পর ঐ সমস্ত মন্দ লোকদের সন্তান হয়ে মন্দ লোকের সংখ্যা, রুগ্নর সংখ্যা বর্দ্ধিত করা, সেও কি একটা কম পাপ না কি? না মাসিমা। লোকে আমার নিন্দা করে করুক, ওরকম জীবন যাপন করতে হলে, আমার নিজের বিবেকই আমার এই সব লোকদের চাইতে ঢের বেশি বেশি নিন্দা করতো। নিজের ওপরে আমার ঘৃণার আর অন্ত থাকতো না। সেটা থেকে তো বেঁচে থাকবো।”

পূর্ণিমা বোনঝির যুক্তির সহিত পারিয়া না উঠিয়া শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—“কি জানি মা…”

অমিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—“কেমন করে জানবে মাসিমা! মন্দ লোকের হাতে তো তুমি পড়ো নি। তুমি জানবে কি করে, কি তার জ্বালা! মেসমশাই আমার খুবই ভাল ছিলেন, আজও তাঁর স্মৃতিতে তোমার বুক ভরা। তাঁর ছবি, তাঁর খড়ম তুমি নিত্য পূজা করো দেখে

গেছি। তুমিই বল দেখি, এ যদি তুমি না পারতে, তাহলে তোমার আজ কি হতো ?”

পূর্ণিমা পুনশ্চ যুক্তিহারা হইয়া গিয়া ছাড়াছাড়া ভাবে আরম্ভ করিলেন —“কিন্তু চিরদিন ধরে হিন্দু সতীর এই নির্ব্বিচার আত্মসমর্পণের জন্য তার গৌরবের অন্ত নেই। স্বামীকে দেবতা ভেবেই স্ত্রী তার পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়ে যে তৃপ্তি, যে আনন্দ লাভ করতো, এত যুক্তি-তর্ক-বিচারে কি সেটুকু আর পাবে ? দেখ—শাস্ত্রে আছে, কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীর অসদিচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য সতী স্ত্রী তাকে নিজে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল—”

অমিয়া তীব্র কঠিন কণ্ঠে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—“সেই দিনই সে তার সমস্ত জাতের সর্ব্বনাশ করেছিল মাসিমা! সেই দিনেই সে সব মেয়েদের মেরে রেখে গ্যাছে! অতবড় নির্ল্লজ্জ পাষণ্ড স্বামীর পাশবিকতাকে সমর্থন করে সে না হয় নিজের সমস্ত ইজ্জতকে নষ্ট হতে দিলে, দিক, কিন্তু সেই অভাগা স্বামীটারই বা এতে কি উপকার সে হতে দিলে বল ত ? মহানির্ব্বাণতন্ত্রের কতকগুলি শ্লোক আমি পড়েছিলুম। তাতে বলেছে—

ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাৎতুদ্ধরতেবিলাৎ।
তদ্বদ্ ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহ মোদতে।

সাপুড়ে যেমন সাপকে জোর করে গর্ত্ত থেকে টেনে বার করে আনে, তেমনি করে স্বামীকে উদ্ধার করে নিয়ে তার সহিত আনন্দে যাপন করে। এতে তো কই বল্লে না যে, স্বামীর সঙ্গে গর্ত্তের ভিতর সর্পধর্ম্মী হয়ে দুজনে বাস করে। না, মাসিমা! সতীধর্ম্ম একে বলে না যে, অসৎ স্বামীকে তার পাপে প্রশ্রয় দিয়েও তার সঙ্গে ঘর করা। এই করে কবেই এ দেশের মেয়েরা পুরুষদের এতখানি উচ্ছৃঙ্খল করে তুলেছে,—এ কি তুমিই ‘না’ বলতে পার ?”

বাস্তবিকই পূর্ণিমা দেবী ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন। অমিয়া যাহা

বলিতেছে, তাহাকে তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আবার সমর্থন করিতে গেলেও ভীষণ সামাজিক বিপ্লব। অসতী স্ত্রী লইয়া স্বামী ঘর করিতে নারাজ। বহু স্থলে নিতান্ত বাল্য-পাপের জন্য চিরজীবনের মতই অভাগিনী স্ত্রী স্বামীত্যক্তা হইয়া জীবন কাটাইতে বাধ্য হয়। তার সারা জীবনের প্রায়শ্চিত্তে সে পাপের সংশোধন ঘটে না। অপর পক্ষে নষ্ট-চরিত্র একান্ত অসৎ স্বামীর সকল অত্যাচার স্ত্রী যদি নির্ব্বিবাদে না সহিতে চাহে, তাহা হইলে সমাজও তাহার প্রতি খাঁড়া উচাইয়া খাড়া হয়। অন্যে ত ইহার প্রতিকার-চেষ্টা করেই না, সে নিজে করিতে গেলেও দোষী হয়। অমিয়া যাহা বলিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু নাই। তথাপি, লোক-নিন্দাকেও তো তুচ্ছ করা যায় না। ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি কহিলেন—"কিন্তু অমিয়া! সে যখন মন্দ ছিল, তখন সে ত তোমায় জানতো না। তুমি এখন চেষ্টা করে তাকে ভাল করে নিতেও তো পার! আমার মনে হয়, আমার স্বামীকে যদি আমি কোন রকমে ফিরিয়ে পেতুম, তিনি যদি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পাপীও হতেন, আমি ক্ষমা করতে পারতুম। স্বামী হারানই সবচেয়ে কষ্ট,—তার কাছে আর কোন কষ্ট, কষ্টই নয়।"

অমিয়া একটুখানি সকরুণ হাসি হাসিল—"মাসিমা! ওটা তুমি ভাবের মুখে বলচো, আর অভিজ্ঞতা নেই বলেই বলচো। আর ঐ যে বল্লে ভাল করে নিতে, তা' মন্দকে ভাল করা কি বড় সোজা কথা? কখন কি কেউ তা পারে? তার পর সম্পূর্ণরূপে তার হাতে গিয়ে পড়লে তখন কি আর ভাল করবার কোন পথ থাকে? তাছাড়া, পাপের আর ভূত ভবিষ্যৎ নেই,—যে পুরনো পাপী সে কি সম্পূর্ণরূপে তার অভ্যাসকে ছাড়তে পারে? সুযোগ পেলেই আবার কুপ্রবৃত্তি জোর করে, যদি না ভিতর থেকে নিজেই অনুতপ্ত হয়। আরও দেখ, পরে ভাল হলেও তার

চরিত্রের মন্দটা তার ছেলেদের মধ্যে যে দেখা দেবে না, তা তো বলা যায় না।”

এবার পূর্ণিমা দেবী সহজেই বলিলেন—“তা কি বলা যায়! কত মন্দ লোকের ভাল ছেলে, আবার কত ভাল লোকেরও মন্দ ছেলে হয় যে।—”

অমিয়া কহিল—“খবর নিলেই জানতে পাববে যে, ঐ ভাল লোকের শ্বশুরবাড়ীর দিকটা মোটেই ভাল নয়। মন্দ লোকের বেলাও তার পিতৃ-বংশ বা মাতৃবংশে বিশেষ ভাল লোকের সংস্পর্শ দেখতে পাবে। শুধু ভাল থেকে মন্দ বা শুধু মন্দ থেকে ভাল হয় না।”

হার মানিয়া পূর্ণিমা কহিলেন—“আচ্ছা যা হয়েছে তা তো হয়েই গেছে। এখন শুধু ঐ অজ্ঞাতনামা লেখকের চিঠির উপর নির্ভর করে তো এত বড় কাণ্ডটা বাধালে হবে না। আমি ভোরে উঠেই মৌলীকে দিয়ে একটা তার করে দেওয়াবো। জামাই নিজেই যদি একবার এখানে আসেন, সেই বোধ হয় সব চেয়ে ভাল হবে। তাকেও তো একটা জবাবদিহি করতে দিতে হবে আমাদের।”

অমিয়া মাসির কাছে সভয়ে সরিয়া আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল—“আমায় জোর করে নিয়ে যেতে দেবে না বলো? আমি এইটুকু আশা করে শুধু তোমার কাছে এসেছি। না হলে মার কাছেই যেতুম।”

পূর্ণিমা তাঁহার গায়ে জড়ানো ভীত ত্রস্ত পাখীটির মত ভয়ার্ত্ত বালিকাকে সস্নেহে বুকে টানিয়া লইয়া প্রতিজ্ঞা-গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন—“যদি তুমি নিজে যেতে না চাও, আমি নিয়ে যেতে দোব না, কথা দিলুম।”

১৩

টেলিগ্রাম ইন্দ্রনাথ বাবুকে পাঠানো হইল, এবং উমাশশীকে পত্র লেখা হইল। পরদিন পত্রোত্তর আসিল। উমাশশী পূর্ণিমার পত্রের উত্তর দিয়া সেই সঙ্গে অমিয়াকেও লিখিয়াছেন।—কল্যাণবরেষু

তোমায় যে কি বলিয়া পত্র লিখিব ভাবিয়া পাইতেছি না! এমন মেয়ে তোমাকে আমি গর্ভে ধরেছিলাম যে, লোক-সমাজে আমার মুখ দেখানই দায় হইয়া উঠিবে। এ কথা আর ক'দিন চাপা থাকিবে! তার পর লজ্জায় অপমানে তোমার বাপ পাগল হইয়া যাইবেন, আর আমি আত্মঘাতী হইব। তোমার বোনদের কোন ভদ্রলোকেই আর বিবাহ করিতে ভরসা করিবে না। কে এমন নির্ল্লজ্জ আছে যে, স্ত্রীর হাতে এমন করিয়া অপমানিত হইতে চাহিবে?

তুমি হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর স্ত্রী হইয়াছ; নির্ব্বোধ বা শিশু নও। হিন্দু বিবাহ যে ফিরাইয়া লওয়া যায় না, তাহা ভালই জানো। আর জানো, তোমার স্বামী ইচ্ছা করিলেই কালই আবার আর একজনকে বিবাহ করিতে পারেন। তবে জানিয়া শুনিয়া নিজে জন্মের মতন দুর্ভাগা হইবার ব্যবস্থা করিতেছ কেন? এখনও মাথা বুদ্ধি স্থির করিয়া ভালয় ভালয় ফিরিয়া এস। হয়ত এখনও যতীনকে বুঝাইয়া সমৃঝাইয়া তোমার অপরাধ ক্ষমা করাইতে পারিব। যত দেরি হইবে, তোমার ভবিষ্যৎ ততই বেশি সঙ্কটাপন্ন হইতে থাকিবে, ইহা নিশ্চিত জানিও। তখন তোমার মা বাপ ছাড়িয়া স্বর্গের দেবতারা নামিয়া আসিলেও আর তোমার অদৃষ্ট ফিরাইতে পারিবেন না। চিরদিনটা হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যেই জীবনটা কাটাইয়া দিতে হইবে। হয়ত তুমি বলিবে—লেখাপড়া শিখিয়াছ, চাকরী

করিয়া খাইবে। চাকরী ত ভারি,—বড় জোর চল্লিশ পঞ্চাশ টাকায় টিচারী করিবে, এই বৈ ত নয়? তাই বা কত চাকরী কে লইয়া বসিয়া আছে!

তার চেয়ে অমিয়া, এখনও কথা শোন,—নিজের নির্ব্বুদ্ধি দুর্ব্বুদ্ধির জন্য অনুতপ্ত হয়ে স্বামীর কাছে ক্ষমা চাও। সে লোক ভালই, এখনও হয়ত ক্ষমা করিতে পারে। তোমার বাপ বলেছেন,—যতীন তোমায় ক্ষমা না করিলে তিনিও করিবেন না, তোমার মুখ জীবনে আর কখন দেখিবেন না, এই বুঝিয়া কাজ করিও। —তোমার মা

চিঠি পড়িয়া অমিয়া বহুক্ষণ স্তব্ধ অনড় হইয়া বসিয়া রহিল। এ চিঠির প্রতি বর্ণে তার মায়ের নয়, বাপের প্রচণ্ড শাসন মাত্র প্রকটিত হইতেছে। যে প্রতারক মিথ্যা প্রবঞ্চনা দ্বারা তাহার নারীজন্মটাকে বৃথা করিয়া দিল,—সমস্ত সহানুভূতি সেই তাহারই উপরে! আর সেই প্রবঞ্চকের সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জন করিতেছে বলিয়া সে-ই হইল মহা অপরাধী! সমাজ আমাদের এই রকমই বটে! সে কারণ দেখে না, দেখে কার্য্য! কিন্তু তার ফল দেখে না! ভগবানের নৈষ্ফল্যের বাণী এই রকম করিয়াই হয়ত পালন করে।

পূর্ণিমা আসিয়া চিঠি পড়িলেন ও বলিলেন—"তাহলে কি করবে? দেখ্‌চো ত তোমার বাবা কি রকম রাগ করেছেন?"

শুষ্ককণ্ঠে অমিয়া উত্তর করিল—"বাবা যে রাগ করবেন, সে ত আমি জানতুমই। তবে আমার মাকে দিয়ে যে সেটা প্রকাশ করবেন, সেটা আমি ভাবিনি। কিন্তু এইটেই আমাদের দেশের পক্ষে স্বাভাবিক! মায়েরাও তো মেয়েদের এই শিক্ষা পরম্পর দিয়ে এসেছেন। যতই লাঞ্ছনা করুক, স্বামীর পাদোদক পান না করে জলগ্রহণ করবে না, কারণ, পতি পরম গুরু।"

পূর্ণিমা ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন—"ছি! অমিয়া! একজনের দোষে তুমি জাতিগত ভাবে এ-রকম কথা বলো না।"

অমিয়া কিছু লজ্জিত হইয়া উত্তর করিল—"তা তো আমি বলি নি মাসিমা! তবে আমি বলছি, আত্মসম্মান জিনিষটাকে কি এমন করে জড় মেরে দিতে হয়? যেমন পুরুষরা অসতী বর্জ্জন করে চলে, মেয়েদের বেলাও সে রকম বিধান থাকা কি অসঙ্গত? আমার মতে, সমাজের পক্ষে দুজনকার দায়িত্বই কম নয়।"

পূর্ণিমা কহিলেন—"পুরুষের চেয়ে মেয়েদের মন ক্ষমা ও স্নেহপ্রবণ; সেই জন্যই তারা সইতে পারে।"

অমিয়া দুঃখের ক্ষুব্ধ হাসি হাসিয়া কহিল, "বেশ ত, যাদের তেমন ভাল মন, তারা সহ্য করুক না; কিন্তু যাদের তা' নয়, তাদের প্রতি জোর করবার দরকার কি?"

মায়ের পত্রের উত্তরে সে তার সমস্ত যুক্তি প্রয়োগ করিল। শেষে লিখিল, "পাশের বাড়ীতে যে অভিনয় নিত্য নিত্য দেখিতেছ, তা' দেখিয়াও তোমাদের মাতাল কুচরিত্রের হাতে মেয়ে দিতে ভয় হয় না মা? তাই যদি না হয়, তবে মেয়ে মরিলেও হয় ত দুঃখ না হইতেও পারে! মনে করিও—তোমার অমিয়া মরিয়া গিয়াছে। জীবন্মৃত থাকিয়া হীনের সহিত হীন হওয়ার চেয়ে, সে দুঃখও হয়ত আমার সহ্য হইবে! আমি কত দিন হিতু-অনুজাকে তাদের অত্যাচারী বাপের মৃত্যুকামনা করিতে শুনিয়াছি। শান্ত সহিষ্ণু মল্লিকদের সেজ বউকে বলিতে শুনিয়াছি—'এমন স্বামী থাকার চেয়ে বিধবা হওয়া ভাল!' না, মা! আমার আর ঐ দেখা দৃশ্যের পুনরভিনয়ে প্রবৃত্তি নাই। এখন আমি একটা মানুষ—ত্রিশ চল্লিশ ছেড়ে কুড়িটা টাকা হলেও আমার চলে যাবে। না হয়, তাঁত বুনিতে শিখিব, সূতা কাটিব। আমার শতকোটী প্রণাম তোমরা জানিও।

আর যদি পার, তবে আমার এই মুখরতার জন্য আমায় ক্ষমা করিও।”

অমিয়া সেদিন যে চিঠি পাইয়াছিল তাহা এই—

মহাশয়া! নিতান্ত দুঃখের সহিত নিবেদন করিতে বাধ্য হইতেছি যে, অর্থলোভে আপনার মা বাপ যাহার হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিতেছেন, তিনি মনুষ্যনামের নিতান্তই অযোগ্য! আপনার মত বিদুষী পুণ্যবতী নারীর পবিত্র প্রেমের তিনি একেবারেই উপযুক্ত পাত্র নহেন। অধিক আর কি লিখিব, তিনি মদ্যপ ও অতিশয় কুচরিত্র। তাঁর চরিত্রহীনতার জন্যই এতদিন বিবাহ হয় নাই। পরিচিত কেহই অতবড় অপাত্রে কন্যাদানে সম্মত হইতে পারে কি? সেই জন্যই এত তাড়াতাড়ি করিয়া এখানে নিজে আসিয়া বিবাহ সম্বন্ধ করিয়া গেল, ইহাতেই ব্যাপারটা বুঝুন! রাওলপিণ্ডিতে এই লোকটীর যেরূপ সুনাম, তাহা ষ্টেশনে পদার্পণ করিলেই জানিতে পারিবেন। ইহাঁর একটী বাইজী পোষ্য আছে, তাহার সহিত বনাইয়া চলিতে পারিবেন ত? কর্ত্তব্যের খাতিরে অপ্রিয় সত্য প্রচার করিতে হইল—অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। হ্যাঁ তবে, ঐশ্বর্য্য ধন এই লোকটীর প্রচুর আছে। গহনার বাক্সটী পাইয়াছেন কি? অন্ততঃ দশ পনের হাজার টাকার গহনা। মোটর গাড়িও চার-পাঁচখানা আছে। স্বামী না পান, ধনসুখ পাইবেন ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অবশ্য যদি না বাইজী সুন্দরীর পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পিত হয়। তবে ইচ্ছা করিলে আপনি তাহাকে দিয়া বিষয়টা অন্ততঃ অর্দ্ধেকটাও নিজের নামে লিখাইয়া লইতে পারেন।

আপনার কোন হিতৈষী।

এই চিঠির নকল পূর্ণিমাদেবী তাঁর বোনকে দিতে চাহিলে অমিয়া বলিল, “এবারটাও থাক। তাঁরা যদি দেখতে চান, তখন পাঠাবো।

এটা একবারটী দেখা দরকার বলে তো তাঁরা মনেও করেন নি! কিন্তু মাসিমা! তোমার কি মত?”

পূর্ণিমা কহিলেন—“আমি আগে তোমার স্বামীর মুখে এর উত্তর শুনতে চাই, তার পরে মতামত দোব। তা’ছাড়া রাওলপিণ্ডিতে আমার একটী ভাগনে আছে। নিজে সে অতি সৎ। তাকেও আমি চিঠি লিখবো। তারা সেখানের অনেক দিনের বাসিন্দে। সে নিশ্চয়ই ঠিক খবর দেবে। আজই আমি তাকে লিখে দিচ্ছি।”

১১

আকাশে মেঘ করিয়া থাকিয়া দিনটাকে সাঁৎসেঁতে করিয়া রাখিয়াছিল। বৃষ্টি নাই, এতটুকু হাওয়াও নাই। যেন একটা বিরাট দুশ্চিন্তার ভারে স্তব্ধ থমথম করিতেছে—এমনি একখানা নিরানন্দ মুখ মেলিয়া সে চুপ করিয়া তাকাইয়া পড়িয়া আছে। না আছে তাহাতে একটু হাসি, না আছে কান্নার লেশ। শুধু জমাট ক্রন্দনের রুদ্ধ চাপ বুকে ভরিয়া লইয়া বুক ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে।

অমিয়ার মনের ভিতরটাকে বাহ্য প্রকৃতির এই নিরানন্দতা যেন আরও বেশি করিয়াই চাপিয়া ধরিয়াছিল। মন তার যেন নানারকম চিন্তায় বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সেই চিন্তা-জর্জ্জরিত চিত্ত তাহার যেন বিদ্রোহের তাপে তাতিয়া রহিয়াছিল। নিজের সমস্ত অবস্থাটা স্মরণে আসিলেই, লজ্জায় ঘৃণায় দুঃখে রাগে তাহার মাথার ভিতরে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছিল। যে সুখের কল্পনাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া সে তাহাকে লইয়া কত মতেই গঠিত করিয়াছিল, যাহাকে সে পূর্ণ বিশ্বস্ত চিত্তে দেবতার দান বলিয়া দেব-নির্ম্মাল্যের মত মাথায় তুলিয়া লইয়াছিল, সেই বিশ্বাসের মূল্য সে

কি, এমনি করিয়াই লাভ করিল? এই চরিত্রহীন লঘুচেতা, যে একটা ঘৃণ্যা নারী লইয়া জীবন যাপনে অভ্যস্ত, তাহারই সঙ্গে তাহাকে ইহজীবন তো বটেই, আবার বুঝি পরকালেরও সুখদুঃখের আশা কল্পনার সকল সম্বন্ধই স্থাপন করিতে হইবে! হীন-সঙ্গে অভ্যস্ত সেই ব্যক্তি—সে কি তাহার মর্য্যাদা রাখিতে পারিবে? নারীকে যে বিলাসের পুত্তলিরূপে পাইয়াছে, সে কি তাকে আর দেবতার অংশ-সম্ভূতারূপে সম্মানের চক্ষে দেখিবে?

বিশেষতঃ, মদ্যপ যে, তার মধ্যে নিজেরই মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়াছে, সে না কি অন্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ! আর এই লোকের মধ্য দিয়া তাহাকে তার জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া লইতে হইবে! উঃ! কি বিড়ম্বনার সে জীবন! না—না, অমিয়া তাহা পারিবে না, সে জীবন বহন করা তার পক্ষে একান্তই অসম্ভব! আর কেনই বা? নারীজীবন কি এতই তুচ্ছ যে, একজন হীনচরিত্র মদ্যপের খেয়ালের খেলানা না হইতে পারিলেই তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল! সে কুমারীর মত থাকিয়া দেশের কাজে দশের কাজে আত্মোৎসর্গ করিবে! বিবাহ তো কোন দিনই তার ঈপ্সিত ছিল না, হয়ত তাকে কোন মহৎ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিতেই—অদৃষ্টের এই অভিযান!

পূর্ণিমাদেবী তাঁর স্বাভাবিক ধীরপদে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—"অমিয়া, তোমার বাবা তার করেছেন যে, তোমার স্বামী একবার তোমার সঙ্গে শেষ দেখা করতে চান। তিনি হয়ত এক্ষনি এসে পৌঁছবেন, তুমি তৈরি হয়ে থেকো।"

এই কথা উচ্চারিত হইবামাত্র অমিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল—"মাসিমা! আমায় জোর করে নিয়ে যেতে আসচে না ত'? তাহলে কি হবে মাসিমা!"

পূর্ণিমাদেবী সুগভীর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক আশ্বাস দিবার ভাবে ধীর-কণ্ঠে কহিলেন—"তা কি পারে মা? কেন ভয় পাচ্চো? সে কি বলতে চায়, সেটাও তো শুনতে হবে!"

"কিন্তু যদি জোর করে ত তুমি কি করবে? ঐ বুঝি মাসিমা এলো!"

সদর দ্বারে সত্যই একখানা গাড়ী আসিয়া থামিল। একটু পরেই উৎকর্ণ মাসি-বোনঝির কাণে একটা জুতা পায়ের মস্‌মস্‌ শব্দ আসিয়া প্রবেশ করিল। অমনি অমিয়া ছুটিয়া আসিয়া পূর্ণিমাদেবীকে জড়াইয়া ধরিল—"কি হবে মাসিমা! ও মাসিমা! তোমার দুটি পায়ে পড়ি—আমায় এই রাক্ষসের সঙ্গে পাঠিও না।"

পূর্ণিমা দৃঢ় হস্তে তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া শান্ত অথচ স্থির স্বরেই উত্তর দিলেন—"আমি তো তোমায় আগেই কথা দিয়েছি।"

এদিকে সেই জুতা পায়ের শব্দটা ক্রমশঃই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে—জানা যাইতে লাগিল। সহসা পরিচিত কণ্ঠ হইতে একটা স্বর শুনিতে পাওয়া গেল—"কই! এঁরা কোথায়?"

অমনি অমিয়া নিজেরও অজ্ঞাতসারে সহসা খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল; আর তার বুকের মধ্যে ভয়ে সংশয়ে যেন ধপাধপ্‌ ধপাধপ্‌ করিয়া ঢেঁকির পাড় পড়িতে লাগিল। একটা বিষম মুহূর্ত্ত যে তার সাম্‌নে ক্রমেই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, তাহা সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছিল।

ঘরে আসিয়া ঢুকিল যতীন। তার মুখ স্তব্ধ গম্ভীর, বিরক্তির চিহ্নে সুস্পষ্টই চিহ্নিত।

পূর্ণিমাদেবী মাথার কাপড়টা একটুখানি টানিয়া দিয়া আগন্তুকের দিকে মুখ ফিরাইতেই, তাঁর মুখ দিয়া একটা আশ্চর্য্যসূচক ধ্বনি নির্গত হইয়া গেল—"এ কি! ভুলু তুই? তুই কবে এলি রে? আমি যে তোকে এই আজই চিঠি লিখলুম!"

যতীন পূর্ণিমার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া তাঁর পায়ের ধূলা লইয়া উত্তর করিল—"কেন মামিমা! আমার শ্বশুর তো তোমায় তার দিয়েছিলেন যে আমি আসচি! তুমি কি পাও নি?"

অতি মাত্র বিস্মিতা পূর্ণিমাদেবী কহিয়া উঠিলেন—"তোর শ্বশুর! তুই তো বিয়েই করিস্ নি, তা শ্বশুর তোর কোত্থেকে এলো শুনি! ওঃ—আচ্ছা! হ্যাঁ রে! তাই কি! তাহলে কি তুই-ই—"

যতীন একবার তাহাদের হইতে অদূরবর্ত্তিনী আনতমুখী অমিয়ার পাথরের মত কঠিন ও তেমনি ভাবলেশশূন্য মুখের দিকে সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তাহার হতবুদ্ধি-প্রায় মাতুলানীর মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল—"হ্যাঁ মামি মা! আমিই সেই অভাগা!"—বলিয়া সে একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। কিন্তু তার ঠোঁটের কোণে ঈষৎ একটু বিদ্রূপের হাসিকেও সে যেন সযত্নে গোপন করিয়া লইল বলিয়াই পূর্ণিমার মনে ঈষৎ সন্দেহ জন্মিল।

তখন যেন শ্বাসকৃচ্ছ্রতায় রুদ্ধ কণ্ঠকে সবলে দমন করিয়া লইয়া পূর্ণিমাদেবী বলিতে গেলেন—"তবে এসব কি ব্যাপার ভুলু! স্বর্গ থেকে দেবতা এসে সাক্ষ্য দিলেও যে আমি তা তোমার সম্বন্ধে—"

"মামিমা! যখন এসে পড়েছি, তখন ধীরে-সুস্থে সব কথাই হতে পারবে। তোমার হাতেই আমার বিচারের ভার আমি তো তুলেই দিয়েছি। কিন্তু আপাততঃ দয়া করে আমার লাগেজগুলোর কোন উপায় করিয়ে দিয়ে এস তো মা! ওরই সঙ্গে এঁর এবং আমার মায়ের সমস্ত গহনাগুলোও আছে। তুমি তো জানো—কত সাধ করে তিনি সেগুলি তাঁর পুত্রবধূর জন্য রেখে গেছেন।"

পূর্ণিমার মনটা দ্বিধার মধ্যে দোল খাইতে থাকিলেও, তাঁর মনের উপর হইতে সহসা যেন একটা জগদ্দল পাথর নামিয়া গিয়াছিল। এই ভুলু,

তাঁর ভাগিনা ভুলু, একে যে তিনি তাঁর স্বামীর প্রতিবিম্ব বলিয়াই জানেন। ইহাকে যে তাঁহারই পরে তিনি সৎ বলিয়া, মহৎ ভাবিয়া, শ্রদ্ধা করেন। সেই স্বার্থত্যাগী, ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত সুচরিত্র ছেলের বিরুদ্ধে এত বড় অভি-যোগ! নাঃ! নিশ্চয়ই এ তার কোন শত্রু-পক্ষীয়ের কাজ। কিন্তু অমন মানুষের এত বড় মহা শত্রু থাকিতে পারে! মেয়েটা যদি পলাইয়া না আসিয়া সেদিন ঘৃণায় দুঃখে মরিয়াই যাইত!

প্রকাশ্যে তিনি শুধু এইটুকু বলিলেন—"জানি বই কি! আমিই যে কতবার তাঁর ফরনাসি গহনা গড়িয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, আমি তাহলে সব তুলিয়ে রেখে আসছি"—বলিয়াই তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অমিয়ার সম্বন্ধে যে কোন ব্যবস্থা করিয়া যাইবার আছে, সে কথাটা তাঁর স্মরণেও আসিল না। মনের ভিতরটা তাঁর এখন শুদ্ধ একটা নিছক বিস্ময়ের বিহ্বলতায় কেমন যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। দুশ্চিন্তাটা এর ফাঁকে ফাঁকে কোথা দিয়া যেন সরিয়া পড়িয়াছিল।

১২

কিন্তু অমিয়া তার মাসিমাকে এই ভাবে তাহাকে উহার সহিত একা রাখিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া খুব নিশ্চিন্ত ছিল না। সেও মাসিমার সঙ্গে সঙ্গেই এঘর হইতে বাহির হইয়া পলাইবে ভাবিয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিতে পাইল, ঠিক দরজার সাম্‌নেই দ্বারের কবাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার স্বামী, তাহার দিকে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু চোখে চাহিয়া আছে। আর সেদিকে অগ্রসর হইবার সাহস তার মনের মধ্যে দেখা দিল না, বরং সে পিছন দিকেই যতটা পারিল সরিয়া গেল; এবং উহার তীক্ষ্ণদৃষ্টির উত্তরে সেও তেম্‌নি সহজ কঠিন নেত্রে উহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে গেল

বটে, কিন্তু বুকের ভিতরকার অস্থির আলোড়নে তার চোখের দৃষ্টি এম্‌নি এলোমেলো হইয়া পড়িল যে, সে অতবড় জলজ্যান্ত মানুষটাকেও বেশ স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইতেছিল না। যতীন্দ্রনাথ স্থির সহিষ্ণুভাবে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল। একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসিয়া সে এবার তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কথা কহিল। অনুত্তেজিত সহজ কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করিল—"আমার কি তাহলে একেবারেই কোন আশা নেই অমিয়া ?"

অমিয়া এই প্রশ্নে একান্ত ভয়ার্ত্ত হইয়া উঠিলেও, সঙ্গে সঙ্গেই তার এতক্ষণকার অবসন্নতাটা এক মুহূর্ত্তেই যেন আহত হইয়া সরিয়া গেল। সে গভীর বলে রুদ্ধপ্রায় শ্বাসক্রিয়াকে দমনে আনিয়া উর্দ্ধস্বরে কহিয়া উঠিল—"না—না, একেবারেই না,—আমায় আর ওসব কথা বলবেন না। আমি নিজের মনকে সম্পূর্ণরূপেই ঠিক করে ফেলেছি।"

অমিয়ার মতন নির্ভীক, জেদী, একগুঁয়ে মেয়ে তাহার সান্নিধ্য প্রাপ্তেই যে ভয়ে শুকাইয়া গুটাইয়া কোণঠাসা হইয়া গিয়াছিল, সে দৃশ্যটা হয়ত যতীনের পুরুষ-প্রকৃতিকে একটুখানি বেশ কৌতুক প্রদানও করিয়া থাকিবে ; কিন্তু সেই ভীত জড়িত মূর্ত্তির মধ্য হইতে যখন স্বর বাহির হইয়া আসিল, তাহা যেন বজ্র দিয়া গড়া দুইটা তীক্ষ্ণ তীরের ফলা! যতীন্দ্রনাথ একটু বিস্ময়ের সহিত সেই খাটের সঙ্গে মিশিয়া দাঁড়ানো ক্ষুদ্রকায়া নারীমূর্ত্তিটিকে স্থির দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিল। তারপর ঈষৎ নম্রকণ্ঠে কহিল—"অমন করে দাঁড়িয়ে থাকা কেন, এদিকে এসে বসো না। এ বিষয়ে আমাদের একটু কথাবার্ত্তা কওয়াও তো দরকার।"

এই প্রস্তাব শ্রুতমাত্রেই অমিয়া সভয়ে একটা অর্দ্ধব্যক্ত ধ্বনি করিয়া উঠিল—"মাসিমা।"—তার পর সে আরও দু পা পিছাইয়া গিয়া ঘরের দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া দাঁড়াইল। তার মধ্যের একজন ভীরু দুর্ব্বল নারীত্ব

—সে এই সবল দৃঢ়কায় এবং তাহার পরিণেতা পুরুষের সান্নিধ্যকে অত্যন্ত ভয়ের ও সন্দেহের সহিত দেখিয়া ক্রমাগতই পিছু হটিতেছিল; আর একজন—সে মানুষের মধ্যবর্ত্তী, তার প্রকৃত মনুষ্যত্ব, তার জমাটবাঁধা শক্তিরাশি—সে নিজের সর্ব্বশক্তিমত্তায় সর্ব্বক্ষমতায় অটুট সাহসে নির্ভীক বীরত্বে তার প্রবল আততায়ীর সম্মুখীন হইতে কিছুমাত্র ভীত হয় নাই! এই দুইজন দুই প্রকারের মানুষ তার মধ্যে একত্র কার্য্য করিতেছিল বলিয়া, বাহিরে তাহাকে যতই অসহায় মনে হইতেছিল, ভিতর হইতেও আবার ততই কঠিন উত্তরও বাহির হইতে লাগিল।

যতীন তার অবস্থা দেখিয়া মনে মনে হয়ত হাসিল, কিন্তু বাহিরে খুব সহজ দয়ার্দ্র কণ্ঠেই কহিল—"ভয় করো না, ভয়ের কিছুই নেই। আচ্ছা আমি তাহলে এই সিন্দুকটার উপরেই বসি। এখন আমার যা বলবার আছে বলি শোন। তুমি কার কাছ থেকে কি চিঠি পেয়ে আমায় এমন করে ত্যাগ করে যে পালিয়ে এলে, এর ফলে আমি যদি তোমায় কখন না নিই, যদি আবার বিয়ে করি, তখন তুমি আমায় আর দোষ দিতে পারবে না কিন্তু।"

এই ভয়ানক লোকটাকে নিজের অত্যন্ত নিকটে উপস্থিত দেখিয়া অমিয়া যতখানি ভয় পাইয়াছিল, ইহার মুখের এই একটা কথাতেই সেটা যেন এক মুহূর্ত্তেই অন্তর্হিত হইয়া গেল। এ' তবে তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতে আসে নাই, মাত্র নিজের সাফাই গাইতে আসিয়াছে! এই লোককেই সে ঈশ্বর-প্রেরিত বোধে কি আগ্রহেই—যাক্, কিন্তু এবার ঈশ্বরই তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন! ভাগ্যে সময় থাকিতে সেই চিঠিখানা সে পাইয়াছিল! নতুবা ইহার প্রকৃত পরিচয় পাইতেও বিলম্ব ঘটিত।

স্বামীর প্রশ্নোত্তরে সগর্ব্ব দৃষ্টি সে তাহার মুখের উপর সন্নিবিষ্ট করিয়া অকুণ্ঠস্বরে উত্তর করিল—"সেজন্য নিশ্চিন্ত থাকবেন—জন্মে কখন আমার

নামও আপনি আর শুন্‌তে পাবেন না। এখন অনুগ্রহ করে একটু পথ দিন, আমি যাই।”

এই বলিয়া সে দৃঢ়পদে একটুখানি অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল, তার মুখের শ্বেত-বিবর্ণতা ঘুচিয়া গিয়া, উত্তেজনায় তাহা আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মনের বলের সহিত শরীরেও এখন তার খানিকটা বল দেখা দিয়াছে।

যতীন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিল। পথ না ছাড়িয়া বরং পা দুইটা আরও একটুখানি সামনের দিকে মেলিয়া দিয়া আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সব্যঙ্গ হাস্যে সে কহিল—“তবে আমিও একটা কথা বলি অমিয়া! মন্দ হলেও আমি এত বেশি খারাপ নই যে, তোমার গায়ে কোন দিন হাত-টাত তুলবো! তাছাড়া টাকা-কড়ি যদি উড়িয়ে দিই বলে ভয় করো, তা হলে আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি আমি তোমার নামে না হয় লিখে দিতেও রাজী আছি। তুমি যদি আমায় ত্যাগ করো, তাতে দুদিক থেকেই একটা লোক-লজ্জা আছে ত। তার চেয়ে যদি আমার সঙ্গে চলো, অসুবিধা তোমার কিছু হবে না। সুখে স্বচ্ছন্দেই থাক্‌বে।”

যতীন্দ্রনাথ এইটুকু বলিতেই আবার সে সভয়ে পিছু হটিয়া গিয়া ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—“ওসব কথা কেন তুল্‌চেন! আমি কোন কিছুতেই যাবো না। লোকলজ্জার চাইতে নিজের লজ্জা আমার কাছে ঢের বেশি বড়। চরিত্রহীনের ঘর আমি করবো না।”

যতীন কহিল—“তাহ’লে তোমার মত আর বদলাবে না? কিছুতেই না?”

অমিয়া দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িল।

“আমি তাহলে ফিরে যেতে পারি? এখনও ভেবে দেখ! তুমি না যাও তো এই মাসেই আমি বিয়ে করবো কিন্তু। তোমার আশাপথ চেয়ে যে জীবন কাটাবো, সে আমার দ্বারায় হবে না, তা’বলে দিচ্চি।”

এই কষ্টকর আলোচনা চালাইতে অমিয়ার যেন বুকে খিল ধরিয়া যাইতেছিল। সে এবার অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল—"যে মুহূর্ত্তে সেই চিঠি আমি পড়েছি, সেই মুহূর্ত্তেই আমার সব-কিছু ভাবা শেষ হয়ে গ্যাছে। আজ আবার নূতন করে আমি কি ভেবে দেখতে যাব? ভাবনার আমার কিছু নেই। আমি ও-রকম লোকের—না—আমি যাবো না। আপনি এক্ষনি চলে যান।"

যতীন্দ্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। অমিয়ার ক্রোধের ক্ষোভের অপমানের উত্তেজনায় ঘন ঘন শ্বাসভরে কম্পিত দেহ, আরক্ত মুখ ও আহতা ফণিনীর ন্যায় ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সব শুদ্ধ জড়াইয়া তার মধ্যের একটা নূতনতর তীব্র আকর্ষণীয় সৌন্দর্য্য সে এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া লক্ষ্য করিল। তার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া শান্ত উদাসস্বরে ধীরে ধীরে কহিল—"আচ্ছা, আমি তাহলে চল্লুম,—" বলিয়া পিছন ফিরিয়া দু পা অগ্রগর হইয়া পুনশ্চ সে ফিরিয়া দাঁড়াইল,—"ভাল কথা! যে চিঠিখানা তুমি পেয়েছিলে, সেখানা কি ঠিক এই রকম? এইখানার সঙ্গে সেইখানা একবার একটু কষ্ট করে মিলিয়ে দেখবে কি?"—এই বলিয়া এবার সে অসঙ্কোচে চলিয়া আসিয়া অমিয়ার ঠিক সাম্‌নে দাঁড়াইয়া ভাঁজ খুলিয়া একখানি চিঠি তার চোখের সামনে তুলিয়া ধরিল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক নিমেষমাত্র তাহাতে দৃষ্টিপাত করিয়াই অমিয়া সরোষ বিস্ময়ে উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"এ কি! আমার চিঠি কেমন করে চুরি—পেলেন আপনি! দিন আমার চিঠি দিন!"

যতীন্দ্র চিঠিখানা তৎক্ষণাৎ তাহার হাতে দিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল,—"এখানি সত্যি বলচি,—আমি চুরি করি নি। তোমার খানা তুমি কোথায় রেখেছ খুঁজে দেখে দুটোয় মিলিয়ে নাও। তা হলেই তো সব সন্দেহ যাবে।"

অমিয়া চিঠিখানার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া গিয়াই পুনশ্চ ঘোর অবিশ্বাসের সহিত কহিয়া উঠিল—"এ সেই চিঠিই। সেই 'ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতি' মটো-লেখা একই কাগজ—সেই পুণ্যবতী লিখিয়া "ী" টা কাটিয়া দিয়া "ি" করা পর্য্যন্ত সমস্তই এক। নিঃসংশয় রূপেই এক হাতের লেখা এবং সেই চিঠিই—"

অমিয়া ঘোর অবিশ্বাসের সহিত মুখ তুলিল—"এ চিঠি আপনার হাতে কেমন করে যে গেল আমি কিছুই বুঝতে পারচি না!"

যতীন মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—"আমিও না। কিন্তু সেখানা তুমি কোথায় রেখেছিলে?"

"ওঃ এই ঘরেই তো—" বলিয়া সে খাটের গদীর দিকে চাহিল।

যতীন তাহার অর্থ বুঝিয়া একটু জায়গা ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"বেশ'ত, দেখনা সেটা ওখানে আছে কি না—!"

"নেই, দেখতেই পাচ্চি—"বলিয়া সরোষে অমিয়া গদীর খানিকটা উল্টাইতেই খামশুদ্ধ চিঠিখানা যেমন ছিল বাহির হইয়া পড়িল। সেই একই রকম খাম, এক হাতেরই ঠিকানা লেখা। শুধু ডাকের ছাপটী নাই।

"এ কি! তবে এ আবার কি করে এলো!" বলিয়া দুখানা চিঠিই পাশাপাশি খুলিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। সেই সময় মুখ তুলিলেই সে দেখিতে পাইত যে, তার পরিত্যক্ত স্বামীর চোখে-মুখে কি বিপুল কৌতুক-হাস্যের উচ্ছ্বাসই ফাটিয়া পড়িবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল!

"হ্যাঁরে হনুমান ছেলে! এ তোর কি কাণ্ড বল্ দেখি? তাই প্রথম থেকেই আমার যেন হাতের লেখাটা খুব চেনা-চেনা বোধ হয়েছিল! তোকে দেখেই হঠাৎ আমার মনে হলো—ও চিঠি যে তোর হাতেরই লেখা! এই তো—ঠিক তাই! এই দেখ তোর চিঠি আমার কাছে ছিল,—কই সে চিঠি অমিয়া! বার কর তো মা! ওমা! এই যে! দেখ তো!

দেখ অমিয়া! হতভাগা ছেলের কীর্ত্তিটা এখন দেখ! ওঃ! কি রে তোরা—ডাকাত না খুনে রে।”

পূর্ণিমাদেবী তাঁর স্বভাব-বিগর্হিত উত্তেজনা-চঞ্চল হইয়া প্রায় ছুটিয়া আসিয়া এই সব কথা বলিতে বলিতে তিনচারখানা পুরাতন পত্র খুলিয়া খুলিয়া তার লেখার সহিত ঐ অজ্ঞাতনামার লিখিত পত্র ও তাহার নকলের সহিত মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন। আর ক্রমাগত অসম্বরণীয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া ক্ষুদ্র বালিকাটির মতন হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—“এই দেখ অমিয়া! এই দেখ মা—কোন একটা অক্ষরে এতটুকু অমিল আছে? এই দেখ এর ‘ম’ এই দেখ ওর ‘ম’—তালব্য ‘শ’—বর্গীয় ‘জ’—সব দেখ এক রকম।” ওর হাতের লেখা ঠিক যে ওর মেজ মামার মতন! তিনিই যে ওকে প্রথম লিখতে পড়তে শেখান, ওর স্বভাবে তিনি যে ওকে বড় ভালবাসতেন। কিন্তু এমন অন্যায় খেলা কেন খেলতে গেলি বাবা! মেয়েটা যদি আত্মঘাতী হতো, কি সেদিন পথে একটা বিপদে পড়ে যেত? কি হত বল দেখি তখন!”

যতীন্দ্রনাথ মামিমার এই নির্ভুল আবিষ্কারে ও ভৎসনায় যুগপৎ প্রফুল্ল ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়া অপরাধীভাবে মৃদুকণ্ঠে উত্তর করিল—“এতটা যে ও করবে, তা' আমি ভাবতেই পারিনি মামিমা! বিয়ের আগের দিনই নগেন ঘোষেদের বাড়ীতে শুনলুম,—আমার যিনি শ্বশুর হবেন, তিনি তাঁদের কাছে আমার চরিত্র সম্বন্ধে ভাল করে খোঁজ নিয়ে গেছেন। বলেছেন—তাঁর মেয়ের প্রতিজ্ঞা—স্বামীর চরিত্রে কোন দাগ থাকলে তার ঘর সে কিছুতেই করবে না। সেই শুনে একটুখানি পরীক্ষা করে দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল। তাই—তা' মামি মা! শিক্ষাটা আমারও বড় মন্দ হলো না! সেদিন ষ্টেশনে গাড়ি শূন্য দেখে বাস্তবিকই খুবই ঘাব্‌ড়ে গেছলুম! তখন মনে মনে কি আপশোষই যে করেছি। তা'পর ওঁর মা বাবার সাম্‌নে

গিয়ে,—সে যেন আমার মরার বাড়া হলো। মনে মনে ত জানচি যে আমিই এর জন্য দায়ী! তা'পর টেলিগ্রামটা দেখে অনেকখানি সুস্থ হলেম,—বুঝতে পারলেম যে, তাহলে নেহাৎ মরে নি এবং একেবারে ভেঙ্গে পড়ে যাবার মতন মেয়েও এ নয়!"

এই বলিয়া সে তখন কৌতুক-হাস্যে-ভরা গভীর দৃষ্টিতে অদূরবর্ত্তিনী প্রস্তরীভূতা অমিয়ার দিকে চাহিল।

পূর্ণিমা দেবী কাছে আসিয়া সস্নেহে তাহার গায়ে মাথায় হাতটী বুলাইয়া তাহার শিথিল দেহ নিজের স্নেহনিবিড় বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইলেন—"মা আমার! কত দুঃখই পেয়েছিলি! ভগবান যে হঠাৎ এমন করে এটাকে এমন অদ্ভুতভাবে শেষ করে দেবেন এ যে আমাদের আশার অতীত! যতীন! অমিয়া তোমার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল বলে তুমি কিন্তু ওকে একটী কথাও বলতে পাবে না, দোষ তোমারই বেশি। বিয়ের কনেকে অমন করে ভয় দেখালে, সে ভয় না পেয়ে কি করবে বাছা?"

যতীন্দ্রনাথ এইবার উচ্চৈঃস্বরে প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া উঠিয়া সেই হাসির মধ্যেই বলিতে লাগিল—"ভয়ই পাক, আর যাই করুক মামিমা! আপনার বোনঝিটী কিন্তু এবার সব পরীক্ষার চাইতেই শ্রেষ্ঠ খুব মস্ত বড় পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হয়ে পাশটা করে নিলে। নাঃ! তোমার পরে ভক্তি তো চির দিনই অপর্য্যাপ্ত আছে,—আজ আবার আর এক দিক দিয়ে ইনিও আমার নারীজাতির উপরে সেই শ্রদ্ধাকে দ্বিগুণিত করে দিলেন। এই তো চাই মামিমা! ওই চিঠি পেয়ে ও যদি নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে আমার সঙ্গে আমার ঘরে ঘর করতে চলে যেত, আমি আমার স্ত্রীকে আর যাই করি জন্মে কখন আর শ্রদ্ধা করতে পারতাম না,—এটা খুব সত্যি।"

পূর্ণিমা দেবীর দু'চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতেছিল। তিনি বিবশা

অমিয়াকে টানিয়া আনিয়া খাটের উপর বসাইয়া দিয়া তাহার মাথায় কপালে হাত বুলাইয়া সস্নেহে বলিলেন—"মা! এইবার তুমি তোমার স্বামীকে প্রণাম করে, তার পায়ের ধূলো নাও। অনেক মন্দ কথাই তার সম্বন্ধে ভেবেছ হয়ত। ভুলু! আমার কাছে আয়। তোদের দুটিকে দুপাশে নিয়ে একবার বসি। আহা! কি সুন্দর মানিয়েছে দেখ দেখি! আজ যদি তোর মা বাবা আর তোর মেজ মামা বেঁচে থাক্‌তেন!"

মৃন্ময়ী

"সই ! বলি ও সই ! এখনও ঘরের মধ্যে ব'সে ব'সে হচ্চে কি'রে ?"

এই বলিয়া চকচকে চওড়া কাল্লা-পেড়ে শান্তিপুরে শাদা ডুরে শাড়ী পরা, খয়ের-রঙের সিল্কের ব্লাউস আঁটা চিত্রিত হাল্কা হাতপাখায় খাওয়া খাইতে খাইতে একটি নবীনা সহাস্যমুখে মুক্তদ্বার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল।

কলিকাতা তালতলা ষ্ট্রীটে একখানি মধ্যমাকারের হলুদরঙের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাটীর দ্বিতলের সুসজ্জিত শয়নকক্ষের মধ্যে বড় আয়নার কাছে গৃহস্বামীর সুন্দরী পত্নী মৃন্ময়ী নিজের অপূর্ব্ব নব-যৌবনশ্রী বিস্তার পূর্ব্বক, চিক্কণ কেশরাশি বিনাইয়া, সেই মাত্র সদ্যোরচিত লম্বিতবেণী বাম হস্তে ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে বেলফুলওয়ালার নিকট হইতে ক্রীত একগাছি অফুটন্ত কলিকার মালা সেই বিনানীতে জড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার পার্শ্বে একটা টিপাইএর উপর টিনের ফুলকাটা ছোট ট্রের মধ্যে যশোরের চিরুণী, জবাকুসুম তৈল, সিন্দুর-পূর্ণ কাশীর 'সুখে থেকো সতী পতিপাশে'···ইত্যাদি চিত্রিত কৌটা, খোঁপায় পরিবার সোনার ফুল, লোহার কাঁটা প্রভৃতি কেশবন্ধনোপযোগী দ্রব্য সকল সুসজ্জিত ছিল। পদতলে অঞ্চল লুটাইয়া পড়িয়াছে, ও একখানা সদ্য-ধৌত শুভ্র তোয়ালে ভূতলে পড়িয়া আছে।

মৃন্ময়ী এক একবার অর্দ্ধোন্মুক্ত জানালার উপর হইতে সূর্য্যরশ্মির ক্রমাবতরণ দর্শন করিতেছিল, কখনও প্রীতিপূর্ণ চকিত-নেত্রে আপনার সর্ব্বাবয়বের প্রতিবিম্বটা আয়নার মধ্যে দর্শন করিয়া প্রসন্নচিত্ত হইতেছিল, আবার

কেশ-রচনায় মনোযোগ দিতেছিল। এমন করিয়া যখন সেই বহু আয়াসের চুল বাঁধা শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমনই সময় সে হঠাৎ পরিচিত প্রিয়কণ্ঠের সম্বোধনে বিস্ময়চকিত হইয়া মুখ ফিরাইল। পূর্ব্বেই কণ্ঠস্বরে আগন্তুকাকে সে চিনিয়াছিল, তথাপি অতর্কিত দর্শনের বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সস্মিত-মুখে মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, "ও মা, কি ভাগ্যি গো! মনের কথা যে! এমন সময় কি মনে ক'রে ভাই?"

মনের কথা সুরবালা সে কথার জবাব না দিয়াই হাসি-মুখে আসিয়া ধবধপে চাদর-পাতা পরিচ্ছন্ন বিছানাটির উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "হ্যাঁলা, এত বেলা গেল কেন? এতক্ষণে চুল বাঁধা হচ্ছে যে?"

মৃন্ময়ী তাড়াতাড়ি করিয়া তখন কবরী ফিরাইতেছিল, সখীর প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া একটু থতমত খাইল, ঈষৎ অপ্রতিভ হাস্যের সহিত বলিল,"এই ভাই, কাজে কর্ম্মে বেলাটা যেন কোথা দিয়ে চ'লে গেল। নিজেকে সবই তো দেখতে হয়! জানোই তো, ঝি-চাকরের কাজ—যেটি না দেখ্‌ব, সেটি তো আর হবে না।"

কথাটা গৃহিণীজনোচিত বিজ্ঞতার সহিত বলা হইলেও সখীর মনে তাহা আমল পাইল না; বরং ওষ্ঠপ্রান্তে অবিশ্বাসের মৃদু হাস্য বিকীর্ণ করিয়া কর্ণ-ভূষার হীরার জ্যোতি সূর্য্যকিরণ সঙ্গে মিলাইয়া দিয়া মাথা নাড়িয়া সে বলিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ওঁনার দুটি প্রাণীর বড় তো মস্ত সংসার, তারই এত কাজের নাড়া! সোজা কথায় বল না কেন যে, কর্ত্তাটি ছেড়ে দেননি; তাই হয়নি।"

এই কথায় মৃন্ময়ী ভীষণ লজ্জা পাইল। তাহার মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠিল। সস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সখীর দিকে চাহিয়াই সে হাসিয়া ফেলিয়া মুখ নত করিল; বলিল, "দূর, তাই বুঝি!"

চুল বাঁধা হইয়াছিল, খোঁপার ফুলকাঁটাগুলা গুঁজিয়া তোয়ালে দ্বারা মুখ

মুছিতে মুছিতে কাছে আসিল। মৃন্ময়ীর মনের কথা তাহার দিকে চাহিয়া গুন্‌গুন্‌ করিয়া একটা গান ধরিল—

"বেঁধেছ যে মোহন বেণী—নয়নকোণের যে চাহনি।"

মৃন্ময়ী হাসিয়া বলিল, "যাঃ!—সত্যি ভাই মনের কথা! তোকে আজ আমার সারাদিন কেবলই মনে পড়েছিল ভাই! তোকে দেখে আমি এমন খুসী হইচি, যে তা আর কি বল্‌বো!"

"তবে আমি অনেক দিন বাঁচ্‌বো! তা আমি যে জন্যে এসেছি, সে কথাটা শুন্‌লে তুই কিন্তু ভাই আরও খুসি হবি আর 'দীর্ঘজীবী হও' ব'লে অনেক আশীর্ব্বাদও কর্‌বি, সে আমি খুব বল্‌তে পারি।" বলিয়া সুরবালা, মৃন্ময়ীর মুখপানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

মৃন্ময়ী তোয়ালেটা খাটের বাজুর উপর রাখিয়া সখীর পাশে বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাই! কি জন্যে এসেছিস্‌, বল্‌ না ভাই?"

সুর বড় দুষ্ট মেয়ে, সহজে কি সে রহস্য ফাঁস করিতেই চায়! কাণের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি বলিল, তোর সখাটিকে তোর হাতে হাতে সঁপে দিতে এসেছি। কেমন, এটা খুব সুখবর কি না?"

মৃন্ময়ী মেয়েটি বড় সাদাসিদা। সখীর সঙ্গে তাহার প্রকৃতির বৈষম্য বড়ই সুস্পষ্ট। তথাপি সেও এখন একটু রহস্য করিয়া লইল; বলিয়া বসিল, "বদলাবি নাকি?"

সুর বলিল, "আপত্তি নেই।—তবে অম্‌নিও দিতে পারি। যে তোর কাঠ-খোট্টা বর, ও'তে ভাই কারই বা লোভ হয়?"

"মরণ আর কি, সবতাতেই ঠাট্টা করা তোর একটা রোগ।"

সুরবালা হসিয়া বলিল, "মর্‌বো কেন লা এই বয়সে? বালাই! সত্যি ভাই, এই তোর গা ছুঁয়ে বল্‌ছি, বিশ্বাস কর্‌বিনে তো আর কি কর্‌বো? সেদিন আমাদের বাড়ী তোর রূপ দেখে আমার কর্ত্তাটীর মাথা ঘুরে গেছে।

পাঁচবার ক'রে বলা হলো, তোমার মনের কথার শ্রীটুকু দিব্যি! হাজারে একটা অমন দেখা যায় না। তাই মনে করেছি যে, আমার অমন রূপবতী সখীটি বারমাস বেরসিকের হাতে প'ড়ে কেবল তাঁর কাছে হিষ্ট্রী ফিলোজফির বক্তৃতা শুনে শুনেই হাড় পাকাবে, তবু দুদিন এই রসিক লোকটীর—"

মৃন্ময়ী লজ্জায় অপ্রভিতে বিবর্ণমুখী হইয়া সখীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া রাগ করিয়া বলিল, "যাঃ, তোর মুখ বড় আল্‌গা।"

কিন্তু বেশিক্ষণ সে তুচ্ছ অভিমান রহিল না। সুরবালা হাসিতে হাসিতে বলিল, "না লো না, আমি এমন বোকা মেয়ে নই, যে, 'আপনার ধন পরকে দিয়ে দৈবজ্ঞের মতন মাথায় হাত দিয়ে' বেড়াব। এক জায়গায় যাবি?"

"কোথা ভাই?"

মৃন্ময়ী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলে, সুরবালা উত্তর দিল, "আজ মিনার্ভা থিয়েটারে অনেক দিন পরে আবার খুব ধুমধাম ক'রে 'মাধবী-কঙ্কণ' অভিনয় হবে, দেখতে যাবি? আমি তো তার জন্যে তৈরি হয়ে বেরিয়েছি।"

শুনিয়া মৃন্ময়ীর মুখ উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সাগ্রহে বলিল, "যাব ভাই, দিদির মুখে শুনে অবধি আমার এইটি দেখতে বড় ইচ্ছা ছিল। তা শুনেছি, এখন নাকি ওর অভিনয় হয়ই না?"

"ঐ তো বল্লুম, অনেক দিন পরে এই হচ্চে। আবার শুন্‌লুম, একজন কে নূতন অভিনেত্রী এসেচে, সে 'জেলেখা' সাজবে। যেমন তার গলা, তেমনই নাকি অভিনয় কর্‌বার ক্ষমতা! দেখ্‌তেও শুনেছি যথেষ্ট ভাল। এমন ও-সমাজে নাকি কমই আছে। অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে। আটটার সময় আরম্ভ, তা তুই যাস্ ত শীগ্‌গির ক'রে নে, বেশী আর দেরি নেই।"

শুনিতে শুনিতে অভিনয় দর্শনাশায় মৃন্ময়ীর উৎসাহ দশগুণ বাড়িয়া গেল।

সে সখীকে বসিতে বলিয়া নীচে যাইবার জন্য দ্বারের কাছে আসিয়াছে, এমন সময় "কই গো বৌ ঠাকরুণ! এখনও ঘরের মধ্যে কেন গো?" বলিতে বলিতে বিন্দি দাসী এক গোছা পান ও কয়েকটা সুপারী, এলাচের মোড়া হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই গৃহিণীকে দেখিয়া বলিল, "ওগো, বাজার সব দেখে নাও সে! যে মাগ্‌গির জিনিষ গো, কিন্‌তে আর মন সরেনি। এর চাইতে কাঁচা পয়সাগুলো কচমচিয়ে চিবিয়ে খাওয়াও ঢের সস্তা পড়ে। গোণা তিনটে করে পান পয়সায়! অবাক্ করেছে মা! বেঁচে থাকুক আমাদের ধনেখালি! একটা পয়সা ফেলে দিলুম যে 'বারুই মাসী, জল খেও' অমনি সাড়ে সাত গণ্ডা পান এলো ঘরে। কে কত খাবে খাও। তা বলো বৌ ঠাকরুণ! আমাদের গরীব-গুর্‌বোর ঘরের মেয়ে কতই পান খাব গা? বলো না ভাই! সে ভালই বা দেখাবে কেন? খাটুবো, কি মুখ রাঙ্গিয়ে পান খেয়ে খাটে ব'সে থাক্‌বো? সেই যে বলে— 'পেটে ভাত নেই মাথায় সিঁতে।' সেই যো হবে যে! সহরে যেমন বাবুদের গিন্নীরে সব পান ব'লে অজ্ঞান, তেমনই পোড়া সহরেও আগুন লেগেছে! মুখে আগুন কলকেতা সহরের!"

এতক্ষণ দুই সখীতে বিন্দির বক্তৃতা শুনিতেছিল, এইবার মৃন্ময়ী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "নে, তোর বাক্যি থামা দেখি। বাজার-টাজার এখন দেখ্‌তে পার্‌বো না, ও সব অমনি যেমন আছে, তেম্‌নই চাবি খুলে ভাঁড়ারে ফেলে রাখগে যা।"

কিন্তু বিন্দির তখনও বাক্যকথনস্পৃহা চরিতার্থ হয় নাই। সে মৃন্ময়ীর হাত হইতে চাবিটা লইয়া আবার আরম্ভ করিল, "বাক্যি আবার কি গো? —হ্যাঁগা, বৌ ঠাক্‌রুণ! এ ত সব ঠিক কথাই গা। আমাদের ঐ যে তুমি দিন দুটো ক'রে পান দাও তা ওইতেই ঢের। যখন মিন্‌সে ছেলো, তখন বরঞ্চ রেতের বেলায় এক আধটা পান খেতে দিত, এখন সে রামও নেই, সে

অযুধ্যেও নেই ! আমাদের পাড়াগাঁয় তো আর এ সব চাল ছিল না, সহুরে বৌ ঝিরা যেমন সকাল নেই, সাঁজ নেই, মুখ রাঙ্গিয়ে মাথার কাপড় খুলে, স্বোয়ামীর কাছে ব'সে থাকে, আমাদের দেশ হ'লে চারিদিকে ছি ছিক্কার প'ড়ে যেতো না ? বল্‌বো কি বোন্‌ ! একদিন দুপুরবেলা আমাদের মিন্‌ষে গোটা কতক কাঁচা-মিটে আঁব এনে আমার কাপড়ে ফেলে দিয়েছেলো, তাও আবার বলি, শোনো কথা,—একদিন আমায় জিজ্ঞেস কর্‌লে, বাপের বাড়ী যাবার জন্যে ক্ষেপেচ কেন ? তা আমি আবাগী মর্‌তে নাজ-নজ্জার মাথা খেয়ে বল্‌তে গিছ্‌লুম্‌ যে, আমাদের কাঁচা-মিঠে গাছ এবার নাকি বড্ড ফলেচে। ও মা ঘেন্নার কথা শোন ! বল্‌বো কি বৌঠাণ ! মিন্‌ষে কর্‌লে কি, তার পরদিনই না কোত্থেকে গোটাকতক কাঁচা-মিটে আঁব এনে আমার কোঁচড়ে ধুপধাপ ক'রে ফেলে দিয়ে দুটো হাত ধ'রে মিনতি করে বল্লে কি, 'খন্নেনের বউ ! আমার মাথাটা খাস্‌, এগুলি তোকে সব খেতে হবে।' তা মিন্‌ষে ভালবাস্‌তো গো, অধম্মের বল্‌তে নেই। এই শাশুড়ী ননদ জান্‌তে পেরে, সাতবার আসবঁটী পেড়ে এই কাটে তো এই কাটে ! বলে সোয়ামীর কাছে আম খাবার সাধ জানাতে গেছে ! ও কি মেয়ে মানুষ, ও রাক্ষুসী, ঝাঁটা মেরে ওরে দূর করে দাও।—তেনার ও খোয়ারের কিছুটী বাকি রইল না। সাধের আঁব আঁস্তাকুড়ে গড়াগড়ি খেলে, তবু পোড়া মুয়ে পড়্‌লো না। ধিক্কারে মরি নিজে নিজে ! ও মা ! তাই ভাবি বোন্‌ ! তারা এ সব সহুরে-ধিঙ্গী মেয়ে দেখ্‌লে কিই-ই না জানি বলে ? আর বাবুরো তো বউএদের পায়ের আল্‌তা ! বিয়ে যেন কোন পুরুষে হয় নি, বউ নিয়ে এমনি ধারাই আদিখ্যেতা !"

মৃন্ময়ী রোষ প্রকাশ করিয়া বলিল, "দেখ তো মাগীর রকম ! খাম্‌কা গাল দিতে ব'সে গেল !"

বিন্দি বিস্ময়ে গালে হাত দিয়া বলিল, "ও মা, তোমায় গাল দিলুম কখন

গো! অবাক্ কথা! হ্যাঁগা দিদি ঠাক্রুণ! শুধু শুধু হেসে নাকানি চোবানি খাচ্চ কেন গা? হক্ কথাটাই বল দেখি! ওঁকে আমি গাল দিয়েছি?"

সুরবালা কোন প্রকারে হাসি থামাইয়া গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "মনের কথার ঐটি ঠিক মনের কথা কি না, তাই অত গায়ে লেগেছে। তুমি তো আর শুধু ওঁকেই বলোনি। তা তোমার বাবু ওঁর পায়ের চুটকি হয়ে দিনরাত চরণপদ্মে বাজচেন দেখতে পাচ্চো না?"

সখী মৃদু হাসিয়া প্রিয়বাদিনী সখীর গাল টিপিয়া দিল।

তখন বিন্দি খুসী হইয়া মৃন্ময়ীর দিকে চাহিয়া একগাল হাসিয়া ফেলিয়া তাহাকে শুনাইয়া বলিল, "ঐ শোন গো বৌঠান্! এত আর মুখ্যু সুখ্যুর কথা না।"

মৃনো হাসিয়া জবাব দিল, "না, এ একবারে স্বয়ং সত্যানন্দ ঠাকুরের শাস্ত্রবচন।"

২

সুরবালাকে ফটোগ্রাফের আলবাম্খানা দেখিতে দিয়া মৃন্ময়ী দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল। ভাঁড়ারের আবশ্যক সামগ্রীপত্র বাহির করিয়া দিয়া বামুন ঠাকুরকে শীঘ্র শীঘ্র বাবুর আহার্য্য প্রস্তুত রাখিতে আদেশ করিয়া সে কলঘরের ভিতর গা ধুইতে গেল। সুন্দর দেহ শীঘ্র হস্তে মার্জ্জিত করিয়া আবার সে উপরে উঠিয়া আসিল। একরাশি কোঁচান শাড়ীর মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া একখানা চওড়া লাল পাড়ের ঢাকাই—তাহার সমস্তটায় জরির ছোট ছোট ফুল, সেইখানা পরিল, অঙ্গে উঠিল সেই রকমেরই ঢাকাইয়ের পাড় বসান ব্লাউস। তার পরে কাঁচপোকার টিপ পরিয়া, পান খাইয়া, তরল আলতায় পদতল রঞ্জিত করিয়া, সাজা পান ভর্ত্তি করা কাশীর বই ডিপে

হাতে লইয়া সে যখন সখীর কাছে ফিরিয়া আসিল, তখন সুরবালা স্বামীর পার্শ্বে উপবিষ্টা নিজের ফটোখানা খুলিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া টিপি টিপি হাসিতেছিল। মৃন্ময়ী চুপি চুপি ঘরে ঢুকিয়াই ইহা ধরিয়া ফেলিল, হাসিয়া বলিল, "উনি আবার অমূল্য নিধি কথায় কথায় পরকে দিতে চান! এক দণ্ড চোখের আড়াল হয়েচে তো ছবি দেখেই চোখ জুড়ুচ্ছেন।"

ক্ষিপ্রহস্তে পাতখানা উল্টাইয়া ফেলিয়া সুরবালা দিব্য গম্ভীর মুখে কহিয়া উঠিল, "মা গো মা, ও কি ভাই মনের কথা! কার ধন কাকে দিলি বল্ দেখি? নিজের জিনিষ চিন্‌তে পারিস্‌নে?"

সুরবালার সঙ্গে কাহারও পারিবার যো নাই। জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাই! সব হলো, আর যে দেরি নেই?"

"সব হয়নি, ওঁকে বলতে হবে, এই যাই।"

"তবে তো এখনও আসল কাজটাই বাকি। যা ভাই যা, তা হ'লে দেরি করিস্‌নে, মুখ দেখে সব ভুলে ব'সে থাকিস্‌নি যেন।" তার পর একটু মুখটা গম্ভীর করিয়া বলিল, "আর যদি কর্ত্তাটির মত না হয়?"

ব্যগ্র হইয়া মৃন্ময়ী বলিয়া উঠিল, "না, না, মত কেন হবে না, ভাই? নিশ্চয়ই মত হবে এখন।"

সুরবালা সখীর মুখখানি দুই হস্তে তুলিয়া ধরিয়া প্রসন্ন নেত্রে দেখিতে দেখিতে বলিল, "রূপটা যা খুলেচে, তাতে আমিই ভুলে যাচ্চি, তা তিনি তো পুরুষ মানুষ। তাতে এই রূপেরই উপাসক! ছেড়ে দিলে হয়! যা ভাই, তা হ'লে দেরি করিস্‌নে।"

মৃন্ময়ী পূর্ণ আশায় উৎফুল্ল-হৃদয় লইয়া স্বামীর উদ্দেশে চলিল।

যে ঘরে ঘোর চিন্তাশীল ও সুপ্রতিষ্ঠ লেখক নবীন অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র সর্ব্বদা উপবেশন করিয়া গভীর গবেষণা-পূর্ণ রাজ-নৈতিক, সমাজ-নৈতিক, আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ সকল রচনা করিতেন, হতভাগ্য

স্বদেশের দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া কোন্ প্রকার বক্তৃতা দ্বারা ইহার দুঃখ বিমোচন করিবেন, তাহারই সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করিতেন এবং কোন সমিতি কর্ত্তৃক সভাপতির উচ্চপদারূঢ় হইলে কেমন করিয়া হাত-মুখ নাড়িয়া স্বরগ্রামকে পুনঃপুনঃ কড়ি-মধ্যম হইতে কোমল নিখাদে, ইমনকল্যাণ হইতে ভৈরবী রাগিণীতে প্রবর্ত্তিত করিয়া শ্রোতাবৃন্দকে মুগ্ধ করিবেন, তাহারই অভিনয় করিয়া দেখিতেন, সেই কক্ষটি এ বাড়ীতে লাইব্রেরী ঘর বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। তাঁহার আর একটি স্বতন্ত্র বৈঠকখানা ছিল। এই লাইব্রেরী ঘরটি বাহির ও ভিতর-বাটীর মধ্যস্থ একটি বড় ঘর। বাটীর মধ্যে বড় বলিয়াই ইহাকে বড় ঘর বলিলাম ; নতুবা আয়তনে যে বেশি বড়, তাহা নহে। যাহা হউক, ঘরটী বেশ সুরুচিসঙ্গত গৃহসজ্জায় সজ্জিত। দেওয়ালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাতঃস্মরণীয়-চরিত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কবিবর হেমচন্দ্র, সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিম বাবু, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাত্মা গান্ধি প্রভৃতি স্বনামধন্য পুরুষগণের প্রতিকৃতি। দুতিনটা কাঁচের গ্লাসঢাকা আলমারি, পুস্তকে ভরা। কতকগুলি মৃন্ময়ীর স্বহস্তে প্রস্তুত শিল্পকার্য্যকরা আবরণযুক্ত নূতন নূতন টেবিল চেয়ার। জানালায় পর্দ্দা, উপরে টানাপাখা, ব্রাকেটে দামী ঘড়ি প্রভৃতি আড়ম্বরশূন্য অথচ পরিচ্ছন্ন গৃহসজ্জাগুলি গৃহকর্ত্রীর সৌখীন রুচির সাক্ষ্য দিতেছে। বস্তুতঃ মৃন্ময়ী এই অল্পবয়সেই গৃহস্থালীর পারিপাট্য ও শৃঙ্খলা বেশ শিখিয়াছিল। সংসারে অন্য অভিভাবিকা না থাকায় তাহার স্বাভাবিক, কার্য্যক্ষম, পরিশ্রমসহিষ্ণু স্বভাব সম্পূর্ণ স্ফূরিত হইয়াছিল। যাহা হউক, আজ এই সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্ণে খোলা জানালার কাছে টেবিলের সম্মুখে বসিয়া মৃন্ময়ীর স্বামী ক্ষিতীশচন্দ্র সম্মুখে কতকগুলা রুল-টানা কাগজ রাখিয়া গভীর চিন্তা করিতে-ছিলেন। মধ্যে মধ্যে সেই গভীর গবেষণার ফল প্রসূত হইয়া স্বর্ণমণ্ডিত ষ্টাইলো পেন ক্ষিপ্রগতিতে সেই কাগজগুলার উপর চলিতেছিল।

বলা বাহুল্য ক্ষিতীশ বাবুর সমস্ত হৃদয়-প্রাণ এখন একটি প্রবন্ধ রচনায় নিবিষ্ট আছে।

ক্ষিতীশচন্দ্রের ঘরকন্না সৌখীন হইলেও সৌখীনত্ব বস্তুটাকে তাঁহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গৃহিণী যতটুকু তদারক করিয়া চালাইতে পারেন, তদতিরিক্ত আর কিছু তাঁহার কাছে তিনি প্রত্যাশা করিতে পারেন না। বেড়াইতে বাহির হইলেই ক্ষিতীশের হয় ছাতি, নয় ছড়ি, না হয় তো উড়ানী বা শাল হারাইয়া যাইবে। কিছু না হইল তো চশমাখানাই গেল! সার্টের বোতাম থাক বা না থাক, প্যাণ্টালুনের পাগুলা ছিঁড়িয়া মাটি পর্য্যন্তও যদি লুটায় তা কিছুতেই তাঁহার অভাব বোধ নাই। আর রূপ, তা রূপেও মনের-কথার স্বামীর মত তিনি কন্দর্পকান্তিও নহেন, তবে অন্ধকার ঘরে দেখিলে আতঙ্ক উপস্থিতও হয় না, আর পাতে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ না করা যায় তেমনও নয়। মৃন্ময়ীর ভক্তি ইহাতেই অচলা। মৃন্ময়ী আসিয়া ক্ষিতীশের সম্মুখে দাঁড়াইল।

বলিয়াছি, ক্ষিতীশ বাবু জানালার দিকে সম্মুখ করিয়া বসিয়াছিলেন, কাজেই মৃন্ময়ীর ছায়া টেবিলের উপর পড়িয়া তাঁহার সাম্‌নে অন্ধকার হইয়া গেল। কিন্তু তিনি লিখিতেছিলেন না, চিন্তা করিতেছিলেন, কাজেই অন্ধকারে কোন ক্ষতি হইল না এবং পত্নীকে দেখিতে পাইলেন বলিয়াও বোধ হইল না। মৃন্ময়ী এ অবস্থার সহিত পরিচিত, ঈষৎ প্রমাদ গণিল। ধীরে ধীরে বলিল, "একটা কথা আছে, একটু সময় হবে শোনবার?"

ভাবুকপ্রবর সে কথা শুনিতে পাইলেন না। বরঞ্চ পুনর্ব্বার কলম তুলিয়া লেখনী চালাইলেন। মৃন্ময়ী বুঝিল, গতিক তত ভাল নয়! স্বামী এখন বাহ্জগৎ হইতে অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়াছেন। সে বেশ জানিত, ক্ষিতীশচন্দ্র যখন ভারতী দেবীর উপাসনায় রত থাকেন, তখন তাঁহার মনের উপর গৃহলক্ষ্মীর অধিকার মোটেই থাকে না। তাই একটু হতাশ হইল।

কিন্তু এতদূর অগ্রসর হইয়া আর পিছান যায় না, তাই সাহস করিয়া আবার বলিল, "ওগো, লিখো এখন, একটা কথা বলি শুন্‌বে?"

ক্ষিতীশচন্দ্র মুখ না তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, বল না?"

"আগে তুমি বল, কথাটি রাখ্‌বে?"

"রাখ্‌বার মতন হয় তো রাখ্‌বো না কেন? তোমার উচিত কথা—কবে আমি রাখি না, বলো?"

ক্ষিতীশচন্দ্রের কলম পূর্ব্ববৎ চলিতেই লাগিল।

মৃন্ময়ী একটু ইতস্ততঃ করিয়া, একটু ঢোঁক গিলিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, "আজ মিনার্ভা থিয়েটারে 'মাধবীকঙ্কণ' অভিনয় হবে, দেখতে যাবে?"

ক্ষিতীশচন্দ্র এইবার লেখনী ত্যাগ করিয়া, আলস্য ভাঙ্গিয়া, হাই তুলিয়া, একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্ষেপালে কে?"

মৃন্ময়ী একটু অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিল, "মনের-কথা যাবে, সে আমায় নিয়ে যেতে এসেচে, যাবে কি, বল না?"

"মনের-কথা কে তোমার?"

একটু রাগ করিয়া মৃন্ময়ী উত্তর করিল, "মনের-কথা রাধিকা বাবুর স্ত্রী, সুরবালাকে ভুলে গেলে?"

পত্নীর মুখে চশমা-মণ্ডিত চক্ষুর্দ্বয় স্থাপিত করিয়া স্নিগ্ধ হাস্য করিয়া ক্ষিতীশ বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, এবার এই লিখে রাখলুম, আর ভুল হবে না।"

এই বলিয়া সত্য সত্যই নোটবুক বাহির করিয়া লিখিতে লাগিলেন।

মৃন্ময়ী হাসিয়া বইখানা কাড়িয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে যে, যাও তো উঠে পড়ো।"

অমনি শিথিল কার্য্যসূত্রে আবার টান পড়িল। "আজ! অসম্ভব! আজ আমার এই প্রবন্ধটা শেষ করতেই হবে।"

বলিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র পূর্ব্ব-কার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন।

মৃন্ময়ী হতাশ হইয়াও তবু হাল ছাড়িতে পারিল না, সঙ্কুচিত হইয়া বিমর্ষ-মুখে আবার বলিল, "এ অভিনয় আর হবে না।"

ক্ষিতীশচন্দ্র বলিলেন, "পাগল! কে বল্লে হবে না? লোক জম্‌লেই হবে। যাও লক্ষ্মীটি! মিছে গোল করো না, একটা আলো দিতে ব'লে দাও গে। আমি এখন বড় ব্যস্ত আছি।"

মৃন্ময়ী বড়ই ক্ষুণ্ণ হইল, থিয়েটার দেখা না হোক, সখীর কাছে যে অত বড়াই করিয়া আসিল, সে বলিবে কি? তার স্বামী তাকে হপ্তায় হপ্তায় থিয়েটার দেখাইযা আনেন, হপ্তায় দুবারও যান, আর তার স্বামী এমন যে বছরে দু বছরে কখন যদি একবার হয়। নিজে ত কখন লইয়া যান না। কোন সুযোগে—তাও অপরের সঙ্গে যাওয়া—এই সামান্য কথাটিও রাখিলেন না! এ দেখিয়া সে যে মনে মনে কতই হাসিবে অথবা আহা বলিবে! সাধে কি ইহাকে সে 'বেরসিক' বলিয়া কথায় কথায় খোঁচা দেয়! মা গো! কেন মরিতে থিয়েটারে যাইতে সে রাজী হইয়াছিল?

নিজের বিপদ্ বুঝিয়া স্বামীকে আজ সে বড় জিদ করিয়াই ধরিল। বলিল, "আমি ওদের সঙ্গেই যাই না কেন? আবার যাবার সময় আমায় পৌঁছে দিয়ে যাবে। বহুকাল তো কিছুই দেখিনি, সেই দেড় বছর আগে একবার যা গেছলুম।"

ক্ষিতীশচন্দ্র বিরক্ত হইলেন, ভর্ৎসনার স্বরে কহিলেন, "দেখো মৃনো! তোমার ওই ধিঙ্গী সখীটি যা কর্‌বেন, তোমার তা করা সাজ্‌বে না। ওরা বড় মানুষ, ওদের খেটে খেতে হয় না, স্ত্রীকে সঙ্গে ক'রে হাটে মাঠে সর্ব্বত্রই ঘুরে বেড়াবার ফুরসৎ ওদের আছে, আমার নেই। তা ভিন্ন রাধিকা বাবু লোক ভাল নয়, তার সঙ্গে তোমার আমার অসাক্ষাতে যাওয়া আমার পছন্দ নয়।—দেখ, বৃথা তর্ক তুলে আমার সময় নষ্ট ক'রে

দিও না। যাও, আজ যাও, আস্‌চে শনিবারে আমি নিজে তখন তোমায় দেখিয়ে আন্‌বো।"

মৃন্ময়ী একান্ত হতাশ-চিত্তে ফিরিয়া আসিল। সুরবালা সিঁড়িতে দাঁড়াইয়াছিল। মৃন্ময়ীর দেরি দেখিয়া মনে মনে সেও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল। এখন উহাকে দেখিয়া পরিহাস করিল, "কি ভাই! চাঁদমুখ দেখে সব ভুলে গেছলে নাকি?" বলিতে বলিতে সখীর মুখ বিষণ্ণ দেখিয়া ব্যাপার বুঝিল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "মত হোল না বুঝি?"

মৃন্ময়ী ঘাড় নাড়িল।

কিছুক্ষণ অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া থাকিয়া সহসা সুরবালা বলিয়া ফেলিল, "আচ্ছা, তুই চুপি চুপি আমার সঙ্গে চল্ না কেন? কতটুকুই বা, নিজে এসে রেখে যাব আবার, চল্ ভাই, চল্।"

মৃন্ময়ী সে কথায় চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "কাজ নেই ভাই, রাগ কর্‌বেন।"

একটু বুঝিয়ে শুঝিয়ে বল্‌বি যে, মনের-কথা কিছুতেই ছাড়্‌লে না, টেনে নিয়ে গেল। আমার উপর খুব ক'রে দোষ দিয়ে দিস্ না। কি-ই বা এমন রাগ কর্‌বেন! মার্‌তে তো আর পার্‌বেন না, তার ভয়টা কি? চল্ ভাই লক্ষীটি চল্! না হ'লে আমার দেখে স্বস্তি হবে না।"

মৃন্ময়ীর মন ঝটিকাবেগে মজ্জিতপ্রায় তরণীর মত উঠিতে পড়িতেছিল। লোভের চেয়েও মর্য্যাদা-রক্ষার জন্যই তাহার মনটা ক্রমাগত টলমল করিতে লাগিল। তথাপি বলিল, "না ভাই, থাক্।"

"তবে আমিও আজ যাব না, বাড়ী চ'লে যাই ভাই! অনর্থক এতক্ষণ ধ'রে আটক ক'রে রেখে দিলি। বল্লেই হতো যে তোমার কোথাও যাবার এতটুকুও স্বাধীনতা নেই, অবরোধের বন্দিনী তুমি। তা হ'লে তো আর এতটা আশা আমিও কর্‌তুম না।"

মৃন্ময়ী ছেলেমানুষ বই তো নয়, আর সে আত্মপ্রতিষ্ঠা খর্ব্ব রাখিতে

পারিল না, দুর্ব্বুদ্ধি আসিয়া তার কাণে কাণে বলিয়া দিল, 'এতই দোষ কি? মনের কথা আপনার বোনের মতন, ওর সঙ্গে গেলে কি এমন অন্যায় হবে? উনি যাই বলুন ওরা লোক খুবই ভাল। রাগ করেন, একটু হাতে পায়ে ধর্‌বো কি আর কর্‌বেন?'

সে নিরুদ্ধশ্বাসে লিয়া ফেলিল, "তা হ'লে যাওয়াই যাক্।"

তখন আর সময় ছিল না। তাড়াতাড়ি ক্ষুদ্র কার্য্যগুলি সারিয়া লইয়া স্বামীর আহার্য্যের সম্বন্ধে বামুন ঠাকুরকে বারংবার উপদেশ দিয়া, তাঁহার যাহাতে একটুও কষ্ট না হয়, সে বিষয়ে রামধনকে পুনঃপুনঃ সাবধান করিয়া এবং বাহিরের ঘরে পান পাঠাইয়া দিয়া বিন্দিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই থিয়েটার দেখতে যাবি রে?"

বিন্দি তাহাতে তৎক্ষণাৎ রাজী হইল।

সুরবালা জিজ্ঞাসা করিল, "তুই খেয়ে নিবিনে?"

মৃন্ময়ী বলিল, "বিকেলবেলা খেয়েছি।"

মনটা বড় চঞ্চল বলিয়া মৃন্ময়ী কিছুই আহার করিল না। তখনও সাতবার মনটা তাহার পিছাইতেছিল, কিন্তু শেষে দুর্ব্বলতারই জয় হইল।

বাহিরে সুরবালার গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল



রাত্রি প্রায় দশটার সময় ক্ষিতীশ বাবুর প্রবন্ধ সমাপ্ত হইল। এই গুরুতর সমাজনৈতিক-ব্যাপার ঘটিত প্রকাণ্ড প্রবন্ধটি আগামী জন্মাষ্টমীর ছুটীতে 'সমাজ'-নামক সমস্যা-সমাধান সভার অধিবেশনে পঠিত হইবে এবং তাহার 'সমাজ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হইবে। কাজেই কাজটার জন্য বিশেষ একটু ত্বরা ছিল।

প্রবন্ধ-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে মৃন্ময়ীর কথা জাগিয়া উঠিল। মনে পড়িল, সে আজ বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। কখন ত এমন করিয়া কোন বিষয়ের জন্য সে অনুরোধ করে না। আহা, বেচারি!

কাগজপত্রগুলা বাঁধিয়া রাখিয়া, ক্ষিতীশচন্দ্র একেবারে দুইটা করিয়া সিঁড়ি ডিঙ্গাইয়া আপনার আলোকহীন শয়নকক্ষে আসিয়া ডাকিলেন, "মৃনো!"

কেহ উত্তর দিল না। শূন্য কক্ষ যেন তাঁহাকে উপহাস করিল।

ভৃত্য রামধন প্রভুপত্নীর নির্দ্দেশমত (নহিলে সে সন্ধ্যাবেলা বাড়ী থাকিত না) প্রভুকে উপরে উঠিতে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। প্রভুর ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে মনে সে হাসিল। বোধ হয় ভাবিল, বাবু এক দণ্ড মাঠাকরুণকে না দেখে চক্ষে অন্ধকার দেখেন। নিজেই পাঠিয়েছেন, আবার এরই মধ্যে ভুলে গিয়েছেন। সে আসিয়া ঘরের আলো জ্বালিল। এতক্ষণ অন্ধকার দেখিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন, বুঝি রাগ করিয়া মৃন্ময়ী অন্ধকারে শুইয়া আছে। কিন্তু আলোক প্রকাশিত হইয়া তাঁহার সেই সুকুমার কল্পনালতাটির মূলোচ্ছেদ করিয়া দিল। অপ্রস্তুত মুখে আস্তে আস্তে বলিলেন, "কে রে? রামধন!"

রামধন ভাবিল, 'আহা, বাবু বোধ হয়, আমায় দেখে ঘাবড়ে গেছে!' প্রকাশ্যে বলিল, "বাবু, খাবার আন্‌তে বলি?"

বিস্মিত হইয়া ক্ষিতীশ ভাবিলেন, মৃন্ময়ী কি রাগ করিয়া আমার খাওয়ানর ভার আজ চাকর রাস্কেলের হাতে ফেলিয়া দিয়াছে? এতটা চটিয়াছে যে, নিজেও জিজ্ঞাসা করিতে আসিল না? প্রকাশ্যে বলিলেন, "বলো!" মনে মনে ভাবিলেন, 'খাবার আনিলে নিশ্চয় সঙ্গে আসিবে।'

রামধন চলিয়া গেল। ক্ষণপরে আসিয়া বলিল, "বাবু, আসন হয়েচে, আসুন।"

ক্ষিতীশচন্দ্র আহার করিতে বসিলেন। তথাপি মৃন্ময়ী আসিল না। তিনি একটু বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। সেদিন তাঁহার আহারই হইল না। রামধন ভাবিল, 'মার' কেন বা থিয়াটার দেখ্‌তে যাওয়া বাপু! বাবু যে কিছুই খেতে পার্‌লে না।

আহারান্তে ক্ষিতীশচন্দ্র বারান্দায় যাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু মৃন্ময়ী বিহনে তখন তাঁর কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। ফিরিয়া আসিলেন, ভাবিলেন, "নিজে গিয়ে ডেকে আনি গে। বোধ হয়, আজ একটু অভিমানটা বেশি মাত্রায় হয়েছে। তা দোষও দেওয়া যায় না, বন্ধুর কাছে লজ্জায় পড়্‌তে হয়েছে কি না।

ভাবিয়া তিনি ঘরে আসিলেন। দেখিলেন, রামধন উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতেছে। অন্যদিন মৃন্ময়ী স্বয়ং তাঁহার ভোজনাবশিষ্ট গ্রহণ করিলে বিন্দিই এই কার্য্য করিয়া থাকে। আজ সব উল্টাপাল্টা দেখিয়া এবং বিন্দির সহিত রামধনের আদৌ বনিবনাও নাই জানিতেন, সেই জন্য কৌতুক করিয়া ক্ষিতীশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ যে রামধন বড় বিন্দির কাজ ক'রে দিচ্চ? ব্যাপারখানা কি?"

রামধন একটু অপ্রসন্ন হইয়াই ছিল, সহানুভূতি পাইয়া অনুযোগের স্বরে কহিল, "দেখুন না বাবু, মাগী গেল বুড়বয়সে থিয়াটার দেখ্‌তে, আর আমি মরি তার হয়ে খেটে। মায়ের আমার এম্‌নি বিচার!"

ক্ষিতীশচন্দ্র একটুখানি স্তব্ধ থাকিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেছে?"

সে স্বরে থতমত খাইয়া রামধন কহিল, "এজ্ঞে, মাঠাকরুণ বিন্দিকে সঙ্গে ক'রে থিয়াটার দেখ্‌তে নিয়ে গ্যাছেন কি না, সেই কথাই বল্‌ছি।"

ক্ষিতাশ অত্যন্ত কঠোরভাবে একটু হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ!"

আহা, কি সুন্দর অভিনয়! যেমন দৃশ্যপট, তেমনি কি সাজসজ্জা! আর কি চমৎকার জেলেখার কণ্ঠ! এমন মধুর স্বর কেহ কখনও শুনে নাই! মন যেন একেবারে মোহিত করিয়া লয়! আর তার রূপও কি তেম্‌নি! এ মেয়ে নাকি পার্শী বা আরমাণী-জাতীয় এমনি কিছু! রঙ্গমঞ্চে এরূপ আর কোথাও নাই। ওই যে হতাশ প্রেমিকা আলুলায়িতকুন্তলা অশ্রুমুখী যুবতী কাতরনেত্রে আকাশ-পানে চাহিয়া গাহিতেছে—

"আমার সাধ না পূরিল আশা না মিটিল, সকলি ফুরায়ে যায় মা!
তাই জনমের শোধ ডাকি গো মা তোরে
কোলে তুলে নিতে আয় মা।
পৃথিবীতে কেউ ভাল তো বাসে না,
পৃথিবীতে ভালবাসিতে জানে না,
যেথা আছে শুধু ভালবাসাবাসি, সেথা যেতে প্রাণ চায় মা।
স্বরগ হইতে, জ্বালারই জগতে, কোলে তুলে নিতে আয় মা।"

এমন সুন্দর কি 'আর কোথাও আছে? সহস্র সহস্র দর্শক মুগ্ধ হৃদয়ে উৎকর্ণ হইয়া পলকশূন্য নেত্রে চাহিয়া আছে। সকলেই যেন অভিনয়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছে এবং এই কৃত্রিম জেলেখাকে সত্যকার প্রিয়প্রেম-বিরহিতা দেওয়ানা নারীরূপে গ্রহণ করিয়া, তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া হুহুশব্দে অশ্রু বিমোচন করিতেছে।

মৃন্ময়ী তাহার দুঃখে সর্ব্বান্তঃকরণেই দুঃখিতা হইয়াছিল। পতিপ্রেম যে কি, সে তাহা বুঝিত। তাই যখন 'নরেন্দ্রনাথের' প্রণয়লাভে নিরাশ হইয়া 'জেলেখা' আত্মঘাতিনী হইল, তখন দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া, অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া সে মনে মনে ভাবিল, তা ইহা ভিন্ন প্রিয়প্রেমবিরহিতার আর অন্য উপায় বা কি আছে?

অভিনয় দেখিয়া সে সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছিল, মধ্যে একবার 'জেলেখার'

একটি গানে—"পতিপ্রাণা সাধ্বী কি না সাধিতে পারে প্রিয় পতির তরে" এই গানটিতে তাহার মন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই অন্যান্য চিত্তাকর্ষক দৃশ্যাবলী আসিয়া তাহাকে সকল কথা বিস্মৃত করাইয়া দিল।

অভিনয় শেষ হইল। রাত্রি তখন দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। এইবার বাড়ী যাইবার জন্য তাহার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। সেই জন-সমুদ্র মন্থন করিয়া মুক্তি লাভ করা ত খুবই অনায়াসসাধ্য নহে;—বিশেষ যাহারা শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত অভিনয়টা না দেখিয়া উঠিবে না।

গাড়ীতে উঠিয়া সুরবালা বলিল, "বাবা! হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচ্লুম।"

মৃন্ময়ী কিছুই বলিল না। আকর্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। এখন দুশ্চিন্তায় লজ্জায় তাহার মন ভরিয়া উঠিতেছিল। কি বলিয়া সে স্বামীকে মুখ দেখাইবে, তাই ভাবিয়া ভয়ে ভাবনায় তার বুক ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। না জানি, তিনিই বা তার এই অবাধ্যতায় কি বলিবেন।

সমস্ত পথটাই দুজনে নীরবে রহিল। সুরবালা 'মাধবী-কঙ্কণের' কথা ভাবিতেছিল। মৃন্ময়ীর মন হইতে 'মাধবীকঙ্কণ' তখন বসিয়া পড়িয়াছে, সে শুধু আপনার কথাই ভাবিতেছিল। আবার সুরবালা জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন দেখ্লি বল্!"

"বেশ।" বলিয়াই মৃন্ময়ী মুখ হেঁট করিল। তাহার চক্ষে জল আসিয়াছিল। পাছে সখী জানিতে পারে, সেই জন্য সে আর কোন কথাই কহিল না।

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া সুরবালা জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় নাম্তে হবে নাকি?"

মৃন্ময়ী বলিল, "না।"

"যদি দোর না খোলা থাকে?"

"বিন্দি ত সঙ্গে রয়েছে, রামধনকে ডাক্‌বে এখন। তোমায় আবার কতদূর যেতে হবে। শুধু শুধু কেন মিছে কষ্ট পাবে? তুমি চ'লে যাও।"

সুরবালার বাড়ী ভবানীপুরে। সে আর আপত্তি তুলিল না।

তালতলায় ক্ষিতীশ বাবুর বাড়ীর দ্বারে গাড়ী থামিলে মৃন্ময়ী ও বিন্দি নামিয়া পড়িল। বিন্দি বলিল, "তোমরা যাও গো, এই আমি রামধনকে ডাকচি।"

সে উচ্চ কণ্ঠে হাঁকিল, "রামধন! ও রামধন! দোর খোল।" সজোরে কড়া নাড়িতে আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া রাধিকা বাবুর গাড়ী মহাশব্দে চলিয়া গেল।

বিন্দি চেঁচাইয়া গলা প্রায় ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তবুও কেহই উত্তর দেয় না। বিন্দি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "হতভাগা মিন্‌ষে ঘুমিয়েছে না ম'রে গেছে রে? কাল টেরটি পাওয়াবো, দাঁড়ানা!" আবার জোরে জোরে সে দ্বারে ধাক্কা মারিয়া ডাকিতে লাগিল, "বাবু! বাবু! ওঠো গো, আমরা এসিচি।"

দু তিনবার ডাঁকাডাকির পর উপরকার ঘরের একটা জানালা সশব্দে খুলিয়া গেল এবং সেই জানালার ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া ক্ষিতীশ বাবু বিরক্তিপূর্ণ শ্লেষের সহিত তীক্ষ্ণস্বরে কহিলেন, "এতো রাত্রে কোথা থেকে কে জ্বালাতন কর্‌তে এসেচে? যাও, সোজা চ'লে যাও।"

শুনিয়াই মৃন্ময়ীর বুক দুপ্‌ দুপ্‌ শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। একি পরিহাস! না তিরস্কার! কণ্ঠে ও কি স্বর!

বিন্দি একটু হাসিয়া বলিল, "ও বাবু! কাকে চ'লে যেতে বল্‌চেন গো? রামধন মড়াটাকে একটু ডেকে দরজাটা খুলিয়ে দেন তো। আমরা যে—"

ক্ষিতীশচন্দ্র সে কথায় কাণ না দিয়া তেমনি তীব্র ও কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, "ভদ্রলোকের স্ত্রী বা কন্যা দাসীর সঙ্গে স্বামীর অজ্ঞাতে বাড়ীর

বাহির হয় না। যে স্ত্রী তা পারে, সে না পারে কি? আমার বাড়ীতে তেমনতর স্বেচ্ছাবিহারিণীর স্থান নেই। তোমরা যেখানে খুসী হয় চ'লে যাও! দোর খোলা হবে না।"

এই ভয়ানক কথাটা সহস্র বজ্রাঘাতের মতই মৃন্ময়ীর মাথায় পড়িল। সে স্তম্ভিত ও অবাক্ হইয়া গিয়া উর্দ্ধে সেই জানালার দিকেই চাহিয়া রহিল। তার পর সহসা জানালা রুদ্ধ হইবার শব্দে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার স্বামী চলিয়া যাইতেছেন। তখন সে প্রাণপণে গলা বাহির করিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিল, "সত্যি কি তুমি এমন ক'রে আমায় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে ত্যাগ কর্‌লে! আমি এখন যাই কোথায় গো?"

অত্যন্ত হৃদয়হীন স্বরে একটা উত্তর আসিল, "কেন, থিয়েটারে!" জানালা বন্ধ হইবার পরও যখন দশ পনের মিনিট কাল পর্য্যন্ত সদর দ্বার খোলা হইল না, তখন সত্য সত্যই মহাভয়ে চারিদিক্ অন্ধকার দেখিয়া সে বসিয়া পড়িল। তাহার চারিদিকের সংসার অসহ্য বেগে দুলিতে লাগিল। তার তখনই মনে হইল, ডাকিয়া বলে, "মা পৃথিবি! তুমি দুফাঁক হও, আমি তোমার ভিতব লুকাই।" তার চোখে জল আসিল না, আগুন হইয়া দু' চোখকে দগ্ধ করিতে লাগিল।

বিন্দি এতক্ষণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে সকল কথা বুঝিতে পারিয়া, মৃন্ময়ী যে স্বামীর অনভিমতে থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিল, তাহা শুনিয়া মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হইলেও স্বামীর অমানুষিক ব্যবহারে সেও ভীষণতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। রাগিয়া আগুন হইয়া বলিল, "ও মা, এদের আক্কেল কি গো! অবাক্ কর্ল্লে মা! বেটা ছেলের সঙ্গে যায়নি, কিছু না। নিজের সইএর সঙ্গে যদি ছেলেমানুষ না বুঝে সুঝে গিয়েই থাকে, তাতে এতই দোষ হয়, তা জানতুম না! না হয় রাগ হয়েচে, দুটো মুখেই বক বাবু, তা না বলে কি না, তুমি ভদ্দর লোকের মেয়ে নও। বাড়ী

ঢুকতে দোব না। এ আবার কি কথা গো! ও মা, ঘরের লক্ষ্মীকে বলে কিনা থিয়েটারে যাও। ছি ছি ছি! ঘেন্নায় মরি মা! আমাদের ছোট নোকের ঘরে বাবু এর চাইতে হাজার গুণে ভাল। আমরা আবার এদের ভাল বলি!”

মৃন্ময়ী এত দুঃখেও নিজ দোষ সমর্থন করিয়া বিন্দিকে শান্ত করিতে চাহিল, “চুপ কর বিন্দি, আমিই তো কথা না শুনে চুপি চুপি চ’লে গেলুম, ওঁর দোষ কি?”

বিন্দি ছোট লোক হইলেও মৃন্ময়ীর দুঃখ বুঝিল। আর সে কথার কোন উল্লেখ না করিয়াই আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, “এখন করা যায় কি? এখনই যে লোক চল্‌তে আরম্ভ হয়ে গেছে—শেষে কি একটা কেলেঙ্কার হবে।”

মৃন্ময়ী শূন্য চক্ষে চাহিয়া রহিল। ক্ষণপরে বলিল, “তুই আহিরী-টোলার পথ চিনিস্‌?”

বিন্দি বলিল, “চিনি, যাবে নাকি?”

মৃন্ময়ী উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, “হ্যাঁ, তাই চল্‌।” একবার অপরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে তাহার বড় সাধের—বড় যত্নের গৃহপানে চাহিয়া দেখিল, একটা সুদীর্ঘ তপ্তশ্বাস তাহার হৃদয়ের হৃদয় হইতে বাহির হইয়া পড়িল। এই গৃহে সে আজ সন্ধ্যার সময় সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিল, আর এই কয় ঘণ্টার মধ্যে এ কি নিষ্ঠুর পরিবর্ত্তন! কার অভিশাপে তার এমন দুর্গতি ঘটিল? স্বামি-আজ্ঞা-লঙ্ঘন-পাপ এতই ভয়ঙ্কর! হাতে হাতে সে পাপের এমন ফলও ফলে? হায় হায়! এত সুখ কি কেহ কখন এমন করিয়া হারা-ইয়াছে? মনে মনে একটু হাসি আসিল,—তুমিই না এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ‘জেলেখার’ দুঃখে অশ্রু মোচন করিতেছিলে? ওরে, এখন তোর দুঃখে কাঁদিবার লোক কোথায়?

বিন্দি, বাবুর উপর বড়ই চটিয়াছিল, তাঁর দ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকা তার সহ্য হইতেছিল না। বলিল, "বৌঠাকরুণ! সকাল হয়ে এলো যে! চলো না একটু পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই। পথে গাড়ী পেলে নিয়ে নেব তখন।" বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল। "হা ভগবান্! তোমার মনে এতও ছিল ঠাকুর! এ রাগ কিছু চিরকাল থাক্‌বে না। সুধু সুধু গেরস্ত ঘরের মেয়েকে এই নাকালটা করালে গা!"

তখন সত্য সত্যই ভোর হইয়া আসিয়াছিল। অদূরে বড় রাস্তায় ময়লা ফেলা গাড়ীর দল শব্দে মুখরিত করিয়া সহরের প্রথম জাগরণ ঘোষণা করিতেছিল। কিছুদূর আসিয়া বিন্দি বলিল, "ও মা, এ যে কোথা যেতে কোথা এসেছি গো! ফির্‌তে হবে।"

কিন্তু মৃন্ময়ীর আর চলিবার শক্তি ছিল না। সে দুচারি পদ অগ্রসর হইয়াই পতনোদ্যত হইল। অপমান, অনাহার, জাগরণ পাঁচ রকমে মিলিয়া তাহার সুকুমার শরীরে, মনে আর যেন সহ্য করিতে পারিল না। সে বিন্দির বক্ষে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

তখন বিন্দি দেখিল, বড়ই বিপদ্! এ দিকে সকাল হইয়াও আসিয়াছে, রাস্তায় লোক চলাচল করিতেছে। এমন অবস্থায় লোক-চক্ষুর সম্মুখে পতিত হইলে লজ্জা, অপমান, অপবাদ সকলেরই একশেষ হইবে।

সে বুদ্ধি করিয়া মৃন্ময়ীকে টানিয়া লইয়া সব চেয়ে নিকটস্থ মুক্তদ্বার বৃহৎ অট্টালিকাটার মধ্যেই ঢুকিয়া পড়িল।

৪

কিছুক্ষণ ক্রুদ্ধ সিংহের মত কক্ষমধ্যে পাইচারি করিতে করিতে ক্রমে যখন ক্ষিতীশচন্দ্রের রাগটা পড়িয়া আসিল, তখন তিনি বুঝিলেন, কাজটা বড় ভাল হয় নাই। বিবেক আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে সবলে আঘাত করিল। 'এ কি করিয়াছ ?' দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, দ্বারের পাশে কেহই নাই !

প্রভাতের মৃদু আলোক তখন জগতে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। রাস্তায় লোক যথেষ্ট পরিমাণে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাবিলেন, বুঝি রামধন দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল, উহারা এতক্ষণ বাড়ীর ভিতর আসিয়া থাকিবে। একটু প্রসন্নমুখে বাড়ীর মধ্যে অনুসন্ধান করিলেন—কে কোথায় ? তখন বিস্ময়ে উদ্বেগে স্তম্ভিত হইয়া গিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন, এ কি শাস্তির উপর শাস্তি !

বিন্দি দাসী মূর্চ্ছিতা মৃন্ময়ীকে টানিয়া লইয়া যে বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল, এত সকালে সেই বাটীর দ্বার খোলা ছিল কেন তাহা বলিতেছি।

এই বাটীর অধিকারিণী সরমকুমারী, ষ্টার থিয়েটারের একজন প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী। কোন হিসাবে যে তাহার নাম সরমকুমারী রাখা হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে এখন সৌভাগ্যক্রমেই বলিতে হইবে, কেহ আর তাহাকে তাহার পূরা নাম সরমকুমারী বলিয়া উল্লেখ করিত না। 'সরমা', 'সরী', কেহ কেহ বা অভিনীত অবস্থার শত নামেই তাহাকে অভিহিত করিত। সেদিন সেইমাত্র থিয়েটার হইতে আসিয়া সে সবে মাত্র হাতমুখ ধুইয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় বিন্দির অস্ফুট ক্রন্দন-

ধ্বান ও ভীত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। নেশায় ও ঘুমে তাহার দুচোখ জড়াইয়া আসিলেও স্পষ্টই দেখিতে পাইল, নীচের উঠানে একটি রমণী, আর একটি অবসন্নদেহ যুবতীকে বক্ষে লইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, "ও মা, এ কি হলো গো! ও মা, আমি কি কর্‌বো গো! কার কাছে যাই? কাকে কি বলি? কোথায় একরত্তি জল পাই!"

সরমা বিস্মিত হইয়া স্খলিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েচে গা, তোমার? কে গা, তোমরা?"

রমণী-কণ্ঠের স্বর শুনিয়া বিন্দি একটু আশ্বস্ত হইল. মুখ তুলিয়া উপরের বারান্দায় সরমাকে দেখিয়া বলিল, "বড় বিপদে পড়েছি মা! ইনি আমার বৌঠান্—ভিরমি গ্যাছেন, একটু জল দেবে বাছা?"

"দিচ্চি" বলিয়া সরমা চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে তাহার দাসী কৌশল্যা এক ঘটি জল, একখানা তালপাতার পাখা ও একটা অ্যামনিয়ার শিশি লইয়া আসিল। বিন্দি ইহাদের ব্যবহার কিছুই জানিত না। শুধু জানিত যে, অজ্ঞান হইয়া গেলে মুখে চোখে জল দিতে হয়। তাহার অনভিজ্ঞতা দেখিয়া অভিনেত্রীর দাসী মৃন্ময়ীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। কর্ত্রীর আজ্ঞামত কৌশল্যা তখন তাহাদের তাঁহার ঘুম ভাঙ্গা পর্য্যন্ত এখানে থাকিতে অনুরোধ করিল। বিন্দি মৃন্ময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে জনান্তিকে বলিল, "আর কোথায়ই বা থাক্‌বো? বেশ তো, রাত্রিটা পর্য্যন্ত এখানে থেকে যাওয়া যাক্।"

সমস্ত দিন একটা ঘরের মেঝেয় অঁাচল পাতিয়া পড়িয়া মৃন্ময়ী ক্রমাগত কাঁদিল। কৌশল্যা কাপড় ছাড়িতে অনুরোধ করিল, জল খাইতে বলিল, সে কিছুই করিল না। বিন্দি কতকটা উপরোধে পড়িয়াই হোক, কতকটা পেটের দায়েই হোক, জল খাইল। সেও সমস্ত দিন মৃন্ময়ীর কাছে বসিয়া বসিয়া চোখের জল মুছিল।

বৈকালে মৃন্ময়ী যে ঘরে কাঁদিতেছিল, সেই ঘরের দ্বারে কে ধীরে ধীরে ধাক্কা দিল। বিন্দি তখন বাহিরে গিয়াছিল, আগন্তুককে বিন্দি মনে করিয়াই সে বলিল, "এসো।" কিন্তু যে আসিয়াছিল, সে বিন্দি নহে, এক জন পুরুষ। যুবক ঘরে ঢুকিয়াই সহাস্যে বলিয়া উঠিল, "আহা দলনী বিবি এম্‌নি ক'রে কি নবাব বেচারাকে কাঁদাতেই হয় ভাই? আমি যদি দুনিয়ার নবাবীও পেতুম, তবু—"

সহসা অপরিচিত পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া লজ্জাকুঞ্চিতদেহ মৃন্ময়ীকে দীর্ঘ ঘোমটায় মুখ ঢাকিতে দেখিয়া, লোকটীর হুঁস হইল যে, এ দলনী বেগম নহে, আর কেহ। তখন সে ব্যক্তি একবার অপাঙ্গদৃষ্টিতে মৃন্ময়ীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি তোমায় চিন্‌তে পারিনি, মনে করেছিলুম সরী। তোমায় তো আগে কখনও এখানে দেখিনি! তুমি কবে এসেছ গা! বড় সুন্দর চেহারাখানি ত তোমার!"

মৃন্ময়ী লজ্জায়, ভয়ে, অপমানে কাঁদিয়া ফেলিল। লোকটি বিষম অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া গেল। তখন মৃন্ময়ী মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া আর্ত্ত-কণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিল, "মরণ! আমায় তুমিই আশ্রয় দাও। তোমার কাছে ত আর অপরাধ করিনি?" বিন্দি আসিলে সে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে অধীরা হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "এ কি করলি ভাই! এ আমায় কোথায় আনলি?"

বিন্দিও অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিল, "তাই তো বোন্, আগে ত কিছুই জান্‌তে পারিনি, এ যে থিয়েটারউলীর বাড়ী! তা আহিরীটোলায় কার বাড়ী যাবে যে বলেছিলে, চল না, গাড়ী ডেকে আনি?"

এত দুঃখেও মৃন্ময়ীর ঠোঁটে একটুখানি হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিল, "গাড়ী ক'রে মর্‌তে যাবো বিন্দু! তাই না হয় চল্। এখানে কিন্তু আর এক মুহূর্ত্তও নয়।"

বিন্দি জিব কাটিয়া নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, "ও মা! তাই মনে করেছ বুঝি? না ভাই, তবে ত আমি তোমায় সেখানে নিয়ে যেতে পার্‌বো না।"

মৃন্ময়ী অনেক মিনতি করিল; গলা হইতে হার খুলিয়া দিতে গেল। বিন্দি কোন কথায় কর্ণপাত পর্য্যন্ত না করিয়াই অত্যন্ত রাগ করিয়া উঠিয়া গেল, সে একটা উপায় ঠাওরাইয়াছিল।

ইহারই কিছুক্ষণ পরে সরমা সুন্দরী বৈকালিক বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া একটা রূপার ডিপে হাতে পান খাইতে খাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মৃন্ময়ীকে দেখিয়া সে কেবল বিস্ময়-বিস্ফারিত মুগ্ধনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সরমা দেখিল, রমণী ষোড়শী বা সপ্তদশী মাত্র। অনিন্দিত চম্পক-গৌরকান্তি। সে মোহিত হইল। কাছে বসিয়া একখানি হাত ধরিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা কবিল, "তুমি কে ভাই? তোমার বাড়ী কোথায়?"

মৃন্ময়ী হাত সরাইয়া লইয়া, সজল চক্ষু তুলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিল, কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিল, "আমার বাড়ী নেই।"

এই অর্থশূন্য কথায় অভিনেত্রীর মনে কত ভাবেরই উদয় হইয়া গেল। সে মৃদু চাপা হাসি হাসিয়া বলিল, "তা আমি অনেকক্ষণই বুঝেছি! তা এমন ক'রে কি পথে বেরুতে আছে? ধরা পড়তে পার্‌তে যে! যা হোক্ ইচ্ছে হয় ত আমার বাড়ীতেই থাক না কেন? থিয়েটারে যেতে চাও যদি ত বোন, ম্যানেজার তোমায় পেলে লুফে নেবে। তোমার যে রূপ, তোমার আবার এ পথে ভাবনা কি? কত রাজা, রাজপুত্র ওই রাঙ্গা পায়ে এসে গড়িয়ে পড়্‌বে।"

সরমা আবার ক্ষুব্ধ চক্ষে মৃন্ময়ীর মুখপানে চাহিয়া এবার ঈর্ষার শ্লেষপূর্ণ হাসি হাসিল।

এই ঘৃণিত মন্তব্য শুনিয়া মৃন্ময়ী এবার ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অন্য

কেহ হইলে সে কান্নায় অপ্রতিভ হইত ; কিন্তু সরমা হইল না। সে দিব্য হাসি-হাসি মুখে বলিল, "তা প্রথম প্রথম একটু বাধ বাধ ঠেক্‌বে ত বটেই, ক্রমে আবার সবই সহ্য হয়ে যাবে। তা আমার কাছে আর লজ্জা কি ভাই ?

সে মৃন্ময়ীকে আহার করিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিল।

মৃন্ময়ী তখন চোখ মুছিয়া বলিল, "এখন থাক্, তুমি আমার একটি উপকার ক'রবে ? একটু কাগজ ও দোয়াত-কলম দেবে ? আর একখানা চিঠি লিখে রাখবো, ২০ নং তালতলায় সেটা পাঠিয়ে দেবে ?"

সরমা বলিল, "তা দেব না কেন ? দেব এখন। ২০ নং তালতলায় বুঝি তোমার বাবু থাকেন ?"

সে ক্ষণবিলম্বে লেখ্য দ্রব্য সকল আনাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। ভাবিল, সমস্ত দিন কিছু খেলে না, তা, না খায় তো আর আমি কি কর্‌বো বাপু ! আমি ত আর ওকে সেধে আনি নি। ওর ঝি মাগী আসুক, তাকে তখন বলা যাবে। যা হোক, এটাকে আট্‌কে রেখে ভাল ক'রে শেখালে পড়ালে পয়সা পাওয়া যেতে পারে।"

ঘরের ভিতর দ্বার রুদ্ধ করিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে মৃন্ময়ী লিখিল "দেবতা আমার ! হতভাগিনী তোমার চরণে ঘোর অপরাধে অপরাধিনী। তবুও সে তোমার চিরদিনের দাসী, তাই সকাতরে অনুনয় করিতেছি, এই পত্রখানি পাঠ করিয়া, যাহার নিকট পত্র পাইবে, তাহারই সহিত যত শীঘ্র সম্ভব এখানে আসিও।

তখন আমি এ সংসারে থাকিব না, আর কাহার উপর রাগ করিবে ? একবারমাত্র অভাগিনীর মাথায় তোমার পায়ের ধূলা দিয়া তাহার পাপ-পঙ্কিল দেহ পবিত্র করিও। যদি এই একটি মাত্র পাপে জীবনে এই এক-বারমাত্র আমি পাপিনী হইয়া থাকি, তবে তোমার পদস্পর্শে অবশ্যই আমার সুগতি হইবে।

জানি, আত্মহত্যার বাড়া পাপ নাই, ইহার নাকি প্রায়শ্চিত্ত হয় না। কিন্তু কি করিব, আজ আমি অন্তরে বাহিরে যে যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি, তার চেয়ে যে নরকের যন্ত্রণা বেশি, তা আমার মনে হইতেছে না। যদিই হয়, ইহার পরিবর্তে সে যন্ত্রণা সহ্য করিতেও আমি প্রস্তুত আছি। বোধ হয়, এই মৃত্যুই আমার নরক। আমি ভদ্র লোকের ঘরের মেয়ে, এই পাপপুরীর মধ্যে স্বামিপরিত্যক্তা হইয়া দারুণ যন্ত্রণাময় মৃত্যু বরণ করিতেছি ; এর চেয়ে নরক আর কোথায় আছে ?

জীবিতে তো ক্ষমা করিবে না, তাই আমার সকল কামনা অপূর্ণ রাখিয়াই মরিলাম। সাধ ছিল, তোমার পায়ে মাথা রাখিয়া তোমার মুখ দেখিতে দেখিতে মরিব, তাহা আর হইল না। কারণ, তুমি রাগ করিয়া যে অভিশাপ দিয়াছিলে, আমার অদৃষ্টে সঙ্গে সঙ্গে যে তাহাই ঘটিয়াছে। কোন্ মুখে আর মুখ দেখাইব ? তুমি আমার শতকোটি প্রণাম লইও। ঈশ্বর তোমায় সুখে রাখুন। আমার পাপের উচিত শাস্তি হইয়াছে। জন্মের মত বিদায়। আবার ভাল দেখিয়া বউ আনিয়া সুখী হইও।

তোমার চিরদাসী—মৃন্ময়ী।”

লিখিতে লিখিতে মৃন্ময়ীর পত্র অশ্রুজলে মসীসিক্ত হইয়া গেল।

৫

বিন্দি মৃন্ময়ীকে একা রাখিয়া একেবারে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ক্ষিতীশ বাবুর বাড়ী আসিল। ক্ষিতীশ সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, সমস্ত দিন মৃন্ময়ীর অনুসন্ধান করিয়া হতাশ হইয়া, সেই সবেমাত্র গৃহে ফিরিয়াছেন। অনাহারে অনিদ্রায়, দারুণ দুশ্চিন্তায় ও আত্মগ্লানিতে তাঁহার একদিনের মধ্যেই যেন দশবৎসরের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল।

যেখানে যেখানে মৃন্ময়ীর সামান্যমাত্র পরিচয় ছিল, সর্ব্বত্রেই অনুসন্ধান হইয়াছিল। শুনিয়া কত লোকে কতই রটনা করিল। অধিকাংশই মুখ টিপিয়া হাসিল। কেহ কেহ অবাক্ হইয়া গালে হাত দিল ;—"ও মা, কলিকালে মানুষ চিন্‌বার যোটি নেই গো! বউটি দেখতে অমন ভালমানুষ-পানা, পেটে পেটে তার অতটা ছিল গো! আহা, ক্ষিতীশবাবু বেচারা নেহাৎ ভদ্রলোক, এখনকার ছেলেদের মতন বউ মাথায় ক'রে নাচতে জানে না কি না, তাই একেলের ধিঙ্গী মেয়ের মন উঠলো না!"

কেহ বলিল, "রাধিকার সুমুখে বার হয়, কথা হয়, তখনই জানি যে, একটা কাণ্ড না ঘটে যায় না।"

রাধিকা বাবু শুনিয়া নিজের স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি ভৎ'সনা করিলেন। সুরবালা তাহার দোষে সখীর শাস্তি দেখিয়া যত পারিল, আত্মতিরস্কার করিল ও খুব কাঁদিল। ক্ষিতীশের উদ্দেশেও কিছু কম গালি দিল না।

রাধিকা বাবুও ক্ষিতীশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া মৃন্ময়ীর অনুসন্ধানার্থ বাহির হইলেন। অবশেষে স্থির হইল, আজ রাত্রেই ক্ষিতীশ শক্তিগড়ে মৃন্ময়ীর পিত্রালয়ে যাইবে। যদি সেখানেই যাইয়া থাকে। বিন্দি সঙ্গে ছিল ; সে

লইয়া যাইতেও ত পারে। ক্ষিতীশের সে কথা বিশ্বাস হইতেছিল না। তিনি বলিলেন, "তুমি জান না ভাই! সে যে বড়ই অভিমানী, এত অপমান সে সহ্য কর্‌বে না, সে নিশ্চয় আত্মহত্যা করেছে।"

রাধিকাচরণেরও প্রথমে তাহাই সন্দেহ হইয়াছিল; কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তা নয়, সঙ্গে বিন্দি আছে যে। ভগবান্ ঐটুকু রক্ষা করেছেন। কেনই বা মর্‌তে দোর না খুল্‌তেই আমরা চ'লে গেলাম!"

দুই জনে ক্ষিতীশের পাঠকক্ষে বসিয়াছিলেন। এখনকার কর্ত্তব্য কি, তাহাই স্থির করিবার চেষ্টা হইতেছিল, কিন্তু কিছুই কিনারা পাওয়া যাইতেছিল না।

এমন সময় সহসা দ্বার খুলিয়া রোরুদ্যমানা বিন্দি আসিয়া ক্ষিতীশের পদপ্রান্তে আছড়াইয়া পড়িল। হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "আর কষ্ট দিও না গো বাবু! খুব শাস্তিটা দিলে যা হোক, অনর্থক। এখনও ঘরের লক্ষ্মী ঘরে ফিরে নিয়ে এসো গো,—নিয়ে এসো।"

ক্ষিতীশ শশব্যস্তে দুই হস্তে বিন্দিকে ধরিয়া তুলিলেন ও প্রায় রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় আমার মৃনু? ওরে বিন্দি, আমার মৃনুকে কি এনেছিস রে?"

বিন্দি উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথাই বলিল। বলিল, "তার দেহে এতক্ষণ প্রাণ আছে কি না আছে, জানি নি বাবু! আমি তার যা দশা দেখে এয়েচি, সে দেখে কেউ চ'লে আস্‌তেই পারে না, কি করি, উপায় নেই বলেই এই ছুটে খবর দিতে এলুম।"

শুনিতে শুনিতে ক্ষিতীশচন্দ্র বালকের মতই উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। রাধিকাবাবুও বারংবার কোঁচার প্রান্তে চোখ মুছিলেন।

তৎক্ষণাৎ ক্ষিতীশচন্দ্র পাগলের মত উঠিয়া ছুটিয়া চলিলেন। রাধিকাচরণ বলিলেন, "চল, আমিও সঙ্গে যাই। কি জানি, সে মাগী যদি আবার

কিছু গোলমাল বাধায়। এখন ধর্ম্মে ধর্ম্মে সকল দিক্ বজায় হলেই নিশ্চিন্ত হই যে!"

দ্বারের নিকট আসিয়া আর ক্ষিতীশচন্দ্রের ধৈর্য্য স্থির থাকিল না। ভয় ভাবনা ও লজ্জায় মিশিয়া তাঁহাকে যেন উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল।

বিন্দি ডাকিল, "বৌঠান্! ওগো বৌঠান্! কাকে এনেছি, দেখ গো।"

ক্ষিতীশ রুদ্ধ দ্বার সবলে ঠেলিলেন। দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। ক্ষিতীশের বুকের মধ্যে ধড়ফড় করিয়া উঠিল। আবার সজোরে তিনি দ্বার ঠেলিয়া আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে কাতরস্বরে ডাকিলেন, "মৃন্নু! মৃন্নু! মণি আমার! দোর খোল, আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি যে!"

কেহ উত্তর দিল না। তখন ব্যাকুল-হৃদয়ে ক্ষিতীশ দ্বারের উপর ভীষণ পদাঘাত করিলেন। পূর্ব্বেই সরমা সথানে আসিয়াছিল। ক্ষিতীশ বাবুর ভাবগতিক দেখিয়া ব্যঙ্গ করিয়া সে বলিল "ওগো বাবু! তোমার 'নয়নমণি' মান করেছেন, একটু খোসামোদ টোসামোদ কর না, গরীবের দোরটা খামকা ভাঙ্গ কেন?"

ক্ষিতীশের শরীরের মধ্যে তখন বিদ্যুদগ্নি ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছিল, তিনি এ কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। রাধিকাচরণও ভীত হইয়া তাঁহার সাহায্যার্থে আসিলেন, উপর্য্যুপরি চার পাঁচটা বড় বড় আঘাত সহ্য করিয়া দরজাটা সবেগে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল।

"কই মৃন্ময়ী? মৃন্নু! মৃন্নু! কোথায়, কোথায় তুমি মৃন্নু?"

কাহারও সাড়া নাই! কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে কাহার যেন অতি মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনা কি যাইতেছে না? আলো,—আলো,—ওগো একটা আলো!

এই যে মৃন্ময়ী কক্ষতলে পড়িয়া!

"মৃনু আমার! ওঠো, দেখ, তোমার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইতে এসেছি যে, এ কি! রাধিকাবাবু! দেখ, দেখ, মৃন্ময়ী কি নেই!"

মৃন্ময়ীর নিজের আঁচল অতি কঠিন বলে তার গলায় আঁটিয়া বাঁধা, দেহ তার প্রায় নিস্তব্ধ!

"ক্ষিতীশবাবু! এখন অত অধৈর্য্য হয়ো না। নাঃ, প্রাণ আছে বই কি! বাঁধন খুল্‌তেই এই যে নিশ্বাস বেশ বড় হয়ে পড়্‌লো! জল, জল চাই, ওরে, ও ঝি!—শীগ্‌গির এক ঘটি জল আন্ না।"

সরমকুমারী তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল আনিয়া বাবুদের ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া মৃন্ময়ীর মাথাটা কোলের উপর তুলিয়া লইল। তার চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়া মুখের উপর সজোরে হাওয়া দিতে দিতে বলিল, "মা! তোমায় আমি চিন্‌তে পারিনি, বুঝেছি, ঝি যা বলেছে, সত্যিই তুমি তাই! সতী লক্ষ্মী,—অভদ্র আনাড়ীর অনাদর সইতে না পেরে জলে ডুবে মর্‌তে যাচ্ছিলে। জলের চেয়েও অতলে পড়েছ জান্‌তে পেরেই প্রাণ বার ক'রে ফেল্‌চো! না মা! না, তোমার কোন ভয় নেই। আমরাও—যত মন্দই হই,—তবু মেয়েমানুষ। তুমি বেঁচে উঠে নিজের ঘরে ফিরে যাও, আমার এই অভিশপ্ত বাড়ীতে একটি ভাল কাজ একবারের জন্যেও ঘটুক। আমারও এ জন্মটা একদিনের মতনও সার্থক হোক।"

"মৃনু! মৃন্ময়ি! চিন্‌তে পার্‌চো কি? আমি যে অভাগা ক্ষিতীশ, তোমায় অপমানিত ক'রে তার কি ভয়ানক ফল পাচ্ছি, তুমি তো জানো না! পার্ব্বে কি? বুঝতে পারবে কি?"—

অতি ক্ষীণকণ্ঠে মৃন্ময়ী কহিল, "আমায় ক্ষমা করেছ?"

ক্ষিতীশের চোখ দিয়া টল টল করিয়া জল পড়িল—"আর তুমি?"

রাধিকা তখন হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তোমরা দুজনে দুজনকে ক্ষমা করতে চাও করবে, আপত্তি নেই,—আমি কিন্তু তোমাদের কারুকেই এ

জন্মে আর ক্ষমা কর্‌চিনে। আমার মনের কথা! তুমি কি ব'লে আমার বাড়ী চলে গেলে না?"

শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সরমা কহিয়া উঠিল, "মা তাঁর সতীত্বের প্রভাব দেখিয়ে পতিতোদ্ধার কর্‌বেন বলে যে পাতকী মেয়ের ঘরে এসেছিলেন, সেটা কি একবারও ভাব্‌চেন না আপনারা?"

সম্পূর্ণ

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত

১।	পোষ্যপুত্র	(উপন্যাস)	(৫ম সংস্করণ)	২॥০
২।	বাগ্‌দত্তা	ঐ	.. ...	২॥০
৩।	মন্ত্রশক্তি	ঐ	(৬ষ্ঠ সংস্করণ)	২
৪।	জ্যোতিঃহারা	ঐ	... ...	২
৫।	রামগড়	ঐ	... ...	২
৬।	পথহারা	ঐ	. ...	২॥০
৭।	চক্র	ঐ	... ...	২॥০
৮।	হারানো খাতা	ঐ	... ...	২॥০
৯।	মা	ঐ	.. ...	৩
১০।	মহানিশা	ঐ	. ...	
১১।	গরীবের মেয়ে	ঐ	... ...	৩
১২।	জোয়ার ভাঁটা	ঐ	.. ...	১॥০
১৩।	উল্কা	ঐ	... ...	১॥০
১৪।	চিত্রদীপ	ঐ	.. ...	১
১৫।	রাঙ্গা শাঁখা	ঐ	... ...	১
১৬।	মধুমল্লী	ঐ	... ...	॥০
১৭।	বিদ্যারণ্য	(নাটক)	... ...	১
১৮।	কুমারিল ভট্ট		... ...	১
১৯।	সোণার খনি		... ...	২
২০।	প্রাণের পরশ		... ...	২

৺ইন্দিরাদেবী প্রণীত

১।	স্পর্শমণি	(উপন্যাস)	...	...	২৲
২।	প্রত্যাবর্ত্তন	ঐ	...	...	২৲
৩।	স্রোতের গতি	ঐ	..	...	১৷৷৹
৪।	পরাজিতা	ঐ	(যন্ত্রস্থ)	...	১৲
৫।	কেতকী	ঐ	„	...	১৲
৬।	নির্ম্মাল্য	ঐ	„	...	১।৹
৭।	সৌধরহস্য	ঐ	„	...	১৲
৮।	মাতৃহীন	ঐ	..	...	৷৷৹
৯।	ফুলের তোড়া	ঐ	..	...	৷৷৹